শিক্ষাবিজ্ঞান

[*Educational Science*]

শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য

শঙ্খ প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র, ১৩৭২

প্রকাশক :
অমিতাভ মজুমদার
শঙ্খ প্রকাশন
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর :
শ্রীনিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬/এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
খালেদ চৌধুরী

॥ দু' এক কথা ॥

শিক্ষাবিজ্ঞান গ্রন্থটি লেখার তাগিদ এসেছে শিক্ষক-শিক্ষণ ক্ষেত্রে আমার অনেক দিনের অভিজ্ঞতা থেকে। মনে হয়েছে এ পর্যন্ত যে সব গ্রন্থ শিক্ষাতত্ত্ব বা শিক্ষামনোবিজ্ঞান সম্পর্কে রচিত হয়েছে তার অধিকাংশই বিষয়টির সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমিত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সেই তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে বিশেষ কোনো আলোচনা নেই। অথচ যে কোনো বিষয়কে প্রয়োগসিদ্ধ করতে না পারলে তার তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা থেকে যায়। 'শিক্ষাবিজ্ঞান' অনুরূপ প্রয়াসের ফলশ্রুতি। জানি না এই প্রচেষ্টা কতদূর সার্থক হয়েছে।

শিক্ষার উপাদানগুলিকে কেন্দ্র করে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে যে প্রশ্ন জাগে বা যে সমস্যা দেখা দেয় সে সম্পর্কে আলোচনা গ্রন্থটির মধ্যে স্থান পেয়েছে। শিক্ষাবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে হলে তার প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি দেবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। আশা করি অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আরও অনেকে গ্রন্থ প্রণয়নে ব্রতী হবেন।

গ্রন্থখানির পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ব্যাপারে সকলের উপদেশ-নির্দেশের প্রতীক্ষায় রইলাম। ইতি

শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য

ভূমিকা

শিক্ষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য হ'ল শিক্ষণের কাজকে অধিক ফলপ্রসূ করে তোলা ও শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করা। প্রশ্ন আসে, শিক্ষকের কাজ কি? কিভাবে তিনি শিক্ষক হিসাবে সফলতা লাভ করবেন, কিভাবে তিনি তাঁর ভূমিকা নির্বাহ করতে পারবেন। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা হবে স্বতন্ত্র। যেমন, শ্রেণীতে শিক্ষকের দায়িত্ব কেবল তথ্য পরিবেশন করাই নয়, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত পার্থক্য জেনে তাদের শক্তি, সামর্থ্য, রুচি, আগ্রহ অনুযায়ী তাদের মধ্যে যুক্তি, বিচারবুদ্ধি, ধ্যান-ধারণা, প্রয়োগ-ক্ষমতাকে উদ্বুদ্ধ করাও শিক্ষকের কাজ। এইজন্য শিক্ষাবিজ্ঞানের মাধ্যমে কিভাবে এই ব্যক্তিগত পার্থক্য জানা যায় ও কিভাবে তার পরিমাপ করা যায় সে সম্পর্কে শিক্ষককে নৈপুণ্য অর্জন করতে হবে। এর পরে যে বিষয় শিক্ষার্থীকে শেখানো হবে সেই বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মে দেবার জন্য শিক্ষণের রীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন। এই ব্যাপারেও শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের জীবনে বিশেষ সহায়ক।

শিক্ষণকে যদি একটি কৌশল বলে ধরা হয় তবে কোন কোন নৈপুণ্য থাকলে শিক্ষণের সামগ্রিক কৌশল আয়ত্তে আসে সে সম্পর্কেও অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। যেমন উপস্থাপনের কৌশল, প্রকাশের ক্ষমতা, শ্রেণীপরিচালনার শক্তি, শিক্ষার্থীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি দেবার আগ্রহ, বিষয়বস্তুকে সঞ্জীবিত করার ভিন্ন ভিন্ন উপায় সম্পর্কে জ্ঞান ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে শিক্ষকের ধারণা. চেতনা, সপ্রতিভতা, কৌশল বা নৈপুণ্য থাকা প্রয়োজন। শিক্ষণ একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া, তাকে খণ্ডচ্ছিন্ন করে, দেখা যায় না। তাই বিশেষ বিশেষ নৈপুণ্য থাকলেই যে ভালো শিক্ষক হওয়া যায় তা নয়. বিষয়বস্তুর জ্ঞান থেকে শুরু করে সেই জ্ঞানের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ পর্যন্ত সবকিছুই শিক্ষণ-নৈপুণ্যের অন্তর্ভুক্ত। সংক্ষেপে বলা যায় যে, শিক্ষণ কেবলমাত্র নৈপুণ্যই নয় কলা ও বিজ্ঞানের (art and science) অপূর্ব সমন্বয়েই প্রকৃত শিক্ষণ পূর্ণাঙ্গ হয়। এই কলা ও বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করতে গেলে শিক্ষকের সুসংহত ব্যক্তিত্ব ও শক্তিসামর্থ্যের প্রয়োজন। শিক্ষাবিজ্ঞান বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নৈপুণ্য অর্জনের পথে সহায়তা করে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে বিজ্ঞান হিসাবে শিক্ষণকে গ্রহণ করলে শিক্ষার ব্যবহারিক দিকে অগ্রগতি লাভ করা যায়। কিন্তু শিক্ষণকে যদি কলা হিসাবে ধরা যায় তবে তা কেবল প্রশিক্ষণের দ্বারাই অর্জিত হয় না ; সেখানে চাই দৃষ্টিভঙ্গি ও দরদ, চাই দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব ও সেবাব্রত। তাই শিক্ষণ-কার্যকে ফলপ্রসূ করতে হলে চাই দুই-এর সার্থক সমন্বয়। যেমন বিষয়জ্ঞান ও উপস্থাপনের নৈপুণ্যের প্রয়োজন আছে, তেমনি প্রয়োজন আছে শিক্ষকের অনুভূতির সম্পদের, প্রয়োজন আছে সপ্রতিভ ও দরদী দৃষ্টির। শিক্ষণকে যদি প্রক্রিয়া হিসাবে ধরা যায় তাহলে তার বিশ্লেষণেরও সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। শিক্ষাবিজ্ঞান শিখন ও শিক্ষণের মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক তুলে ধরতে সহায়তা করে এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষণের পদ্ধতিকেও প্রভাবিত করে। শিক্ষার্থীকে জানতে হলে যে সব মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির প্রয়োজন শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষককে সেগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। বিষয়বস্তুকে জানাই শিক্ষকের একমাত্র কাজ নয় প্রতিটি শিক্ষার্থীকেও জানা তাঁর একান্ত কর্তব্য। আর তাকে জানার অর্থ হ'ল তার অন্তর্বৃত্তি ও চাহিদাকে জানা, তার সমস্যাকে জানা ; তা নাহলে শিক্ষার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এছাড়া শিক্ষার্থীর পরিবেশকে জানা এবং সেই পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হওয়া শিক্ষকের অন্যতম কাজ। শিক্ষাবিজ্ঞানের কল্যাণে শিক্ষক শিক্ষার প্রতিটি উপাদান সম্পর্কে সচেতন হবেন ও তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করবেন। তাই শিক্ষাবিজ্ঞানের গণ্ডী আজ সীমিত নয়। সেখানে মনস্তত্ত্ব, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি, দর্শন প্রতিটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটে। এই দিক থেকে শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য

বিষয় সূচী

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষাবিজ্ঞানের স্বরূপ

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি

তৃতীয় অধ্যায়

পাঠক্রম

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষা-পদ্ধতি ও শিক্ষণ প্রণালী

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষায় মূল্যায়ন

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষা-পরিবেশ

সপ্তম অধ্যায়

শিক্ষা-গবেষণা

শিক্ষাবিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষাবিজ্ঞানের স্বরূপ

১। শিক্ষা ও শিক্ষাবিজ্ঞান

'শিক্ষা' বলতে কি বোঝায়—এ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ থাকলেও মূলতঃ এটি একটি ক্রমপরিণতির প্রকাশ। বর্তমানে শিক্ষা বিষয়টিকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কারণ, বিষয় হিসাবে শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য আজ স্বীকৃত। তাই শিক্ষার এই স্বাতন্ত্র্য শিক্ষাবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

'শিক্ষা' বলতে বোঝায় এমনই একটি বিষয় যা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র থেকে তত্ত্ব ও তথ্য আহরণ করে সামগ্রিকভাবে জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়। তাই শিক্ষার সংজ্ঞা আজ পরিবর্তিত হয়েছে; তার পরিধিও বিস্তীর্ণ হয়েছে। তার মধ্যে আছে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। তবে সংহত রূপ নিয়ে তারা শিক্ষার আঙিনায় মিলিত হয়, শিক্ষাকে পরিপুষ্ট করে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য নিয়ে শিক্ষাব সৌধ গড়ে উঠলেও তার একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে। আর তারই কল্যাণে খণ্ড ছিন্ন বিষয়ের তথ্যগুলি সংহত রূপ নিয়ে সার্থক হয়ে ওঠে।

আজ শিক্ষার এই নিজস্ব অস্তিত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কি সেই শিক্ষা; যা মানুষকে চলার পথে পাথেয় যোগায়। যা জীবনের প্রস্তুতি আনে, যাকে কেন্দ্র করে মানুষ ক্রমপরিণতি লাভ করে। খণ্ড ছিন্ন বিষয় ও অভিজ্ঞতা যেন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে শিক্ষারই মাধ্যমে। এইজন্যেই শিক্ষাকে ইংরাজীতে বলা হয় 'Inter-disciplinary approach' অর্থাৎ একাধিক Discipline বা জ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে শিক্ষার অবয়ব পরিপুষ্ট হয়। এ কেবল বিষয়গুলির সমন্বয়ই নয়, এর মধ্যে আছে সাঙ্গীকরণ। সব কিছু মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় ও জীবনের দিকে উদ্দীষ্ট হয়।

শিক্ষাকে বিজ্ঞান বলা যায় কিনা এ বিষয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে শিক্ষার জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে অনেকগুলি স্তর যেমন নিহিত আছে তেমনি শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন দিকও আছে। শিক্ষার কাজ সম্পূর্ণ করতে গেলে অনেকগুলি স্তরের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। কারণ শিক্ষার মধ্যে আছে একটা ক্রমপরিণতি। তাই এই ক্রমপরিণতির পথে

এগোতে গেলে কেবল চিন্তনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনলেই চলবে না, বোধ ও অনুভূতির ক্ষেত্রেও সেই পরিবর্তন আনতে হবে। তবেই একটা আচরণগত পরিবর্তন আসবে। যে-কোন শিক্ষা শিক্ষার্থীর মনে সঞ্চারিত হয় একটি বিবর্তনের ধারা বেয়ে। কতকগুলি অভিজ্ঞতা বা তথ্য তুলে ধরলেই এই সঞ্চরণ ঘটে না। এর জন্যে চাই শিক্ষার্থীর মনের প্রস্তুতি। শিক্ষণের কাজ সার্থক করতে হলে চাই উদ্দীপন, সন্দীপন ও প্রদীপন। কারণ শিক্ষা দীপ জ্বালার কাজ—একটি দীপ দিয়ে আরো অনেক দীপ জ্বালা, আর সেই দীপ জ্বালার কাজে সাফল্য আনতে হলে চাই নিষ্ঠা, প্রত্যয় ও বলিষ্ঠতা।

ব্যবহারিক দিক থেকে শিক্ষার আচরণগত ব্যাখ্যাও খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে শিক্ষিত তার আচরণ অন্যের আচরণ থেকে স্বতন্ত্র হবে এটাই অনুমান। শিক্ষার ফলে, আচরণের পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনই শিক্ষার ফলশ্রুতি। তাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে আচরণগত সমস্যা দেখা দেয় তার সমাধান খুঁজতে হয় শিক্ষারই মাধ্যমে। এই শিক্ষা শুরু হয় চিন্তনের স্তর থেকে। প্রথমেই শিক্ষার্থীর দৃষ্টি ফেরাতে হবে পরিবর্তনের উদ্দেশ্যের দিকে। কেন এই পরিবর্তনের প্রয়োজন? একে একে তাদের মনকে প্রস্তুত করতে হয় অনুভূতির মাধ্যমে। বোধ ও অনুভূতিকে জাগাতে না পারলে কেবল চিন্তনের সাহায্যেই সত্যিকারের শিক্ষা হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'শিক্ষা হল বোধের তপস্যা।' সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রতি মুহূর্তেই আমরা শিখছি। আমাদের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, বিষয়জ্ঞান ও নৈপুণ্যের ক্ষেত্রে যে ক্রমপরিবর্তন আমাদের জীবনে ঘটছে সেটাই হল শিক্ষার লক্ষণ।

এবার দেখা যাক, এই শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি। যে যে উপাদান নিয়ে শিক্ষাজগৎ, তাদের মধ্যে আছে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পাঠক্রম, শিক্ষণ-পদ্ধতি ও মূল্যায়ন। এছাড়া দেখা যায়, পরিবেশও শিক্ষার একটি বিশেষ উপাদ্যন। কখনো গৃহ-পরিবেশ, কখনো বিদ্যালয়, কখনো বা গোষ্ঠীজীবন শিক্ষার্থীদের বিকাশকে প্রভাবিত করে।

প্রথমেই প্রশ্ন জাগে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে। আর সেই লক্ষ্য নির্ণয়ের জন্যে কি কি আমাদের সামনে রাখা উচিত তা জানা প্রয়োজন। একদিকে আছে নিছক আশীর্বাদ, অন্যদিকে রূঢ় বাস্তববাদ। এছাড়া আছে সমাজের প্রয়োজন, গোষ্ঠীজীবনের চাহিদা, শিক্ষার্থীর প্রত্যাশা। এই সবকিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার যে লক্ষ্য নির্ণীত হবে তার ভিত্তি মূলতঃ যুক্তিনির্ভর।

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শিক্ষার লক্ষ্যকে যাচাই করতে গেলে দেখতে হবে যে যা যা শিক্ষার লক্ষ্য বলে নির্দিষ্ট হয়েছে তা সামগ্রিক বিচারের মাপকাঠিতে টিঁকে থাকতে পারে কিনা, তা না হলে শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে যাবে একপেশে।

আজ শিক্ষাজগতে যে লক্ষ্যবিভ্রাট দেখা দিয়েছে তার মূলে আছে বিচার-নির্ভর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির অভাব। দেখা যায়, ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে আজও যেন আমরা আশীর্বাদকে বেশী করে আঁকড়ে ধরে রাখতে চেষ্টা করছি। আর সেই সংগে কয়েকটি বাস্তব সমস্যাকে অস্বীকার করে চলেছি। শিক্ষার পরিকল্পনা বাস্তবভিত্তিক নয় বলেই এই বিড়ম্বনা দেখা দিয়েছে। কোনোমতে কয়েকটি বিষয়ে কৃত্রিমভাবে তথ্য পরিবেশন করেই আমরা ক্ষান্ত। কিন্তু সেই তথ্যজ্ঞান জীবনের সমস্যা সমাধানে বিশেষ কোন কাজে লাগে না। তেমনি কোনো আদর্শ সামনে না রেখে শিক্ষাকে কেবল যান্ত্রিক ও কর্মকেন্দ্রিক করে তুললে আসল সমস্যা থেকেই যাবে। একদিকে যেমন অর্থনীতি ও সমাজনীতি, অন্যদিকে দর্শন ও মনস্তত্ত্বেরও পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার ভিত্তি নির্ধারণের প্রয়োজন আছে। আসল কথা, শিক্ষার্থীর সামগ্রিক প্রস্তুতি এনে দেওয়াই যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয় তাহলে সেই কাজে শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব আছে। অবশ্য তার হাতে আছে পাঠক্রম, শিক্ষণ-পদ্ধতি ও মূল্যায়ন। কিন্তু এছাড়াও শিক্ষক কিভাবে বিদ্যালয় জীবনের বাইরেও শিক্ষার্থীর জীবনকে প্রভাবান্বিত করতে পারেন তাও চিন্তনীয়।

শিক্ষাবিজ্ঞানের মাধ্যমে কোনো সর্বজনীন লক্ষ্যে পেঁছানো সম্ভব কিনা বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। তবে শিক্ষা-প্রক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য রাখলে মনে হয় যে, ব্যক্তির ক্রমবিকাশ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, যাতে সমাজ ও গোষ্ঠীজীবন পরিপুষ্ট হয় এমনি ভাবে তাকে উদ্দিষ্ট করতে হবে। যে ক্রমবিবর্তনের ধারা শিক্ষাকে পরিণতি দিয়েছে তাকে সামনে রেখে শিক্ষার লক্ষ্যকে স্থির করতে হবে। বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি নিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করার পর সেই লক্ষ্যে কিভাবে পেঁছানো যায় তা চিন্তা করতে হবে, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুরূপ প্রস্তুতি এনে দেবার চেষ্টা করবেন। তাই শিক্ষার্থীদের জানতে হবে, বুঝতে হবে, তাদের প্রয়োজন মেটাতে হবে। আর তা করতে গেলে চাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। কোন্ শিক্ষার্থীর মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য, শক্তি ও সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তা জানতে হলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগের প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, যার যেমন শক্তি ও ব্যক্তিত্ব সেই অনুযায়ী

বিষয়বস্তুর জ্ঞান তাকে পরিবেশন করতে হবে, তা না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্য যাবে হারিয়ে। বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর মনের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এর পরে প্রশ্ন আসে—কিভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়জ্ঞান পরিবেশন করা যেতে পারে। তা জানতে হলেও চাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। কোন্ পদ্ধতি কি পরিবেশে কতখানি উপযোগী সে বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যথেষ্ট অবকাশ আছে। আর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিজ্ঞানসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের প্রশ্নকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ মূল্যায়ন ছাড়া শিক্ষার প্রগতি ও শিক্ষণের ফল সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এই মূল্যায়নকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে হলে চাই ভিন্ন ভিন্ন অভীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী। কাজেই শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের বিশেষ অবকাশ আছে।

শিক্ষাবিজ্ঞানের আর একটি দিক হলো শিক্ষায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ। তাই যাতে শিক্ষার্থীরাই শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে পারে তার জন্য অনুরূপ কার্যসূচী গ্রহণ করা যায়। শ্রেণীপাঠনের ব্যাপারে group dynamics-এর প্রবর্তন খুবই ফলপ্রসূ। দলগত কার্যকলাপ, গোষ্ঠী আলোচনা বা আলোচনা-চক্রের মাধ্যমে পঠন-পাঠন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সম্ভবপর করে তোলা যায়। ফলে শিক্ষার সামগ্রিক পরিবেশ উন্নত হয়।

একদিকে শিক্ষার মানবিক উপাদান, আর এক দিকে শিক্ষার পরিবেশ ও পদ্ধতি এই দুই-এর মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা শিক্ষাবিজ্ঞানের কাজ। সীমিত সামর্থ্য নিয়ে আমাদের দেশের অনেক বিদ্যালয়ই শিক্ষার আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম রাখতে পারে না। তাই এই অর্থনৈতিক সমস্যা শিক্ষায় সার্থক পরিবেশ রচনার স্বপ্নকে ব্যাহত করে। কিন্তু এই বাস্তবের দিকে দৃষ্টি রেখে কিভাবে শিক্ষাপরিবেশকে অনুকূল করা যায় তার জন্য চিন্তা ও ভাবনার প্রয়োজন। পাঠাগার যে কোনো বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ আকর্ষণ। সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত পরিবেশকে এই পাঠাগার অনেকখানি প্রভাবিত করে। কেবল গ্রন্থের প্রাচুর্যই নয়, গ্রন্থগুলির সার্থক বিন্যাস ও সদ্ব্যবহার না হলে পাঠাগারের ভূমিকা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পাঠাগারকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক পরিকল্পনা নিতে পারা যায়। যেমন পাঠাগারিকের নেতৃত্বে কিছু কিছু নতুন বই-এর ও শিক্ষার্থীদের উপযোগী গ্রন্থগুলির সমালোচনা-সমন্বিত প্রাচীর-পত্রিকার সম্পাদনা; বা ছোট ছোট দলে ভাগ করে

শিক্ষার্থীদের নিয়ে আলোচনা করলে পাঠাগারের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

২। শিক্ষার উপাদান ও শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষার যে কয়টি উপাদান আছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল :

(ক) শিক্ষার্থী
(খ) শিক্ষক
(গ) অভিভাবক
(ঘ) পাঠক্রম
(ঙ) শিক্ষণ-পদ্ধতি
(চ) শিক্ষার পরিবেশ
(ছ) মূল্যায়ন

শিক্ষার কাজ চলতে থাকে এই সকল উপাদানকে কেন্দ্র করে। এদের মধ্যে শিক্ষার্থীই হল কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রয়োজন মেটাবার জন্যে সমাজের উন্নয়নের জন্যে ও মানবের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের জন্যে ব্রতী হবেন। তার সেই শিক্ষণের আয়োজন, উপকরণ ও পরিবেশকে শিক্ষার লক্ষ্যের দিকে উদ্দিষ্ট করাই হবে শিক্ষকের, অভিভাবকের ও গোষ্ঠীনেতাদের কাজ।

একটি সহযোগিতার ভিত্তি গড়ে না উঠলে শিক্ষের কোনো ভিত্তিই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না। যেমন শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি, সামাজিক ভিত্তি ও দার্শনিক ভিত্তি পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। আর সেই সংযোগ-সাধনে শিক্ষকের ভূমিকা হবে গুরুত্বপূর্ণ।

(ক) শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষক অগ্রণী হবেন—

(১) শিক্ষার্থীকে জানতে,

(২) শিক্ষার্থীর প্রয়োজন বুঝতে,

(৩) শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দিতে.

(৪) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে সহায়তা করতে,

(খ) শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায়—শিক্ষকের কাজ হবে

(১) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করে শিক্ষার সুসামঞ্জস লক্ষ্য নির্দিষ্ট করতে।

(২) শিক্ষার লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষার্থীজীবনের বিকাশ সাধনে সহায়তা করতে।

(গ) শিক্ষার সামাজিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষকের ভূমিকা হবে--

(১) সমাজ ও গোষ্ঠীজীবনের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজচেতনা সঞ্চার করা।

(২) বিদ্যালয়গোষ্ঠী ও সমাজজীবনের মধ্যে সংহতি আনতে সহায়তা করা।

৩। শিক্ষক ও শিক্ষা

ভূমিকা অনুযায়ী শিক্ষকের গুণ ও যোগ্যতার বিচার করলে দেখা যায় যে তিনি কেবল বিষয়জ্ঞই হবেন না, তাঁকে আরো অনেক গুণের অধিকারী হতে হবে। কেবল গুণেই নয়, হৃদয়বৃত্তি, চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গী—এই তিনটি সম্পদের উপর নির্ভর করে তাঁর যোগ্যতা।

অবশ্য শিক্ষার্থীর কাছে বিষয়কে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হলে শিক্ষকের বিষয়জ্ঞানের প্রয়োজন। তবে বিষয়জ্ঞান ছাড়া কিভাবে বিষয়কে সজীব ও সরস করে তোলা যায় সে সম্পর্কেও শিক্ষকের জ্ঞান ও কৌশল থাকা চাই। তথ্যের অন্তরালে যে-সত্য লুকিয়ে থাকে তা আবিষ্কার করতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করাই শিক্ষকের অন্যতম কাজ। বিশ্লেষণী দৃষ্টি গড়ে তোলা ও যুক্তিবাদী মনের উন্মেষ সাধন করা শিক্ষার বিশেষ লক্ষ্য হবে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে আজ যে শিক্ষার প্রতি অনীহা দেখা দিয়েছে তার মূল কারণ হল নীরস তথ্যের মধ্য থেকে শিক্ষার্থী কোনো আনন্দ পায় না। তাই শিক্ষার পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলতে না পারা পর্যন্ত এ সমস্যা থেকেই যাবে। কিভাবে শিক্ষার্থীর রুচি, আগ্রহ ও বিষয়ানুরাগকে কেন্দ্র করে বিষয়জ্ঞান দেওয়া যায়—এটাই হবে শিক্ষকের বিশেষ লক্ষণীয়। তার জন্যে চাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করতে না পারলে শিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। আর শিক্ষণের কাজও অসম্পূর্ণ থাকে। তাই শিক্ষককে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

আজ শিক্ষকের যে-ভূমিকা প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হল সংগঠকের ভূমিকা। কি শ্রেণীতে, কি বিদ্যালয়-জীবনে, সর্বত্রই শিক্ষকের সংগঠনী প্রতিভার একান্ত প্রয়োজন। কারণ আমাদের শ্রেণী ও বিদ্যালয় পরিবেশ অনুকূল ও পূর্ণাঙ্গ নয়। তাই কিভাবে সকল স্তরে পরিবেশকে অনুকূলে এনে শিক্ষার লক্ষ্যে

পেঁৗছতে পারা যায় সেজন্যে চেষ্টা করতে হবে। যে-বিদ্যালয়ে যতটুকু সংগতি আছে সেই অনুযায়ী শিক্ষার্থী ও অন্যান্য সকলের সহযোগিতা নিয়ে বিদ্যালয়-পরিবেশকে যথাসম্ভব সুন্দর করে তোলা যেতে পারে।

সমাজজীবনেও শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সমাজে ও গোষ্ঠী-জীবনে শিক্ষককে স্থান করে নিতে হলে চাই শিক্ষকের সমাজসেবার প্রবৃত্তি। প্রয়োজন হলে সমাজের নেতৃত্ব নিয়ে তাঁকে সংগঠনের কাজে লাগতে হবে। তবেই শিক্ষক সমাজে আসন করে নিতে পারবেন।

কথায় আছে যে, শিক্ষক হবেন বন্ধু, দার্শনিক ও পথ-প্রদর্শক (Friend, Philosopher and Guide)। শিক্ষকের এই ভূমিকা নির্বাহের জন্যে চাই তাঁর প্রজ্ঞা, মমত্ববোধ ও বাস্তবদৃষ্টি। শিক্ষার্থীর স্তরে নেমে এসে তিনি তাদের সমস্যার সমাধান খুঁজবেন। এক সঙ্গে বিষয়জ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাবেন ও জীবনের প্রস্তুতির পথে শিক্ষার্থীকে পা বাড়াতে সহায়তা করবেন। এই হল সত্যকারের আচার্যের ভূমিকা। আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে-সংকট দেখা দিয়েছে তার মূল কারণ হল হৃদয়বত্তার অভাব। যেন সব আয়োজন সত্ত্বেও শিক্ষার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। যে-প্রাণের স্পর্শে সব কিছু আনন্দময় হয়ে ওঠে তার অভাব ঘটছে। এই যে রসের কার্পণ্য, এই যে মানবিক দৃষ্টির অভাব—এটাই শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। এই অভাবপূরণ করতে গেলে চাই শিক্ষকের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

বয়স্ক শিক্ষার ব্যাপারেও শিক্ষক বিশেষ অগ্রণী হতে পারেন। কিভাবে তিনি নৈশবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করে বয়স্কদের জন্য শিক্ষার আয়োজন করতে পারেন সে সম্পর্কে চিন্তা করবার অবসর আছে। শিক্ষক জ্ঞানযজ্ঞের হোতা। তিনি হবেন আচার্য যাঁর কাছে শিক্ষার্থীরা পাবে সস্নেহ নির্দেশ। শিক্ষাদানই তাঁর একমাত্র ব্রত নয়, তাঁর মূল ব্রত হল শিক্ষাসঞ্চার। অজ্ঞান থেকে প্রজ্ঞার পারে নিয়ে যেতে তিনি হবেন অগ্রণী। শিক্ষক সম্পর্কে অনেক সময় এমন একটা ধারণা জন্মে দেওয়া হয় যা অলীক। তাঁরা যে মানুষ, তাঁদের যে ঘর-সংসার আছে এ সম্পর্কে আমরা অনেক সময় বিস্মৃত হই। শিক্ষকের মধ্যে আমরা এমন একটা আদর্শ আশা করি যা তাঁর স্বাভাবিক জীবনে সম্ভব নয়। অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষককে এমন একটি উচ্চ আসনে বসায় যে শিক্ষকের পক্ষে সে আসন বজায় রাখা একরকম অসম্ভব হয়ে পড়ে। শিক্ষকের কাজ হবে একে একে সেই অলীক কল্পনাকে শিক্ষার্থীর মন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। শিক্ষককে যে

সাধারণ সাংসারিক জীবনে নানাভাবে কাজ করতে হয় একথা অনেক শিক্ষার্থী ভুলে যায়। কিন্তু এর ফলে তাদের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ধারণা গড়ে উঠতে পারে। আর তার সহজ স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্ক স্থাপনের পথে অন্তরায় হয়।

বিষয়বস্তু শেখানো ছাড়াও শিক্ষক আরো অনেক ব্যাপারে শিক্ষার্থীর জীবনে প্রস্তুতি আনতে সহায়তা করতে পারেন। তিনি হবেন পথপ্রদর্শক। সংগঠন, বিন্যাসসাধন বা নেতৃত্ব এই সব ক্ষেত্রেও শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষ লক্ষ্যণীয়। তাছাড়া প্রতিটি শিক্ষকের শিক্ষার্থীর সঙ্গে এমন একটি নিবিড় যোগাযোগ রাখতে হবে যাকে কেন্দ্র করে তিনি যে কোনো বিষয়ে কয়েকটি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রতীতি জন্মাতে পারেন। প্রতিটি বিষয়ে প্রকৃত শিক্ষাদানের কয়েকটি পর্যায় লক্ষণীয়। যেমন, (১) Concept formation. (২) Organisation of subjectmatter. (৩) Application and problem solving। শ্রেণীপাঠনের ক্ষেত্রে এই মূলনীতিগুলি অনুসরণ করলে অনেক ফল পাওয়া যায়। (অনেক সময় এই কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে যদি কোন বিষয়ের Diagnostic test তৈরী করা সম্ভব হয় তাহলে তাতে শিক্ষার্থীর বোধ ও প্রতীতি অনেক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে)।

৪। শিক্ষকের যোগ্যতা ও গুণাবলী

বর্তমানে সভ্যতার ধারা ও শিক্ষার গতি ক্রমশঃ আঁকাবাঁকা পথেই এগিয়ে চলেছে। আজকের দিনের শিক্ষাপদ্ধতি প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তাই শুধু শিক্ষাধারার পরিবর্তনেই নয়, এই পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষকগণের যোগ্যতার প্রশ্নও আজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সামাজিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক পরিবেশের ও পরিবর্তনের ফলে শিক্ষাধারা নবরূপ ধারণ করেছে। শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তুলবার ভার আজ মূলতঃ শিক্ষকের উপর।

শিক্ষকের কাজ হবে সমাজগঠনে ও জাতিগঠনে সহায়তা করা। তা করতে হলে কখনো উপদেশ নির্দেশের কাজ, কখনো বা গঠনমূলক কাজের অংশ তাঁকেই নিতে হবে। শিক্ষকের মানসিক স্থিরতা, প্রশান্তি ও কমনীয় রূপ ছাত্রদের মনে শ্রদ্ধা জাগিয়ে রাখে। হৃদয়ে সব সময় উচ্চ আদর্শ পোষণে

শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব আরো উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে। এই আদর্শ ও শিক্ষাব্রত শিক্ষকের মনে যত প্রবল হবে, তিনি সকলের কাছে তত মর্যাদা পাবেন।

শিক্ষণ কার্যে শিক্ষকের যোগ্যতা ও গুণাবলী

যে বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষা দেবেন. সেই বিষয়ে তাঁর দক্ষতা থাকা দরকার। শিক্ষককে শুধু পণ্ডিত হলেই চলবে না, বিষয়টিকে সহজ ও সরল ভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরার নৈপুণ্য থাকারও একান্ত প্রয়োজন।

উপস্থাপন-প্রণালী, সহজভাবে প্রকাশ করার শক্তি ও শৃঙ্খলা বিধানের যোগ্যতা শিক্ষকের পক্ষে অপরিহার্য। অনেক সময় শিক্ষকের প্রকাশভঙ্গীর জন্যই অত্যন্ত জটিল বিষয়বস্তুও ছাত্ররা অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে। আবার তাঁরই অযোগ্যতার ফলে সহজ ও সরল বিষয় দুরূহ হয়ে ওঠে। উদাহরণ ও ছবিছড়ার সাহায্যে যদি তাদের বক্তব্য বিষয় বোঝানো যায়, তাহলে শিক্ষার্থীদের সহজেই সেই বিষয়ে আসক্তি দেখা যায়, আর যদি বিষয়ে অনুরাগ থেকে তারা বঞ্চিত হয় তাহলে শিক্ষকের দৈন্যই প্রকাশ পায়।

এছাড়া, সপ্রতিভ দৃষ্টি ও উপস্থিত বুদ্ধি শিক্ষকের বিশেষ একটি গুণ। এইগুলি না থাকলে শ্রেণীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও অন্য প্রকার সমস্যা দেখা দেয়। সেইজন্য শিক্ষকের উচিত শ্রেণীকক্ষে সব সময় স্নিগ্ধ আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণের চিত্ত নিয়োজিত করা এবং গল্প, ছড়া, অঙ্কনকার্যে ও মাঝে মাঝে আবৃত্তি ও নাটকীয় ভঙ্গীর অবতারণা করে বিষয়বস্তুকে সরস করে তোলা শিক্ষকের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। এইজন্য কণ্ঠ-স্বরের মধুরতা, আবৃত্তি করবার শক্তি, অংকনে নিপুণতা এবং গল্প বলবার কৌশল অধিগত থাকলে শিক্ষাদানে সাধারণতঃ সাফল্য দেখা যায়। এছাড়া, নাট্যকুশলতা শিক্ষকের অতিরিক্ত গুণ।

মোটকথা, প্রত্যেক বিষয়ে শিক্ষকের মোটামুটি জ্ঞান এবং বিশেষ কোন প্রগাঢ় জ্ঞান থাকা দরকার। তাছাড়া শিক্ষকের প্রত্যেক বিষয়ে বোঝাবার ক্ষমতা ও ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন।

পরিচালনা-কার্যে, শাসন ও শৃঙ্খলা বিধানে শিক্ষকের যোগ্যতা

শিক্ষক বিদ্যালয় জীবনের বিভিন্ন অংশে এক এক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। শিক্ষাদান কার্যে পারদর্শিতা লাভ করলেই কৃতিত্বের দাবী করা

যায় না। পরিচালনা ও শাসন-শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারেও তাঁর দায়িত্ববোধ থাকা উচিত।

(ক) নিয়মানুবর্তিতা ও সদভ্যাস গঠন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া শিক্ষকের কর্তব্য। সেইজন্যই শিক্ষকগণেরও এই বিষয়ে যোগ্যতার প্রয়োজন।

(খ) পরিবেশের প্রতি শিক্ষকের অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিক্ষক শ্রেণীর বিশেষ কয়েকটি ছাত্রের ওপর বেশী দৃষ্টি দেন এবং অন্যান্য ছাত্রদের অবহেলার চোখে দেখেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী শ্রেণীর মধ্যে উপযুক্ত পরিবেশ রচনার বাধাস্বরূপ। সেজন্য শ্রেণীর প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী শিক্ষালাভে যাতে সমান সুযোগ পেতে পারে ও পাঠে মনোযোগী হয়, তার প্রতি শিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি না রাখলে চলবে না। তাই উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি প্রধানতঃ শিক্ষকের উপর নির্ভর করে।

(গ) শিক্ষক যদি পক্ষপাতিত্বহীন, সমদৃষ্টি ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হন, তবে শ্রেণী ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ অনুকূল ও স্বাস্থ্যকর হবে।

(ঘ) শিক্ষকের যদি আলস্য, ঔদাসীন্য থাকে ও আন্তরিকতা না থাকে তাহালে তিনি ছাত্রদের শ্রদ্ধালাভ করতে পারেন না। তাই শিক্ষককে এ সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে। কারণ ব্যক্তিত্ব ও শ্রদ্ধা আকর্ষণের শক্তি, এ দুটি একই সঙ্গে জড়িত। ব্যক্তিত্বই শিক্ষকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

বর্তমানে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে যে বিশৃংখলা দেখা যাচ্ছে তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় শিক্ষকদের মধ্যে প্রকৃত ব্যক্তিত্বের অভাব। এই বিশৃংখলার মূলে আছে শিক্ষকগণের ব্যক্তিগত জীবনে দৈন্য, সমাজের অবজ্ঞা ও জীবনাদর্শের অভাব।

পল্লী সংগঠনে ও সমাজসংস্কারে শিক্ষকের দায়িত্ব :

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আজ অনেক ব্যাপক। তাই সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের দায়িত্বও গেছে অনেক বেড়ে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ থেকে আরো বিস্তৃত পরিবেশে শিক্ষককে আজ আত্মনিয়োগ করতে হবে। শিক্ষকই আজ জাতি ও রাষ্ট্রের সংগঠক। তাঁদের উপর নির্ভর করে জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণ। পল্লী গঠনের উদ্দীপনা যোগাতে হবে এই শিক্ষকসমাজকেই। দেশের যারা শিশু, কিশোর তাদের মানবপ্রীতির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, আর শিক্ষকদের সেই সব কাজে অংশ নিতে হবে। জনজাগরণের ক্ষেত্রে শিক্ষকের দাম অসামান্য। তাঁকে

পল্লীতে পল্লীতে শিক্ষার্থীদের নিয়ে গ্রামের পথঘাট পরিষ্কার, কূপসংস্কার প্রভৃতি ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করতে হবে। জনসেবা, রোগীর শুশ্রূষা, আর্তের সাহায্য প্রভৃতি মানবিক কার্যে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা দিতে হবে। মোট কথা, শিক্ষকের ভূমিকার সংগে তাঁর যোগ্যতার প্রশ্ন জড়িত। কোন্ ভূমিকায় শিক্ষকের কি কি যোগ্যতার প্রয়োজন তা বিশ্লেষণ করে, কোথায় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে তা জানতে হবে, আর এর জন্যে চাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী।

৫। শিক্ষক ও শিক্ষাবিজ্ঞান

শিক্ষক একাধারে শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক। কারণ শিক্ষণের দুটি দিক আছে। কথায় আছে—"Teaching is both an art as well as a science". শিক্ষণের কাজে সাফল্য অর্জন করতে হলে শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলনীতি আর তার প্রয়োগ কৌশলও জানতে হবে। আর জানতে হবে শিক্ষার্থীর শক্তি-সামর্থ্য, বুদ্ধি-ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ ও প্রবণতাকে। শিক্ষার্থীকে নিবিড়ভাবে জানতে হলে চাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ।

তাই বিজ্ঞানীর মত শিক্ষককে কোন শিক্ষণ পদ্ধতি কার পক্ষে কতখানি উপযোগী তা আবিষ্কার করতে হবে। এছাড়া পাঠক্রম নিরূপণ ও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে সংহত করার কাজে শিক্ষকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত প্রয়োজন। এরপরে আসে শিক্ষার পরিবেশকে কিভাবে সুন্দর ও অনুকূল করে তোলা যায় সে সম্পর্কেও শিক্ষকের নৈপুণ্য ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী অপরিহার্য। শ্রেণী-পরিবেশ ও বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশের ওপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীচিত্তের বিকাশ।

এইভাবে শিক্ষার কাজ কতদূর ফলপ্রসূ হয়েছে তার যথার্থ মূল্যায়ন না হলে—আয়োজনের ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়বে না। এই মূল্যায়নকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে হলে চাই শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রয়োগ। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই মূল্যায়ন করতে হলে চাই শিক্ষকের অভীক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান ও প্রয়োগ নৈপুণ্য।

শিক্ষক যে শিক্ষাতরণীর কর্ণধার তাই নয়, আজ সমাজজীবনেও তাঁর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। বিদ্যালয়ের বিবর্তনের সংগে সংগে শিক্ষকের ভূমিকার বিস্তার ঘটেছে। শিক্ষার উপাদানের মধ্যে শিক্ষক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। কারণ শিক্ষার সব আয়োজন সুশিক্ষকের

অভাবে নিস্ফল হতে পারে। তাই শিক্ষকের এমন প্রস্তুতির প্রয়োজন যা তাঁর ভূমিকাকে সার্থক করে তুলবে। শিক্ষকজীবনের যে যে গুণ বা চিত্তবৃত্তির প্রয়োজন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল বিষয় উপস্থাপনের নৈপুণ্য, দরদী দৃষ্টি ও ব্যক্তিত্ব। কেবল বিষয়জ্ঞান থাকলেই সুশিক্ষক হওয়া যায় না, সেই জ্ঞানকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশন করার নৈপুণ্যও থাকা চাই। আজ ছাত্রদের, শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে তার মূল কারণ হল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক বিভ্রাট। যে প্রত্যাশা নিয়ে শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছে আসে অনেক ক্ষেত্রেই তা মেটানো শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হয় না। শিক্ষক-জীবনের বিড়ম্বনা, ব্যক্তিগত সমস্যা অনেক সময় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া শিক্ষার প্রতি নিষ্ঠা ও আদর্শবোধ না থাকাল শিক্ষণের কাজ অর্থহীন হয়।

ব্যক্তিগত জীবনের বিড়ম্বনাকে অতিক্রম করতে না পারলে শিক্ষকের ব্রত ঠিকভাবে উদ্‌যাপন করা সম্ভব নয়। কখনো বন্ধু, কখনো নির্দেশক আবার কখনো বা গুরুর মত শিক্ষার্থীকে সহায়তা করতে হবে। স্বার্থের কোনো সম্পর্ক সেখানে থাকবে না, থাকবে একটা মমত্ববোধ একটি মানবিক স্বচ্ছ দৃষ্টি। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক যত সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হয় ততই কল্যাণ। তার জন্যে শিক্ষককে এগিয়ে আসতে হবে, তাঁর ক্ষমাশীল দৃষ্টি নিয়ে। দেখা যায় অনেক সময় শিক্ষক অতৃপ্ত মন নিয়ে কোনো মতে শিক্ষকতার কাজ নির্বাহ করেন। একটি বৃত্তি হিসাবেই তাঁরা এই শিক্ষকতাকে গ্রহণ করেন। কিন্তু এতেও কোনো সুফল হতে পারে না। কেবল বুদ্ধি ও বিষয়জ্ঞানেই শিক্ষার্থী প্রভাবিত হয় না। তার জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে গেলে চাই শিক্ষকের আদর্শবাদী মন, সপ্রতিভ দৃষ্টি ও রসবোধ। এর অভাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ক্রমশঃই নীরস হয়ে আসে।

অনেকেই বলে থাকেন যে, আজ নাকি আগেকার দিনের মত শিক্ষক পাওয়া যায় না। তাঁরা হতাশা প্রকাশ করেন আর বর্তমান শিক্ষকসমাজকে দোষী সাব্যস্ত করেন। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সংগে সংগে প্রত্যেকের জীবন-ধারার কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে একথা মানতেই হবে। একলব্যের মত শিষ্য, দ্রোণাচার্যের মত গুরু মেলা আজ কঠিন, আমরা যে যুগে বাস করছি তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখতে হবে। জ্ঞানভাণ্ডার অনেক তথ্যে সমৃদ্ধ হয়েছে, তাই তত্ত্ব ও তথ্যের সম্ভারও বেড়ে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর

মানুষ অনেক জ্ঞানসম্পদের অধিকারী। সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হলে চাই বিশেষ নৈপুণ্য ও সামগ্রিক দৃষ্টি।

শিক্ষকের বিশেষ দায়িত্ব হল শিক্ষার্থীর বিকাশ ও ব্যক্তিত্বের উন্মোচন। তা করতে হলে তাঁর ভূমিকা বিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমিত থাকলে চলবে না। গোষ্ঠী ও জনজীবনের সংগে নিবিড় সম্পর্ক রেখে তাঁর ভূমিকাকে বৈচিত্র্যময় করে তুলতে হবে। সমষ্টি-জীবনকে বাদ দিয়ে আজ শিক্ষাকে স্বতন্ত্রভাবে দেখা সম্ভব নয়। কারণ গোষ্ঠীজীবনের চাহিদা ও সমস্যা মেটাতে হলে শিক্ষার প্রস্তুতির প্রয়োজন। সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে শিক্ষকের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর। চারিত্রিক সম্পদ ও মানবিকতাই শিক্ষক জীবনের পরম পাথেয়।

শিক্ষার্থী যেমন শিক্ষার একটি প্রধান উপাদান, তেমনি শিক্ষার্থীর অভিভাবক বা পিতামাতারও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা আছে। শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। তাই অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর গৃহ-পরিবেশই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাকে উপেক্ষা না করে শিক্ষকের কাজ হবে তাকে কাজে লাগানো। আর তা করতে হলে শিক্ষকের গোষ্ঠীর সংগে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে অনেক অভিভাবক শিক্ষা বিষয়ে অনভিজ্ঞ। তাই তাঁদের নিয়ে শিক্ষকের একসংগে কাজ করা সহজ নয়। কিন্তু এছাড়া অন্য কোনো সহজ উপায়ও নেই। শিক্ষার্থীর গৃহপরিবেশ ও বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে যাতে সামঞ্জস্য এবং সংহতি আসে, সেজন্যে শিক্ষককে বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে।

শিক্ষা পরিক্রমা

শিক্ষার প্রতি যার আগ্রহ আছে সেই প্রকৃত শিক্ষার্থী তাদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে বলে মনে হয়। আমাদের বিদ্যালয়ে কজনের শিক্ষার প্রতি প্রকৃত অনুরাগ আছে? অনেকের কাছে এটা একটা মামুলি ব্যাপার। ঠেলেঠুলে বিদ্যালয়ে অনেককে পাঠানো হয়। আবার অনেকে বিদ্যালয়ে আসে গৃহ-পরিবেশের একঘেয়েমি এড়াবার জন্য। শ্রেণীতে বা বিদ্যালয়ে তাদের সখ্য বা বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কাজেই দেখা যায় আমরা যাদের বিদ্যালয়ে পাই তারা সকলেই প্রকৃত অর্থে শিক্ষার্থী নয়। অথচ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বা অনুরাগ না থাকলে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে লাভবান হওয়া কঠিন।

শিক্ষকের প্রধান কাজ হল প্রত্যেকের মধ্যে শিক্ষার প্রতি এই আগ্রহ জাগানো। তার প্রথম ধাপ হল যাদের শিক্ষায় অনীহা তাদের আগ্রহের মূল কারণ নির্ধারণ করা। দেখা যায় যে প্রতিকূল গৃহ-পরিবেশ, পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণ এই দলের প্রভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়ী।

তাই লেখাপড়ায় বিতৃষ্ণার মূল কারণ জানতে পারলে সেদিকে সমস্যা সমাধানের কিছুটা চেষ্টা করা যায়। শিক্ষক প্রয়োজন হলে অভিভাবকের সঙ্গে বা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরিস্থিতি সঠিকভাবে জানতে পারেন ও পরিস্থিতির উন্নয়ন করতে পারেন।

আরো অন্য কারণে শিক্ষার্থীর লেখাপড়ায় বিতৃষ্ণা জন্মাতে পারে। যেমন যে সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থী থাকে সেখানে সাধারণের মধ্যে লেখাপড়ার প্রতি ঔদাসীন্য। অনেকসময় শিক্ষার্থীর বুদ্ধিহীনতা আগ্রহের পথে অন্তরায় হয়। সেক্ষেত্রে তার বুদ্ধির পরিমাপের সার্থকতা আছে। যদি তার বুদ্ধির বিশেষ দৈন্য না থাকে—তবে বিশেষ বিশেষ শক্তি ও প্রবণতা জেনে সেই পথে তাকে আকৃষ্ট করা যায়। অন্যথা তার জন্যে স্বতন্ত্র শিক্ষার আয়োজন করা বা বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। আর যারা জড়বুদ্ধি তাদের সাধারণ বিদ্যালয়ে না রাখাই ভাল। তাদের জন্য চাই—বিশেষ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি

১। শিক্ষার মনস্তত্ত্ব

শিক্ষা আজ একটি বিজ্ঞান বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছে দিকে দিকে। শিক্ষাকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে গিয়ে তার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে হয়েছে। শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে শিক্ষার যে আয়োজন তার মূলে আছে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনকে বোঝা। কিভাবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে, কিভাবে শিক্ষার্থী সহজে ক্রম-পরিণতির পথে এগিয়ে যাবে, কি প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে তার শক্তি উন্মেষিত হবে সেদিকে লক্ষ্য রাখা শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্যতম কর্তব্য। তাই শিক্ষা-বিজ্ঞানের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি অন্যান্য সব ভিত্তির চেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অবশ্য এর কারণও আছে। মনোবিজ্ঞানের কল্যাণে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার প্রবর্তন সম্ভবপর হয়েছে। আজ একটি মনের ওপর আর একটি মনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবার জন্যে নানা উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে আজ লক্ষ্য পড়েছে—রুচিপ্রবণতা এবং ব্যক্তিত্বের উপাদানকে বিশ্লেষণ করে শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ও সার্থকতা সম্পর্কে গবেষণা চলছে। তারপর মনের গতি-প্রকৃতি নিরূপণ করে শিক্ষাপদ্ধতিকে অনুরূপ-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করার প্রশ্ন উঠেছে। পরিবেশ-সৃজনের দিকেও আজ বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তাই শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হতে গেলে শিক্ষা-পরিবেশের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। এই পরিবেশ রচনার উপর শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে। শিক্ষার আর একটি উপাদান হল তার পাঠ্যসূচী। সেই পাঠ্যসূচী প্রণয়নের ব্যাপারেও মনস্তত্ত্বের যথেষ্ট প্রভাব আছে।

শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে মনস্তত্ত্বের প্রভাব বিস্তৃত। তাই আজকে শিক্ষা হল মনস্তত্ত্বনির্ভর শিক্ষা।

কিন্তু শিক্ষার লক্ষ্য নিরূপণ ব্যাপারে—আরও অনেক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে শিক্ষার মূল উপাদানগুলি হল (১) শিক্ষার্থী, (২) শিক্ষক, (৩) পাঠ্যসূচী, (৪) বিদ্যালয়-পরিবেশ,

(৫) শিক্ষা-প্রণালী ও পরীক্ষাপদ্ধতি। এই সব কয়টি উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তাই শিক্ষার লক্ষ্যের দিকে উপাদানগুলিকে উদ্দিষ্ট করতে হবে।

শিক্ষার এই মনস্তাত্ত্বিক দিক কি শিক্ষণের কাজে, কি মূল্যায়নে—সবখানে বিশেষ কার্যকরী। এই ভিত্তিকে বাদ দিয়ে শিক্ষাবিজ্ঞান কোনোদিনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। শিক্ষার সঙ্গে মনের যে নিবিড় সম্পর্ক আছে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের কাজে শিক্ষকের সাফল্য অর্জন করতে গেলে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে তা সহজ হয়। শিক্ষার লক্ষ্য যদি কেবলমাত্র তথ্য পরিবেশন না হয়ে সামগ্রিক বিকাশ হয় তবে শিক্ষকের ভূমিকা আরো গুরুত্বপূর্ণ হবে।

শেখানো বলতে এমন একটি প্রক্রিয়া বোঝায় যার ফলে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, ভাবাদর্শ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হয়। এই সঞ্চরণের কাজের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা ও গুণাবলীর উপর। মূলতঃ শিক্ষা বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীর জীবনে অর্জনীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চার ও তার ফলশ্রুতি হিসাবে আচরণগত পরিবর্তন। তাই কেবল তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশনের মধ্যেই শিক্ষার লক্ষ্য সীমিত হতে পারে না।

শিক্ষার যে-তিনটি পর্যায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল উদ্দীপন, সন্দীপন ও প্রদীপন। শিক্ষার্থীর মনকে নাড়া দেওয়াই হচ্ছে শিক্ষকের প্রধান কাজ। তার মধ্যে যে-সব কৌতূহল ঘুমিয়ে আছে একে একে তাদের উন্মেষিত করা শিক্ষকের অন্যতম কর্তব্য। তা করতে হলে শিক্ষককে কেবল পণ্ডিত হলেই চলবে না, তাঁকে হতে হবে বিজ্ঞানী ও ক্রিয়াকুশলী। কিভাবে বিষয়বস্তুকে ঘিরে শিক্ষার্থীর মনকে সঞ্জীবিত করা যায়, কি উপায়ে তাদের সৃজনশীলতাকে উদ্বুদ্ধ করা যায় তা জানতে হলে শিক্ষকের সপ্রতিভ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ প্রয়োজন।

একদিকে শিক্ষক যেমন শিক্ষাবিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর ভূমিকা নেবেন, আরেকদিকে তাঁর ভূমিকা থাকবে সংগঠন ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে। কি শ্রেণী পরিবেশ, কি অন্যান্য পরিবেশ, এই পরিবেশকে শিক্ষার্থীর বিকাশের অনুকূল করে তুলতে হলে চাই শিক্ষকের সংগঠনী প্রতিভা। শিক্ষকের সংগঠক (Organiser) হিসাবে যোগ্যতা না থাকলে তাঁর এই ভূমিকা ফলপ্রসূ হয় না। কেবল তাই নয় স্থানীয় সমাজে ও গোষ্ঠীজীবনে শিক্ষকের প্রভাব বিস্তার করতে হবে। তা করতে হলে তাঁকে জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে হবে,

সমাজসেবা ও অন্যান্য লোকহিতকর কাজে অংশ নিতে হবে। তবেই তিনি সমাজের আদরণীয় হয়ে উঠবেন। তাছাড়া গোষ্ঠীজীবনের যা প্রত্যাশা ও প্রয়োজন তা কতখানি মেটানো যায় সে বিষয়ে তাঁকে চিন্তা করতে হবে। আজ শিক্ষকের ভূমিকা তাই বিদ্যালয়জীবনের মধ্যে সীমিত নয়। বিদ্যালয়কেও সমাজশিক্ষার কেন্দ্র করে তোলা যায়, সেখানে নৈশ বিদ্যালয়ের বা ছুটির দিন শিক্ষক নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন।

শিক্ষক হবেন একজন প্রকৃত শিক্ষার্থী, মানবদরদী বন্ধু ও দার্শনিক। একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে কেউ-ই প্রকৃত শিক্ষক হতে পারেন না। তাই শিক্ষকের যে-সব ভূমিকা নিতে হয় তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দরদী দৃষ্টির অভাবে বিড়ম্বনা দেখা দিতে পারে।

শিক্ষকতার কাজে যে-সব ভূমিকা আজ অপরিহার্য বলে মনে হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(ক) তথ্য পরিবেশক ;
(খ) উদ্দীপক ও অনুপ্রেরক ;
(গ) সংগঠক ও নেতা ;
(ঘ) বন্ধু ও নির্দেশক ;
(ঙ) সমাজসেবক ;
(চ) প্রকৃষ্ট শিক্ষার্থী।

২। মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা-বিজ্ঞান

মনোবিজ্ঞান শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি ভিত্তিপ্রস্তর। শিক্ষার্থীর মনের খবর জেনে শিক্ষার ও শিক্ষণের ক্ষেত্রে তার তাৎপর্য খুঁজে বার করাই শিক্ষা-বিজ্ঞানের কাজ।

শিক্ষার্থীকে বুঝতে হলে তার দেহমন থেকে শুরু করে সবকিছুই জানতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীর বিকাশের ধারা না জানলে সেই অনুযায়ী শিক্ষার আয়োজন করা সম্ভবপর হয় না। এই বিকাশ যেমন একটি ধারা বেয়ে চলে তেমনি সেই ধারার মধ্যে কয়েকটি স্তর ও পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। আর নানাদিকেই জীবনের বিকাশ ঘটে ; যেমন—দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক বা আবেগগত, সামাজিক ইত্যাদি। এই যে জীবনের ক্রমপরিণতি তা লক্ষ্য করলে

বোঝা যায় যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষ পরিণতির পথে পদক্ষেপ করলেও প্রতিটি ক্ষেত্রে বিকাশের মধ্যে একটা সংগতি আছে। সামগ্রিক ভাবে এই বিকাশ ঘটে আর তা হলো স্বতঃস্ফূর্ত ও ধারাবাহিক। এই যে জীবনধারার রহস্য তা উদ্ঘাটন করতে গিয়ে অনেক মনোবিজ্ঞানীই বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। দেখা গেছে সীমিত ছকে, বাঁধা নিয়মে সবকিছু রহস্যকে ব্যাখ্যা করা যায় না। যাই হোক একথা আজ স্বীকৃত হয়েছে যে মানুষের প্রক্ষোভগত জীবনের বিশেষ তাৎপর্য আছে। বুদ্ধি, বিচার, যুক্তিকে ছাড়িয়ে আবেগ বা প্রক্ষোভ অনেকসময় প্রবল হয়ে পড়ে, আর এই আবেগের ক্ষেত্রে যে চাহিদা তা মেটাতে না পারলে ব্যক্তিত্বের সম্যক্ ও সামগ্রিক বিকাশ ব্যাহত হয়। তাই প্রথমে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের কথা এসে পড়ে। কারণ প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ, রস বা sentiment নিয়েই ব্যক্তিত্ব। কিভাবে এদের, শিক্ষার মাধ্যমে পরিমার্জিত ও সঞ্চালিত করা যায় সে-বিষয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। কেবল তাই নয় কি বুদ্ধি, স্মৃতি ও কল্পনা ; কি চিন্তন, ভাষা ও ধারণা সবকিছুর বিকাশ সাধন করা যায় শিক্ষার সাহায্যে। যে কোনো বিকাশের ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতার বিশেষ প্রভাব আছে। যে সব অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটায়, তাদের শিক্ষাগত মূল্য আছে। সেইসব উদ্দীপক ও উত্তেজক তাদের আচরণকেও প্রভাবিত করে। এমন কি সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের যথার্থ বিকাশ না হলে, বিকাশের পথ প্রশস্ত হয় না।

সংবেদন এবং প্রত্যক্ষণ হলো আমাদের প্রাথমিক বস্তুধর্মী জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়া। ইন্দ্রিয়ের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজকগুলির মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা নির্ধারণ করার শক্তি আমাদের আসে, আর যতই এই পার্থক্য নির্ধারণ করার ক্ষমতার বিকাশ হয় ততই আমাদের অভিজ্ঞতার সম্পদ বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। এই কারণে মন্টেসরি ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে শিক্ষার আয়োজনকে ফলপ্রসূ বলে মনে করেছেন। সংবেদনের পরে আসে প্রত্যক্ষণ বা perception. এই প্রত্যক্ষণের ওপর নির্ভর করে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যক্তিত্ব। যে যেভাবে জীবনকে প্রত্যক্ষণ করে সেই ভাবেই তার অভিজ্ঞতা রূপ নেয়। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণের গুরুত্ব কম নয়। মূল কথা এই যে, একই ঘটনা বা বিষয়কে নানাভাবে প্রত্যক্ষণ করা যায়, তা নির্ভর করে ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতা ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। প্রত্যক্ষণ ছাড়া শিখন সম্পূর্ণ হতে পারে না। প্রত্যক্ষণের বস্তুসমূহের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা এবং তাৎপর্য নিরূপণ করার

সঙ্গে শিখন-প্রক্রিয়ার যথেষ্ট যোগ আছে। গেস্টাল্ট মনোবিদগণ বলে থাকেন যে, শিক্ষার্থী যখন কোনো সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অংশের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে তখনই হবে শিক্ষা বা শিখন। তাই শিক্ষকের কাজ হবে শিক্ষার্থীদের আদর্শ প্রত্যক্ষণের প্রশিক্ষণ দেওয়া। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীজীবনের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সম্যক্ প্রত্যক্ষণের অভাবে শিক্ষার্থীর শিক্ষা ও সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবার শক্তি কাজে লাগে না।

৩। শিক্ষার্থীর জগৎ

শিক্ষাকালে শিক্ষক নানা রকম শিক্ষার্থীর সংস্পর্শে আসেন, শুধু বুদ্ধির দিক থেকেই নয়, ব্যক্তিত্বের দিক থেকেও তারা বিভিন্ন। কেউ বা প্রতিভাবান, কেউ বা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, কেউ বা একগুঁয়ে, আবার কারও আত্মপ্রত্যয় নেই। এইসব শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে হলে শিক্ষককে প্রতিটি শিক্ষার্থীর নিবিড় সংস্পর্শে আসতে হবে। অথচ আমাদের বিদ্যালয়ে সময়তালিকার সীমা অতিক্রম করে এই যোগাযোগ না করলে তা সম্ভব হওয়া কঠিন, এর জন্যে চাই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিকল্পনা। যেমন শ্রেণীকক্ষে দলগত আলোচনার ব্যবস্থা, শ্রেণীর বাইরে পাঠানুগ ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা। বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে শিক্ষার্থীকে যত জানা যায় ততই তার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় হতে থাকে। অনেকের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব দেখা যায়। তারা হয়ত বিতর্ক সভায় যোগ দিতে চায় না; দিলেও রীতিমত শঙ্কিত হয়ে ওঠে। এইরূপ আরও অনেক পরিস্থিতি আছে যেখানে তাদের ব্যক্তিত্বের ভিন্ন ভিন্ন দিক ধরা পড়ে। যেমন, খেলার মাঠ, গানবাজনার আসর, ব্যায়ামাগার ইত্যাদি।

বুদ্ধি যাই হোক না কেন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কারণ বুদ্ধির পরিবর্তন সাধন করা একরকম অসম্ভব। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিত্ব ও অনুভূতিকে পরিমার্জিত করা যায়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কোনো শিক্ষার্থী ক্রোধী ও বিচারবুদ্ধিহীন। কারণে অকারণে তাদের সবার ওপরে রাগ হয়, ফলে তাদের মন ক্ষুব্ধ ও অতৃপ্ত থেকে যায়। এইসব শিক্ষার্থীর আবেগবহুল জীবনকে সুসংহত করতে না পারলে তাদের মামুলী শিক্ষারও ব্যাঘাত ঘটে। দেখা যায় যে, যাদের জীবনে মানসিক সংঘাত আছে

তার মূলে আছে শৈশব ও বাল্যজীবনে কিছুটা অতৃপ্তি। সেই অতৃপ্তি কি করে দূর করা যায় শিক্ষককে তা চিন্তা করতে হবে। অনেক সময় স্নেহ, ভালবাসা ও উৎসাহ দিয়ে তাদের মনের ক্ষোভকে প্রশমিত করা যায়। একজন দরদী বন্ধুর কাছে মন খুলে সব কিছু বলতে পারলে তার মন অনেকখানি আশ্বস্ত হয়।

ছোট ছোট সমস্যা ছাড়াও অনেক গুরুতর সমস্যাও শিক্ষার্থীর জীবনে লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব নিয়ে জন্মায়। প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। শিক্ষার্থীর আচরণের মধ্যেও তা লক্ষ্য করা যায়। এক এক জন এক এক রকম ব্যক্তিত্বকে আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করে। সৃষ্টির মধ্যে এই বৈচিত্র্য বিস্ময় জাগায়। যখন মানুষ জন্ম নেয় তার প্রাণে সঞ্চারিত হয় এক চেতনা। একে একে ইন্দ্রিয়গুলির কাজ শুরু হয় ও একটি নির্দিষ্ট ধারায় সেগুলি কাজ করতে থাকে। তারপর তার অন্তরের বৃত্তি বাইরের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্রমপরিণতি লাভ করে। ফুলের পরিচয় যেমন তার সৌরভে, ব্যক্তির পরিচয় তার ব্যক্তিত্বে। ব্যক্তিত্বকে তাই খণ্ড ছিন্ন করে দেখা যায় না। কেননা একটা সামগ্রিক সত্তাকে ঘিরে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ।

ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ থাকলেও আজ জীবনে ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। অনেকে মনে করেন যে, কয়েকটি মানসিক ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিত্বের উপাদান হয়ে উঠতে পারে। এই উপাদানগুলির মধ্যে অধ্যবসায়, আত্মপ্রত্যয়, ক্ষিপ্রতা, পরিবেশের সঙ্গে সংগতি রেখে চলার শক্তি, দৃঢ়তা, আবেগময় জীবনের ভারসাম্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিত্বের ভিন্ন ভিন্ন দিক আছে তাই তার প্রকাশও বিচিত্র। মানুষের মধ্যে কেউ কেউ খুব মিশুকে আবার কেউ নিজেকে নিজের মধ্যে রাখে, মিশতে চায় না। তেমনি কারও মন সবসময় উদ্বিগ্ন (Neurotic), কেউ বা বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন। অসংলগ্ন চিন্তা ও অনুভূতি তাদের জীবনকে বিড়ম্বিত করে (Psychotic)। বলাই বাহুল্য যে ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তিসত্তার সামগ্রিক রূপ। তাই এই সামগ্রিক প্রকাশকে বুঝতে হলে কেবল উপাদান বিশ্লেষণ করলেই হবে না এর জন্যে অবচেতন মনেরও সন্ধান নিতে হবে। শুধু বুদ্ধিবৃত্তি ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে না; আবেগ, উচ্ছ্বাস, দৈহিক শক্তি ইত্যাদি অনেক গুণ বা বৃত্তি ব্যক্তিত্বের উপাদান হয়ে দেখা দেয়। এই ব্যক্তিত্বকে বুঝতে হলে চাই শিক্ষকের নৈপুণ্য ও অন্তর্দৃষ্টি। মনে রাখতে হবে যে, ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে নানা প্রভাবের ফলে।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে ব্যক্তিত্বের একটি দিক জন্মগত, অন্যটি পরিবেশগত। তাই যে-অংশ পরিবেশগত তার সুষ্ঠু বিকাশের জন্যে শিক্ষক ও অভিভাবকের দায়িত্ব অনেকখানি।

যদিও জন্মগত প্রভাব ব্যক্তিত্বকে নিরূপিত করে তবু অনুকূল পরিবেশের মাধ্যমে তার পরিমার্জন ও পরিবর্তন সাধন করা অসম্ভব নয়। শিক্ষার্থীকে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে রেখে তাকে অনুপ্রেরণা দিলে কিছুটা ফল পাওয়া যায়। যেমন, যার অধ্যবসায় খুব সীমিত, তাকে অধ্যবসায়ী করে তুলতে হলে উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন। হয়ত তাকে একটা দলের মধ্যে ফেলে একটি প্রতিযোগিতার আবহাওয়ায় তার সংকল্পকে বাড়ানো যেতে পারে। সকলেই যখন একটি কাজে লেগে থাকে, তা দেখে দলের অন্যান্য সকলের মত তারও মনে সংকল্প জাগবে কাজটি সম্পূর্ণ করতে। এইভাবে নানা উপায়ে অধ্যবসায় বাড়ানো যায়। কখনও বা ছোট ছোট পুরস্কার, স্বীকৃতিপত্র বা সম্মান দিয়ে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিশেষ একটা দিককে উন্নীত করা যেতে পারে।

কেবল ব্যক্তিত্বই নয় আজকের দিনে যারা কিশোর ও তরুণ তাদের মধ্যে সামাজিক চেতনার বিশেষ প্রয়োজন। এই সামাজিকতার অভাবে জাতির কোনও উন্নতি লক্ষিত হচ্ছে না। সমাজের কল্যাণ, সমাজের উন্নতি করতে গেলে চাই শিক্ষার্থীদের আত্মনিয়োগ। শিক্ষার মাধ্যমে সেই আত্মনিয়োগের প্রবৃত্তিকে জাগাতে হবে। তাদের মানসিকতাকে তৈরী করতে হবে, তা না হলে শিক্ষার কোনও সার্থকতা নেই। অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষা মানুষকে দাম্ভিক করে তোলে, তাকে স্বেচ্ছাচারী করে, সমাজজীবন থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। যে শিক্ষা মানুষের হৃদয়বৃত্তি গড়ে তোলে না, যার মধ্যে কোনো বৃহত্তর কল্যাণের আদর্শ নেই সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নয়। তাই শৈশব থেকেই নানা ভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিকতা ও জাতীয়তাবোধ জাগাতে হবে, তার জন্যে চাই নানা আকর্ষণীয় বই ও শিক্ষকদের আদর্শ। শৈশবই হচ্ছে বীজ বপনের মাহেন্দ্রক্ষণ। তাই জীবনের ঐ স্তরেই অনুভূতি ও আদর্শকে অঙ্কুরিত করতে হবে, শিক্ষক হবেন সেই বাগানের মালী, যিনি এইসব অঙ্কুরকে পল্লবিত করবার সংকল্প নিয়ে জীবনকে উৎসর্গ করতে পারবেন। শিক্ষকের ভূমিকা কেবল নীরব পর্যবেক্ষকের নয়, শিশুদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করা ছাড়াও তাঁর আরো দায়িত্ব আছে, শিক্ষার্থীর জীবনের সংকট মুহূর্তে (Psychological moment) প্রয়োজন মত তিনি সাহায্য করবেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে সমাজের দাবী অপেক্ষা শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবীর গুরুত্ব অনেক বেশী। পার্সিনান প্রমুখ মনীষী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সমর্থক। তাঁরা বলেন বিভিন্ন মানুষের অবদানেই সমাজ সংগঠিত, উন্নততর এবং বিকশিত হয়। তাই সমাজের দাবীর চেয়ে ব্যক্তির দাবী অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ পৃথিবীর যে কোন দেশের সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় দেশ এবং সমাজের উন্নতির মূলে থাকে কবি, সাহিত্যিক, মনীষী, রাজনীতিবিদ ও বৈজ্ঞানিকদের যুগব্যাপী অবদান।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু-মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ সম্বন্ধে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদই আমাদের বিশেষভাবে সচেতন করে তুলেছে। শিশু-মনস্তত্ত্বকে বাদ দিয়ে কোনো শিক্ষাপ্রণালীই বিজ্ঞান-সম্মত হতে পারে না। শিশুমনের সঙ্গে পরিচয়ের অভাবই অনেক সময় শিক্ষাদান কার্যের বিফলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শিশু-মনস্তত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষকের লক্ষ্য এবং বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করাই আজ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা না জন্মালে শিক্ষণের কাজ সহজ হয় না।

এখন প্রশ্ন হল ব্যক্তিত্বকে জানা ও তার পরিমাপ করা যায় কিভাবে? গতি, অনুভূতি, আবেগ ও ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের পরিচয় মেলে। কিন্তু বুদ্ধির পরিমাপ করা যায় কেবলমাত্র মানুষের বিশেষ বিশেষ মানসিকতার মাধ্যমে।

মাথার গড়ন দেখে যেমন বুদ্ধির বিচার চলে না সেই রকম অনেক সময় দেখা যায় কেবল পারদর্শিতা দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিচার হয় না। প্রতিক্রিয়ার সময় দিয়ে ইন্দ্রিয়ানুভূতির সূক্ষ্মতর পরীক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এই পরিমাপ কতদূর বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, যে ব্যক্তি নূতন সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দেয় ও নূতন অবস্থায় আমাদের মানিয়ে নিতে সহায়তা করে তাকেই বুদ্ধি বলা হয়। অনেকের অর্জিত বিষয়জ্ঞান আছে কিন্তু তার প্রখর বুদ্ধি থাকতে হবে এমন কথা নেই। অভ্যাসের ফলে কাজে নৈপুণ্য আসে। কিন্তু বুদ্ধি মূলতঃ সহজাত। আমরা যাকে ব্যক্তিত্ব বলি, আর যাকে আমরা বুদ্ধি বলি এদের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। বুদ্ধি ব্যক্তিত্বের একটি অংশ বা উপাদান। কিন্তু ব্যক্তিত্ব সামগ্রিক।

৪। ব্যক্তিগত পার্থক্য ও শিক্ষা

বর্তমান যুগ হচ্ছে ব্যক্তিস্বাধীনতার যুগ। তাই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্যকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। জনসাধারণের জন্যেই শিক্ষাব্যবস্থা। তবুও যাতে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী নিজ নিজ সত্তার বিকাশলাভে সক্ষম হয়, সেদিকে উদাসীন হওয়া উচিত নয়। তাই তাদের চিত্তবৃত্তি অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

মানুষে মানুষে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। তাই শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে শিক্ষা-পরিকল্পনার সার্থকতা আছে।

জীবনের একই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে নিজ নিজ রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে তার সুযোগ দেওয়া উচিত। কি কি কারণে ব্যক্তিগত পার্থক্য দেখা যায় তা বলা দুরূহ। অনেকের ধারণা জন্মের পর থেকেই যে যার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে জীবনযাত্রা আরম্ভ করে। বিভিন্ন পরিবেশের জন্য ব্যক্তিগত জীবন নানাভাবে রূপায়িত হয়। আবার (১) সহনশীলতা, (২) মানসিক শক্তি ও ধ্যান-ধারণা, (৩) সপ্রতিভতা, (৪) বোধ ও উপলব্ধির ক্ষমতা, (৫) আবেগ ও অন্যপ্রকার চিত্তবৃত্তির বিচার করলে বোঝা যায় কেন মানুষের জীবনে শিক্ষার প্রভাব ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়, এবং শিক্ষার্থীগণ একই পরিণতি লাভ করতে পারে না।

আবার দেখা যায়, পরিবেশের বৈচিত্র্যের জন্যেই মানুষের বিষয়ানুরাগের পার্থক্য ঘটে। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকটি জীবন স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। নিজস্ব ধারায় ব্যক্তিত্বের উপাদান গড়ে ওঠে। কিন্তু প্রকৃতির খেয়ালের ওপর নির্ভর করে মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। তাই এই পার্থক্য নির্ণয় করবার জন্যেই নানা রকম উপায় অবলম্বন করা হয়েছে।

মানুষে মানুষে পার্থক্য নির্ধারণের ব্যবস্থাও হয়েছে। বুদ্ধির পরিমাপের জন্যে অভীক্ষা প্রণয়ন করা উচিত। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে বুদ্ধির তারতম্য আছে বলে অনেকের বিশ্বাস। আবার সমরুচি ও সমবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করবার পর শিক্ষার্থীগণের বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করা হলে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সহজ হয়। আমেরিকা ও রাশিয়াতে এই ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়ায়

শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ের সমস্যা সমাধানের জন্যে বুদ্ধি ও যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। তাদের শক্তি অনুযায়ী কাজে নিয়োজিত করার প্রচেষ্টাও সার্থক হয়। ব্যক্তিগত পার্থক্য নির্ণয়ের প্রচেষ্টার মধ্যে বর্তমান যুগের উইনেটকা বা ডল্‌টন পরিকল্পনা অন্যতম। ডল্‌টন পরিকল্পনার সার্থকতা সব থেকে বেশী দেখা যায়। এই পরিকল্পনায় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী নিজেদের বুদ্ধি, রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ ও শিক্ষালাভ করতে পারে।

সহনশীলতা, ধীশক্তি, স-প্রতিভতা ও আবেগের ওপর ব্যক্তিত্ব নির্ভরশীল। আবার অন্য কতকগুলি উপাদান এই স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যের মূলে দেখা যায়। এই গুলির মধ্যে লিঙ্গ, জাতি, বয়স, পরিণতি, বংশ ও পরিবেশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

মানুষের দৈহিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্য ও উপাদান ক্রমশঃ জটিলতর রূপ ধারণ করে। ফলে এর সঠিক পার্থক্য নির্ণয় করাও অত্যন্ত কঠিন ও সময়-সাপেক্ষ হয়ে ওঠে। ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকলেই এই বিভ্রান্তির হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যায়। তবে একমাত্র পার্থক্য নিরূপণ করাই চরম উদ্দেশ্য নয়। সেই অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা ও অন্যান্য আয়োজন দ্বারা ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশই হল প্রধান লক্ষ্য।

৫। মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষক

শিক্ষা আজ নূতন রূপে দেখা দিয়েছে। তাকে আজ বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করবার চেষ্টা চলছে। শিক্ষাবিজ্ঞান একটি জটিল শাস্ত্র। কারণ, মানুষের মনকে নিয়েই তার সমস্যা। ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব কিভাবে অঙ্কুরের অবস্থা থেকে ক্রমপরিণতি লাভ করে, তা না জানলে শিক্ষাকার্য সার্থক হয়ে ওঠে না। খেয়ালখুশী অনুযায়ী জ্ঞানের বীজ ছড়িয়ে দিলে যে বীজ পূর্ণ পরিণতি লাভ করবে, এমন কোনো কথা নেই। তাই শিশুমনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় শিক্ষকের পক্ষে বিশেষ পাথেয়।

শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞান আজ হাত ধরাধরি করে চলেছে। শিক্ষার লক্ষ্যকে রূপায়িত করতে হলে কখন, কিভাবে, কি কি শিক্ষা দিতে হবে, সে সম্পর্কে চেতনার প্রয়োজন। শিশু কি চায়, কি পেলে সে আনন্দ পায়,

তার গ্রহণ করবার শক্তি কতদূর, সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা দিতে হবে। বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে তথ্য পরিবেশন করলেই শিক্ষণের কাজ সম্পূর্ণ হয় না। তথ্যের চাপে শিশুমন কেবল ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। পূর্বে সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে কোনো বিষয় জানতে বাধ্য করা হত। শিক্ষকের রুদ্রমূর্তি শিক্ষার্থীকে ভয়বিহ্বল করে তুলত। "Spare the rod and spoil the child"—এই নীতিই ছিল জনপ্রিয়। কিন্তু এখনকার নীতি হয়েছে—"Spoil the rod and spare the child". কারণ শিশুর প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি না থাকলে শিক্ষাকার্য যে সার্থক হয়ে উঠতে পারে না, একথা আজ স্বীকৃত হয়েছে।

শিশু জীবন্ত পুতুল বা শিক্ষাগ্রহণের আধার মাত্র নয়। প্রত্যেক শিশুই একটি জীবন্ত সত্তা, একটি বিশিষ্ট প্রাণের প্রতীক, তার মধ্যে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও স্বপ্ন। বহু কবির ভাষায় তাই শিশুর আবেগোচ্ছল প্রাণবন্ত রূপ চিত্রিত হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শিশুদরদী মন রচনা করেছে নতুন শিশুতীর্থ স্নেহের পরশ দিয়ে। রুশোর রসস্নিগ্ধ চিত্ত কেঁদে উঠেছে নিপীড়িত অসহায় শিশুর জন্য। তাইতো তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন শিশুমনের সঙ্গে সান্নিধ্যের সার্থকতার কথা। আর তাঁরই শিষ্য পেস্টালৎসি শিশুকে একটি জীবন্ত অঙ্কুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন ধারা প্রবর্তন করেছেন। আর সে ধারা শিশুর রহস্যময় অন্তরের মাঝে পথ করে নিয়েছে। আবার জন অ্যাডামস (John Adams) শেখানোর দুটি দিকে প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে বিষয়বস্তুর দিকেও যেমন দৃষ্টি দিতে হবে, শিক্ষার্থীর মনোবৃত্তির দিকেও সেরূপ দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন।

শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত থাকলেও বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌গণ তাদের কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে পড়ে, "Jug and mug theory" অর্থাৎ জলপাত্রে জল ভরবার পদ্ধতি। তাদের মতে, শিশুর মন হল শূন্য জলপাত্রের মত, আর তাকে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর জ্ঞান দিয়ে পূর্ণ করাই হল শিক্ষকের কাজ।

দ্বিতীয় মত অনুযায়ী শিশুর নিজস্ব কোন ব্যক্তিসত্তা নেই। সে যেন একটি মৃৎপিণ্ড, যাকে ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষক রূপ দিতে পারেন। এখানে শিশুর মনকে ও ব্যক্তিত্বকে খর্ব করা হয়েছে। তাই এই মতটি প্রতিষ্ঠিত হবার পথে

অনেক সমালোচনা দেখা দিল। আর দেখা দিল শিশুর প্রতি সহানুভূতি ও সজাগ দৃষ্টি। শিশু গতিশীল ও প্রাণবন্ত। অঙ্কুর থেকে যেমন বনস্পতির উদ্ভব, তেমনি শৈশব থেকে পরম পরিণতির পথে মানবশিশুর অভিযান। প্রকৃতিরাজ্যে বাড়ন্ত চারাগাছের মত শিশু ক্রমপরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তাদের এগিয়ে যাবার জন্য শিক্ষক আর অভিভাবক তাঁদের স্নেহযত্নে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

শিশু সম্পর্কে চেতনা যতই বাড়তে থাকল, মনস্তত্ত্বের উপরও তত বেশী দৃষ্টি পড়ল। শিশুকে বুঝবার চেষ্টা, তার আবেগ উচ্ছ্বাসকে বিশ্লেষণ করে সেই অনুযায়ী তাকে শিক্ষা দেবার প্রয়াস শুরু হল। ফলে গড়ে উঠল শিক্ষা-মনস্তত্ত্ব। এটি মনস্তত্ত্বের একটি বিশেষ শাখা। কারণ, শিশুকে কেন্দ্র করেই এর সমস্ত আয়োজন।

এখন শিক্ষা-মনস্তত্ত্ব শিক্ষাদান কার্যে কতটা সহায়ক হয়, তাই বিবেচনা করতে হবে। একদিকে শিক্ষা আর অন্যদিকে মনস্তত্ত্ব—এ দুটির সমন্বয় ঘটল। আগে শিশুর ব্যক্তিত্বের কোনো মর্যাদা না দিয়েই, তার চাওয়া-পাওয়ার দিকে কোন লক্ষ্য না রেখেই শিক্ষার যে আয়োজন করা হত, তাতে শিশু হত উপেক্ষিত ও উৎপীড়িত। কিন্তু মনস্তত্ত্বের কল্যাণে শিশুমনকে জানবার যে সুযোগ ঘটলো তাতে শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এল। কেবল বিষয়বস্তুর পরিবেশন শিশুর কমনীয় প্রাণে বিশেষ কোনো রেখাপাত করে না। তাই শিক্ষকের সব পাণ্ডিত্য শিশুর কাছে অর্থহীন হয়ে যায় যদি না তার শক্তি ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা শুরু হয়।

আজ প্রত্যেকটি শিক্ষকের কাছে শিক্ষামনোবিজ্ঞানের জ্ঞান পরম পাথেয়। শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তির সাথে পরিচিত হবার পথে এর দানকে অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষা হল এমন একটি বিষয়, যা মানুষের সমগ্র জীবনেও শেষ হয় না। এই পরিধি বিরাট ও বিস্তীর্ণ। যে সব প্রভাব শিক্ষাকে সুগম করে তোলে, তার মাঝে শিক্ষকের প্রভাব কম নয়। কেবল শিক্ষাদান-পদ্ধতিই নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের মূল্যও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শিক্ষাদানকার্যে শিশুর প্রতি দরদ যে সবচেয়ে মূল্যবান, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

সৃষ্টিরাজ্যে বৈচিত্র্যই স্বাভাবিক। আকৃতিতে, বুদ্ধিবৃত্তিতে, দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষে মানুষে বিপুল ব্যবধান। আর ঐ ব্যক্তিগত পার্থক্য শৈশব থেকেই

লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্য করা যায়, প্রত্যেকের শক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও রুচি এক নয়। তা সত্ত্বেও যদি একই সামগ্রী একইভাবে সকলের মাঝে পরিবেশন করা যায় তাহলে তার পরিণতি অনুমান করা কঠিন নয়। মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান শিশুকে আবিষ্কার করতে সহায়তা করে। ব্যক্তিগত পার্থক্য নিরূপণ করবার পক্ষেও এর অবদান অসামান্য। তাছাড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ কতখানি বাস্তবে রূপ পেতে পারে, এ বিষয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করতে হলে মনোবিজ্ঞানের সহায়তা নেওয়ার প্রয়োজন। শিক্ষার আদর্শ পরীক্ষার জন্য তাই মনোবিজ্ঞানের মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না।

মনোবিজ্ঞান আজ শিক্ষাজগতে ও শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। কারণ একাধিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগের প্রয়োজন আছে। যেমন ঃ—

(ক) শিক্ষার্থীর শক্তি, সম্ভাবনা ও প্রবণতাকে বোঝবার জন্যে।

(খ) বুদ্ধির তারতম্য বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীর শ্রেণী বিভাগের জন্যে।

(গ) জীবনের বিভিন্ন স্তরবিভাগ ও বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করবার জন্য।

(ঘ) ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও এক ব্যক্তিত্বের উপর আর এক ব্যক্তিত্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিরূপণ করবার জন্যে।

(ঙ) গণমনের সাহায্যে শিক্ষার্থী-চিত্তের সামগ্রিক পরিচয় পাবার জন্য।

(চ) মানব মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের কারণ বিশ্লেষণ করে মানসিক ব্যাধির প্রতিকারের ব্যবস্থা করবার জন্য।

(ছ) শিক্ষা ও শিক্ষণকে মনস্তাত্ত্বিক-নীতি অনুযায়ী সার্থক করে তোলবার জন্য।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে মনস্তত্ত্বকে বাদ দিয়ে আজ শিক্ষার কথা চিন্তা করা যায় না। কারণ, দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক খুব নিবিড়।

কিন্তু কেমন করে মনস্তত্ত্ব শিক্ষাকে সার্থক করে তুলবে এই হল প্রশ্ন। তাই মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক গবেষণায় প্রয়োজন স্বীকৃত হল। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মানুষ কেবল নিজের কথাটিই বেশী করে বুঝতে পারে ; অপরের মনের কথা বুঝতে হলে অন্তর্দৃষ্টির চেয়ে আরো শক্তিশালী প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। এই জন্যেই আচরণবাদ বা আচরণের উপর ভিত্তি করে মানুষের মন বোঝাবার চেষ্টা শুরু হল। কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান হল না ; কারণ,

সব সময়েই আচরণকেই কেন্দ্র করে মানুষের অন্তরের সত্য পরিচয় মেলা কঠিন হয়ে পড়ে। মানুষের ভাব ও ভাবনার গতিপথ যে আঁকাবাঁকা তাই একই রকম আচরণের মূলে বিভিন্ন মনের ভাব লক্ষ্য করা যায়। এই জন্যেই আজ নানাভাবে মানবমনের বিশ্লেষণ করবার প্রয়াস চলেছে। কিন্তু কোনো একটি বিশেষ প্রক্রিয়াকে আজ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলা যায় না। তবে একথা মানতেই হবে যে মনোবিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে সে অপরিহার্য।

৬। শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তি ও শিক্ষা

প্রায়ই দেখা যায়, শিশুর মনোরাজ্যের সঙ্গে সম্যক পরিচিতি না থাকলে শিক্ষাদানে সমর্থ হওয়া যায় না। সাধারণতঃ চঞ্চল শিশুচিত্তের দুটি বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। অনেক সময় অজানার প্রতি কৌতুহল শিশুর মনে আন্দোলনের ঝড় তোলে। সেই অজানার রহস্য ভেদ করবার জন্য তার আয়োজনের সীমা থাকে না। এই অতৃপ্ত বাসনাকে সফল করবার জন্যই সে অজানার সন্ধানে অভিযান শুরু করে। আবার দেখা যায় একান্ত পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে থেকেই শিশুচিত্ত আনন্দরস উপভোগ করবার চেষ্টা করতে থাকে।

শিশুদের মন কখনো হয় নূতনের পূজারী আবার কখনো তাদের মধ্যে পুরাতনকে ধরে রাখবার প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা যায়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু-চিত্তের প্রতি এত সতর্ক দৃষ্টির প্রয়োজন। কারণ শৈশবে যে সব কামনা অপূর্ণ থাকে ভবিষ্যৎ জীবনে এই অতৃপ্তির জন্যই সে নানা প্রকার অস্বাভাবিক পথ খুঁজতে থাকে। অনেক সময় শিশুর অনর্গল প্রশ্নে শিক্ষক ও অভিভাবকগণ ধৈর্যচ্যুত হন। কিন্তু তখন পৃথিবীর বৈচিত্র্যের সঙ্গে শিশুর নতুন পরিচয়। সেই নবীন বয়সে যে এই সমস্ত প্রশ্ন স্বাভাবিক, একথা বেশীরভাগ শিক্ষক ও অভিভাবক ভুলে যান। ফলে শিশুর কৌতুহল অপূর্ণ থেকে যায় ও তার জানবার উৎসাহ যায় কমে।

শিশুকে একই প্রকারের খেলা ও কাজ প্রতিদিন করতে দেখে অনেকে বিরক্ত হন ও শিশুকে নিরস্ত হতে বলেন। কিন্তু আমরা যদি নিজেদের প্রতিদিনের কাজকর্মের কথা একটু ভেবে দেখি তাহলে আমাদের কাজকর্মও বৃহত্তর দৃষ্টি-ভঙ্গির কাছে হাসির খোরাক হয়ে ওঠে। ছোট মেয়েরা পুতুল খেলে। আমাদের বাস্তব সংসার দেখেই তারা কল্পনার রঙ মিশিয়ে নিজেদের খেলাঘর

রচনা করে। এই খেলাধুলার মধ্য দিয়েই তাদের অনুকরণ প্রবৃত্তির বিকাশ দেখা যায়। খেলাঘরের মধ্যেই বৃহত্তর জীবনের প্রতিচ্ছবি তারা খুঁজে পায় ও বড়দের ভূমিকা অনুযায়ী তারা এক একটি ভূমিকা পছন্দ করে নেয়। ভূমিকা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও প্রাধান্য প্রকাশ পায়। তাই খেলা-ধুলা, গল্প, ছড়া ও কাজকর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদান আবশ্যক।

নেতাদের মধ্যে দেখা যায় নিজ প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টা। ঠিক শিশুদের মধ্যেও একই ভাব লক্ষ্য করা যায়। শিশুর জীবনেও প্রকাশের বাধা ঘটলে তা সহজেই প্রকট হয়। তাই মনোমতো কাজ করতে না পেলে তারা লঙ্কাকাণ্ড আরম্ভ করে। কিন্তু তাকে আমরা এই অযথা রাগারাগির হাত থেকে নিবৃত্ত করতেই চেষ্টা করে থাকি। এই ক্রোধ প্রকাশের ক্ষমতা যে প্রাণশক্তিরই পরিচয় সেকথা আমরা ভুলেই যাই। তাই তার ওপর মাঝে মাঝে আমরা ক্রোধ প্রকাশের জন্য নির্যাতনও করে থাকি। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের এই বিষয়ে সজাগ হওয়া উচিত ; তা না হলে জাতীয় জীবনের ক্ষতি হতে পারে।

আজকাল ছাত্রদের মধ্যে নানা অসামাজিক আচরণের কথা শোনা যায়, যেমন চুরি করা। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ছাত্রেরা 'চুরি করছি' এই রকম মনোভাব নিয়ে সব সময় চুরি করে না। ছুরি, বই, খেলনা, পেনসিল প্রভৃতি যা কিছু নেয় সব কিছুরই মূলে আছে সংগ্রহ করবার প্রবল প্রবৃত্তি। সেখানে সে যা দেখে ও যা পায় সেগুলি নিয়ে নিজের বাক্স পূর্ণ করে। এই সংগ্রহ করার নেশা এত প্রবল হয় যে, আপন পর কোনো ভেদাভেদ থাকে না। কোন কোনো ব্যক্তির এই নেশা আজীবন থেকে যায়। অনেক শিশু পথের ঢিল-পাথর থেকে আরম্ভ করে বনফুল প্রভৃতি সংগ্রহ করে নিজেদের ছোট ছোট বাক্স ভর্তি করে আনন্দ পায়। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিশুদের এই সারাদিনের সঞ্চিত জিনিসগুলিকে সামান্য আবর্জনা মনে করে তাদের আদরের বস্তুগুলোকে ফেলে দেওয়া হয়। ফলে তাদের মন থেকে এই মূল্যবান সংগ্রহ-প্রবৃত্তির নির্বাসন ঘটে। অনেক সময় শিশু যা পেতে ইচ্ছা করে আমরা তার প্রতি উদাসীন থেকে যাই। আমাদের এই উদাসীনতার জন্যই তাদের অপূর্ণ কামনা নানা প্রকার কু-অভ্যাসে পরিণত হয়।

সঙ্গকামনা শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ, এর মূলে আছে মানুষের সঙ্গে মেলামেশার প্রবৃত্তি। তাই শ্রেণীর অন্য ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলে ও মেলামেশা করে শিশুরা আনন্দ পায়। তাদের এই প্রবৃত্তির মধ্যে কোনো

কৃত্রিমতা নেই। কিন্তু এই প্রবৃত্তিকে ব্যাহত না করে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করাই শিক্ষকের কর্তব্য।

প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছে আত্মসমর্পণ ও বীরপূজা শিশুদের আর একটি সহজাত প্রবৃত্তি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষকের ভয়ে ভীত হয়ে ছাত্ররা আত্মসমর্পণ করে। আর শিক্ষকও নানাপ্রকার শাস্তির ভয় দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু এইভাবে শাস্তিদানের প্রবৃত্তি থেকে শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিবৃত্ত হওয়া উচিত। কারণ এই প্রবৃত্তি শিশুদের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হয়।

শৈশবকেই শিক্ষার্থী-জীবনের স্বর্ণযুগ বলা চলে। তাদের চিত্তবৃত্তি কোমল থাকার জন্যই চিত্তনিয়ন্ত্রণ সহজ হয়ে থাকে।

বর্তমানে যে বিদ্যালয় পরিবেশ তা সীমিত। শিশুদের কাছে তা কারাগার বললেও অত্যুক্তি হয় না। শিক্ষকগণ যেন প্রাণহীন প্রহরী। কিন্তু এই বিকৃত মনোভাবের জন্য আমরা কাকে দায়ী বলে মনে করব? ছাত্রসমাজ আজ বিভ্রান্ত। ফলে প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য থেকে দিনের পর দিন তারা দূরে সরে যাচ্ছে। তবে একথাও স্বীকার করতে হবে যে জন্ম থেকেই কোনো ছাত্র দুষ্ট-বুদ্ধি নিয়ে পৃথিবীতে আসে না। আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে বর্তমান যুগের ছাত্রদের এই বিভ্রান্তি ও চিত্তের দৈন্য দূর করবার কোনো চেষ্টাই করা হয় না। তাদের সক্রিয় মনের উপযুক্ত খোরাক না দিতে পারার জন্যেই বিদ্যালয়ের এত সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।

প্রতিকূল পরিবেশ ও আদর্শের অভাবের জন্যেই কিশোরদের সুপথে চালিত করা দুরূহ হয়ে উঠেছে। তাই এই চঞ্চল কিশোর ছাত্রদের চালনা করতে হলে চাই ব্যক্তিত্ব, সহানুভূতি ও সহিষ্ণুতা।

আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের কাজে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা খুবই অল্প। শিক্ষাব্যবস্থার দৈন্য ও শিক্ষকগণের দুরবস্থা হচ্ছে এর মূল কারণ।

পরিশেষে এই কথা বলা চলে যে, যতদিন পর্যন্ত ছাত্রগণের সৃজনস্পৃহাকে শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান না দেওয়া হবে, ততদিন প্রকৃত শিক্ষার পথ উন্মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

৭। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষা

ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিসত্তার বিকাশ শিক্ষার সামগ্রিক লক্ষ্য। এই ব্যক্তিসত্তা

বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। ফুলের পরিচয় তার নিজস্ব সৌরভে, তেমনি ব্যক্তির পরিচয় তার ব্যক্তিত্বে। একটি ব্যক্তিকে আমরা যা দিয়ে অনুভব করি সেটি হচ্ছে তার ব্যক্তিত্ব। তার আকৃতি, প্রকৃতি, বুদ্ধি, আচরণ, আবেগ, চিন্তন সবকিছু নিয়েই তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। দেখা যায় মানুষের ব্যক্তিত্ব যত সুসংহত হয় ততই আসে তার জীবনের পরিণতি। এই যে পরিণতি সেটাই সাধনার ধন। অবশ্য কয়েকটি সহজাত শক্তি ও প্রবণতাকে নিয়ে মানুষ জন্মায়। কয়েকটি প্রবৃত্তি তার আচরণকে প্রভাবিত করে। কিন্তু শিক্ষার কাজ হলো ব্যক্তিসত্তাকে বাঞ্ছনীয় পথে পরিণতি দেওয়া। একাধিক মনোবিজ্ঞানী ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে তার নানাদিকে আলোকপাত করেছেন। কখনো দার্শনিক চিন্তা, কখনো বা সামাজিক চেতনা, আবার কখনো মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ব্যক্তিসত্তার সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। যাই হোক না কেন ব্যক্তিত্বকে বা ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিভাবে পরিবেশ এই ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশে সহায়তা করে সে সম্পর্কে অলপোর্টের (Allport) মতবাদ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন যে ব্যক্তিসত্তা বলতে কয়েকটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যকেই বোঝায় না, একটি পরিবর্তনীয় সক্রিয় সমন্বয়কে বোঝায়। বিভিন্ন গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবেশের সংস্পর্শে এসে মার্জিত হতে থাকে। আর তা ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে একটি সক্রিয় সত্তা সংগঠন গড়ে তোলে। প্রতিটি ব্যক্তিত্বের মধ্যে এই সমন্বয়ের যে রূপ ধরা পড়ে তার মধ্যে আছে একটি স্বাতন্ত্র্য, একটি অভিনবত্ব। অলপোর্টের মতে জৈব ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ের ফলে ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণের জন্ম হয়। তাই তিনি বলেছেন—"Personality is the dynamic organisation within the individual, of those psycho-physical systems that determine his unique adjustment to his environment."

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ব্যক্তি নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতি রেখে চলতে গিয়ে অভিযোজনমূলক কয়েকটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আর সেই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। দেখা যায় যে এক একজন এক একটি অভিযোজনমূলক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। এই একক বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যক্তিসত্তার পরিচায়ক। মনোবিদ্ অলপোর্ট ব্যক্তিসত্তা-বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে বিভেদীকরণ,

সমন্বয়ন, পরিণমন, শিখন প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটে। ব্যক্তিসত্তার বহুমুখী বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের সংস্পর্শে এসে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বলা হয় সংলক্ষণ (Personality traits)। সংলক্ষণগুলি জৈব মানসিক প্রবণতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মনোবিদ্ ক্যাটেল (Cattel) ও গিলফোর্ড (Guilford) ব্যক্তিসত্তার ভিন্ন ভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। অলপোর্ট যে পাঁচশ্রেণীর সংলক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে আছে বুদ্ধি, স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াশীলতার মনোভাব, মেজাজ, আত্মপ্রকাশ ও সামাজিকতা। ক্যাটেল যে ষোলটি সংলক্ষণের কথা বলেছেন তাদের মধ্যে বুদ্ধিসত্তা, প্রক্ষোভিক আলোড়ন, প্রক্ষোভিক স্থায়িত্ব ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সংলক্ষণ উল্লেখযোগ্য।

ব্যক্তিসত্তার শ্রেণীবিভাগ করার রীতি অনুযায়ী ইয়ুঙ্ (Jung) ও ক্রেসমার (Kretschmer), সেলডন (Sheldon) এবং স্টিভেন্স (Stevens) ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। ইংরাজীতে একে বলা হয় ব্যক্তি-সত্তার 'টাইপ' (personality type)। ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে বিচার করে এই সব 'টাইপ'-এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন,

মনোবিদ্	শ্রেণীবিভাগ
ইয়ুঙ্	(১) বহির্মুখী ব্যক্তিসত্তা (২) অন্তর্মুখী ব্যক্তিসত্তা (৩) উভমুখী ব্যক্তিসত্তা।
ক্রেসমার	(১) পিক্নিক্, (২) অ্যাস্থেনিক, (৩) হাইপো-প্ল্যাস্টিক, (৪) অ্যাথলেটিক।
সেলডন ও স্টিভেন্স	(১) এন্ডোমর্ফ, (২) মেসোমর্ফ, (৩) এক্টোমর্ফ (দৈহিক গঠনের দিক থেকে)
সেলডন ও স্টিভেন্স	(১) ভিসেরোটৌনিক, (২) সোমাটোটৌনিক, (৩) সেরিব্রোটৌনিক (মানসিক গঠনের দিক থেকে)

ব্যক্তিত্বের শ্রেণীবিভাগ যাই হোক না কেন মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যার মধ্যে যে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ সুস্পষ্ট তার সেই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকাশ ঘটাই স্বাভাবিক। তবে যদি কারো মধ্যে কোনো অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তিত্বের আভাস পাওয়া যায় তাহলে তা পরিমার্জনের প্রয়াস করাই সংগত। সেখানে শিক্ষা অভ্যাসগঠন ও নতুন পরিবেশের সংযোজন ফলপ্রসূ

হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করা সম্ভবপর হয়। আর তার জন্য নানাপ্রকারের অভীক্ষা বা test-এর প্রচলন আছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি অনুসারে ব্যক্তিত্বের এই মূল্যায়ন নির্দেশনার পথে সহায়ক। কার মধ্যে কোন্ ব্যক্তিত্ব প্রকট তা জানতে পারলে কোন্ বৃত্তি কার পক্ষে উপযোগী তা জানা সম্ভব হয়। এজন্য ব্যক্তিত্বের পরিমাপ ফলপ্রসূ হয়। যেসব অভীক্ষা ব্যক্তি-সত্তার পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, রসাক-ইংক-ব্লট অভীক্ষা (Rorschach Ink-blot test), আদর্শায়িত প্রশ্নগুচ্ছ (standardized questions), অভিক্ষেপক অভীক্ষা (projective test , অনুসঙ্গের অভীক্ষা (association test), এছাড়া ব্যক্তিত্ব পরিমাপের আরও অনেক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। যেমন, রেটিং (rating) অর্থাৎ তুলনামূলক মূল্যায়ন, কৃত্রিম জীবন পরিস্থিতিতে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষাগারে পরীক্ষণ ইত্যাদি। বাস্তবক্ষেত্রে এই সব পদ্ধতির প্রয়োগ সীমিত। কারণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসে এবং তার মধ্যে সঙ্কীর্ণ পরিসরে তাদের সম্ভব পর্যবেক্ষণের অবকাশও যথেষ্ট নয়। অথচ শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্য জানতে না পারলে শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দুর্বলই থেকে যাবে। একমাত্র তখনই শিক্ষায় নির্দেশন সম্ভব হয় যখন প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য, তার রুচি, আগ্রহ ও প্রবণতা স্পষ্টভাবে জানা যায়। কেবল তাই নয়, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে যে সব অপূর্ণতা থেকে যায় তার প্রতিকারের প্রয়াস শিক্ষার আওতায় আসে। অবশ্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য তথ্যপঞ্জী (cumulative records) রাখলে ব্যক্তিত্বের পরিমাপের কাজ কিছুটা সম্ভব হবে। তবে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই প্রতিটি শিক্ষার্থী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে যথাসম্ভব শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয় পরিস্থিতিতে যে সব পর্যবেক্ষণের সুযোগ আছে তা গ্রহণ করতে হবে এবং নির্দিষ্ট ধারায় বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে তাদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কেবলমাত্র শ্রেণীকক্ষেই নয়, খেলার মাঠে, বিদ্যালয়ের নানা উৎসব আয়োজনে, বিতর্ক সভায়, আবৃত্তি প্রতিযোগিতায়, আলোচনায়, দলগত কাজে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিসত্তার নানা দিক ধরা পড়ে। একটি বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি গড়ে তুলতে পারলে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে জানা যায়। এর জন্যে চাই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও শিক্ষকদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ। প্রতিটি বিদ্যালয়েই দু'একজন বিশেষজ্ঞ

শিক্ষক থাকলে শিক্ষায় নির্দেশনার কাজ আরও সহজ হয়। কারণ তারই নেতৃত্বে ও অন্যান্য শিক্ষকদের সহযোগিতায় এই ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন সহজ হয়।

কেবল মূল্যায়নই নয়, ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা বিদ্যালয়ের দায়িত্ব। তাই বিদ্যালয় পরিবেশকে অনুকূল ও বৈচিত্র্যময় করে তুলতে হবে, যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশের পথ খুঁজে পায়। দায়িত্ববোধ, আত্ম-নির্ভরতা, আত্মপ্রত্যয়. অধ্যবসায় ইত্যাদি কয়েকটি গুণ না থাকলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। তাই প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে যাতে এই গুণগুলি ক্রমশঃ সঞ্চারিত হয় তার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি ও পরিবেশ রচনা করার সার্থকতা আছে। শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক যত নিবিড় হবে ততই শিক্ষকের আপন ব্যক্তিত্বের অভাব শিক্ষার্থীর ওপরে এসে পড়বে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (inter-action) যত বাড়বে ততই পারস্পরিক অভিজ্ঞতার বিনিময় ঘটবে, ততই সহযোগিতার ভিত্তিতে আত্ম-উন্মোচন ঘটবে।

বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম-অনুযায়ী প্রত্যেকটি জীবন স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। আপনার নিজস্ব ধারায় ব্যক্তিত্বের উপাদান গড়ে ওঠে। কিন্তু প্রকৃতির খেয়ালের ওপর নির্ভর করে মানুষ নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে পারে না। তাই এই পার্থক্য নির্ণয় করার জন্যেই নানা রকম উপায় অবলম্বন করা হয়েছে।

প্রথমে মানুষে মানুষে পার্থক্য ও তারতম্য কত দূর তা নির্ধারণের জন্যে কয়েক প্রকার ব্যবস্থাও হয়েছে। বুদ্ধির পরিমাপের ব্যবস্থা মনীষিগণের মতে সব থেকে আগে করা উচিত। অধিকাংশ ব্যক্তির ধারণা, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে বুদ্ধির তারতম্য সব থেকে বেশী। কিন্তু সমরুচি ও সমবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায় তাই মনে হয়—"No two persons are alike."

এখন কি উপায়ে বুদ্ধির পরিমাপের ব্যবস্থা করা হয়েছে, দেখা যাক। প্রথমে একই বয়সের কতকগুলি ছাত্রছাত্রীর ওপর ভিত্তি করে বুদ্ধির একটা সাধারণ মাপকাঠি ঠিক করা হয়। এই সাধারণ মাপকাঠি দিয়েই তাদের মোটামুটি বুদ্ধি ও ধীশক্তি বোঝা যায়। তখন তাকে একটি বিশেষ বয়সের পর্যায়ে ফেলা হয়। ইংরেজীতে এর নাম Mental age. এই বয়সকে তার যথার্থ বয়স দিয়ে ভাগ করে I. Q. (মানসিক মান) পাওয়া যায়। তা দিয়ে

প্রত্যেকের একটি তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করা হয় ও এর ফলে প্রত্যেকের বুদ্ধি সম্পর্কে একটা ধারণা হয়।

কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপারেই নয়, বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ভিন্ন বিষয়ে ছাত্রদের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করবার নতুন উপায় আবিষ্কার করার চেষ্টা চলছে।

শিক্ষাক্ষেত্রের এই প্রয়োজনীয়তা যে শুধু আজকের দিনেই স্বীকার করা হচ্ছে তা নয়; অতীতে প্লেটো ও অন্যান্য মনীষিগণ ব্যক্তিগত চিত্তবৃত্তি অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন বুঝেছিলেন। প্লেটো, গল্টন প্রভৃতি মনীষিগণের বহুদিনের অক্লান্ত সাধনার ফলেই আজ ব্যক্তিগত পার্থক্য ও মেধা, রুচি, শক্তি, সহিষ্ণুতা, আবেগ, স্থৈর্য, বৃত্তিবৈচিত্র্য অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থার জন্যে সকলে তৎপর হয়েছে। প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র ও সাধারণ ছাত্রের একই পাঠন ব্যবস্থা থাকার জন্যেই তাদের ব্যক্তিগত জীবনের যথাযথ বিকাশ সম্ভব হয় না।

আজকের দিনে বৈচিত্র্য নির্ধারণ করবার পর শিক্ষার্থীগণের বুদ্ধি-বৃত্তি অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হলে, প্রত্যেকের স্বাধীন সত্তার বিকাশ-লাভ সহজ হয়। প্রত্যেকের কাজে আপন ব্যক্তিত্ব, রুচি, শক্তির পথ আপনা থেকেই উন্মোচিত হবে। আমেরিকা ও রাশিয়াতে এই নিয়ম অনুসারে শিক্ষা-প্রণালীর ব্যবস্থা করায় যথেষ্ট সাফল্য লাভ ঘটেছে। শুধু পাশ্চাত্যেই নয়, আমাদের স্বাধীন দেশে এই শিক্ষাব্যবস্থার যত দ্রুত প্রচলন হয়, ততই মঙ্গল।

গত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য-নির্ণয়ের সমস্যা সমাধানের আয়োজন চলে আসছে। ফলে বুদ্ধি ও যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীগণকে শিক্ষা-ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া ও তাদের শক্তি অনুযায়ী শিক্ষার্থীগণকে কাজে নিয়োজিত করার প্রচেষ্টা দেখা গেছে। সেজন্য 'ব্যাটাভিয়া পরিকল্পনা' থেকে আরম্ভ করে শিক্ষাপদ্ধতির নানা প্রকার উপায়ও অবলম্বন করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত পার্থক্য-নির্ণয়ের প্রচেষ্টার মধ্যে বর্তমান যুগের উইনেট্‌কা বা ডল্টন-পরিকল্পনা অন্যতম।

ডল্টন-পরিকল্পনার সার্থকতা সব থেকে বেশি দেখা যায়। এই পরিকল্পনায় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী নিজেদের বুদ্ধি, রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ ও শিক্ষা লাভ করতে পারে।

ব্যক্তিগত পার্থক্য সহনশীলতা, ধীশক্তি, সপ্রতিভতা ও আবেগের প্রাবল্য প্রভৃতি ব্যক্তিগত চিত্তবৃত্তি ও দৈহিক অবস্থার ওপর অনেকটা নির্ভর করে। আবার অন্য কতকগুলি কারণকেও এই স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যের মূলে দেখা যায়। এইগুলির মধ্যে লিঙ্গ, জাতি, বয়স, পরিণতি, বংশগতি ও পরিবেশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

মানুষের দৈহিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্য ও উপাদান ক্রমশঃ জটিলতার রূপ ধারণ করে। ফলে, এর সঠিক পার্থক্য নির্ণয় করাও অত্যন্ত কঠিন ও সময়-সাপেক্ষ হয়ে ওঠে। তীক্ষ্ণ, ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকলেই এই বিভ্রান্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

তবে একমাত্র পার্থক্য নিরূপণ করাই চরম উদ্দেশ্য নয়; সেই অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা ও অন্যান্য আয়োজন দ্বারা ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশই হল প্রধান লক্ষ্য।

৮। দেহ-মন ও তার শিক্ষাগত তাৎপর্য

দেহ ও মনের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। তাই মনের সুস্থতার ওপর দেহের সুস্থতা নির্ভর করে, আবার শরীর অসুস্থ হলে মনেরও স্ফূর্তি থাকে না। দেহযন্ত্রটি খুবই জটিল ভিন্ন ভিন্ন অংশের মাধ্যমে এই দেহ-যন্ত্র কাজ করে। তাই দৈহিক প্রক্রিয়া লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এর মধ্যে আছে স্নায়ুতন্ত্র, গ্রন্থিতন্ত্র, মস্তিষ্ক ইত্যাদি। ব্যক্তির আচরণকে বুঝতে হলে, তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করতে হলে এই স্নায়ুতন্ত্র, ও মস্তিষ্কের কার্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। দেহের মধ্যে যে সব যন্ত্র কাজ করে তাদের বলা হয় কর্মেন্দ্রিয়। এই কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে উত্তেজনা গ্রহণ করা হয় সেই অনুযায়ী কাজ করাও হয়। দেহের ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পেশী, গ্রন্থি সব কিছুর মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন করলে তবেই মানুষ স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু ভাবে কাজ করতে পারে। একদিকে পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা আসে, আর সেই উদ্দীপনা অনুয়ায়ী অন্যদিকে মানুষের প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। প্রতিক্রিয়া ও উদ্দীপনার মধ্যে সুসমঞ্জস সম্পর্ক স্থাপন করাই বাঞ্ছনীয়।

মস্তিষ্কের কাজ হল স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে মানসিক প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করা। মস্তিষ্কই সকল মানসিক প্রক্রিয়ার উৎস। স্নায়ুতন্ত্র যেমন উত্তেজনা সঞ্চার

করে, তেমনি স্নায়ুকোষের আর একটি কাজ পরিবহন করা। এই স্নায়ুকোষ অনেক প্রকারের আছে। যেমন—অন্তর্মুখী স্নায়ুকোষ, বহির্মুখী স্নায়ুকোষ ও সংযোজন-স্নায়ুকোষ। স্নায়ুতন্ত্রের মূল যে তিনটি অংশ আছে তাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, উপান্ত স্নায়ুতন্ত্র এবং স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের কাজ ভিন্ন ভিন্ন। তার মূল অংশ হল মস্তিষ্ক, আর এই মস্তিষ্কই বিশেষ বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী। উপান্ত স্নায়ুতন্ত্রের কাজ হল কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও বাইরের জগতের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা।

মানুষের আচরণ ও জীবনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া আংশিকভাবে স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। নানারকম প্রতিক্রিয়ার চাপ (arc) সৃষ্টি সম্ভব হয় বিশেষ প্রক্রিয়ার ফলে। ইন্দ্রিয় থেকে শুরু করে যে পথ দিয়ে ঘুরে একটা বিশেষ উত্তেজনা কর্মেন্দ্রিয়ে যায় সেই পথটিকে বলা হয় চাপ। এই চাপগুলির দৈর্ঘ্য এই পথের ওপর নির্ভর করে। এদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (ক) অবচেতন বা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার চাপ Unconscious reflex arc), (খ) চেতন প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া (Conscious reflex arc), (গ) বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন কাজের চাপ (Arc involving higher mental activities). সংক্ষেপে বলা যায় আমাদের কাজের প্রকৃতি এবং জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিক্রিয়া এই স্নায়ুতন্ত্রের ওপর আংশিকভাবে নির্ভর করে।

একদিকে যেমন স্নায়ুতন্ত্র, অন্যদিকে গ্রন্থিতন্ত্রও আমাদের ব্যক্তিত্বের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক গুণসম্পন্ন রস ক্ষরণ করে তার দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়াকে সহায়তা করা গ্রন্থিতন্ত্রের কাজ। এই গ্রন্থিগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়: (১) পিটুইটারি গ্রন্থি, (২) থাইরয়েড গ্রন্থি, (৩) থাইমাস (Thymus), (৪) এড্রিনাল গ্রন্থি, (৫) যৌন গ্রন্থি, (৬) পিনিয়েল (Pineal).

দেহের মধ্যে অবস্থিত এই সব অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি নানাভাবে ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশে সহায়তা করে। এরা যে হরমোন নিঃসরণ করে তা কেবলমাত্র দেহ-যন্ত্রকেই প্রভাবিত করে না, ভিন্ন ভিন্ন মানসিক প্রতিক্রিয়ার ওপরও তাদের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। এই হরমোনের প্রভাবে বুদ্ধি, অনুভূতি, যৌনজীবন ও সামগ্রিক ব্যক্তিসত্তার তারতম্য ঘটে। তাই দেখা যায় যে, স্নায়ুতন্ত্র ও গ্রন্থি-তন্ত্রের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে অনেক সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীর

প্রতি সুবিচার করতে পারেন না। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেহতাত্ত্বিক ভিত্তির তাৎপর্য আছে।

১। দেহ-মনের সম্পর্ক

আমাদের আহার, বিহার, আরাম, বিরাম প্রভৃতি সমস্ত শারীরিক এবং মানসিক কাজের নিয়ন্ত্রণকর্তা মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক তার কাজ চালায় আমাদের দেহের স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্য নিয়ে। আমাদের দেহ অসংখ্য কোষের সমষ্টি। এই কোষগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই তাদের পরস্পরের মধ্যে যোগসাধন করে তাদের নির্দিষ্ট কাজে লাগাবার ভার স্নায়ুমণ্ডলীর উপর।

শরীরের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি কতকগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। এই ইন্দ্রিয়গুলিই স্নায়ু-শিরার সাহায্যে মস্তিষ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এই যোগাযোগের সংঘটন খুব তাড়াতাড়িই হয়। সাধারণ কাজে লাগে আধ সেকেণ্ড সময়। আমাদের মস্তিষ্ক থেকে ডান দিকে আর বাঁদিকে বারটি করে স্নায়ু শরীরের বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য নিচের দিকে নেমেছে। এই স্নায়ু-শিরাগুলিই আমাদের ঘ্রাণ, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি বিষয়ে সাহায্য করে। মস্তিষ্ক থেকেও তেমনি একত্রিশ জোড়া স্নায়ু শরীরের নানা জায়গার সঙ্গে যোগ স্থাপন করে। এইসব স্নায়ু বিভিন্ন জায়গার খবর মেরুদণ্ডে পৌঁছে দেয়। দেরুদণ্ড তখন সেই খবর মস্তিষ্কে জানায়। আমাদের দেহের ঘ্রাণ, স্পর্শানুভূতি, শ্রবণ, বুদ্ধি প্রভৃতি এই ৮৬টি স্নায়ুর উপর নির্ভরশীল। এছাড়া, স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলী নামে আর একরকম স্নায়ুমণ্ডলী আছে। এরা মেরুদণ্ডের দুপাশে থাকে। এরা ক্রোধ, উত্তেজনা, অনুভূতি প্রভৃতির পিছনে কাজ করে। আর একটি স্নায়ুমণ্ডলী আছে যে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলীর কাজগুলির বিপরীত কাজ করে। ফলে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলীর কাজগুলি বাধা পেয়ে সংযত হয়ে পড়ে।

স্নায়ুকোষ (Neurons)

প্রতিটি স্নায়ুই বহু নিউরনের সমষ্টি। এই নিউরনের সাহায্যেই স্নায়ুগুলি ইন্দ্রিয়-সংগৃহীত খবরসমূহ মস্তিষ্কে পাঠায়। স্নায়ু-শিরাদের তিনভাগে ভাগ করা হয়—

(১) জ্ঞানদা (Sensory), (২) কর্মদা (Motor), ও (৩) সংযোগী (Connectives)। Sensory ও Motor Nerve যথাক্রমে অনুভূতি জাগায় ও কাজ করার বলে এদের ইংরজীতে afferent ও efferent nerve বলে।

জ্ঞানদা (Sensory)

এরা ইন্দ্রিয়ের আহৃত জ্ঞান মস্তিষ্কে পেঁছে দেয়। এরা কেবলমাত্র আবেগগুলি ভিতরে পেঁছে দেয়। তাই এদের ইংরাজীতে in-carrying nerves বলা হয়।

কর্মদা (Motor)

এরা মস্তিষ্ক থেকে মস্তিষ্ক-নির্দেশিত আবেগ পেশী বা গ্রন্থিতে পেঁছে দেয়। এদের কাজ আবেগকে বাইরে নিয়ে যাওয়া। তাই এদের ইংরাজীতে বলে out-carrying nerves.

সংযোগী (Connectives)

কেবলমাত্র অনুভূতি ও কাজের মধ্যে যোগাযোগ সাধন করে।

প্রত্যেক স্নায়ুকোষের একটি করে কেন্দ্রীয় কোষ থাকে। কেন্দ্রীয় কোষ থেকে একদিকে একটা সুতোর মতো শাখা বের হয়। একে বলা হয় axon. আবার অন্যদিক থেকে কতকগুলো সরু সরু সুতোর মত অংগ বের হয়—এগুলিকে dendron বলা হয়। axon-গুলি আধ ইঞ্চি থেকে কয়েক ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। axon-গুলি সাধারণতঃ সরল। dendron-গুলি অনেকটা ঠিক গাছের প্রধান মূলের সংগে লাগানো শাখামূলগুলির মত। এরা সব সময় শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে থাকে। কতকগুলি স্নায়ুকোষ একত্র হয়ে gangila সৃষ্টি করে। স্নায়ুকোষগুলি কর্মধারা অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত।

Synapse—বিভিন্ন স্নায়ুকোষের axon-এর শেষ অংশ ও dendron পরস্পর যুক্ত হয়ে synapse-এর সৃষ্টি করে। এই যোগাযোগের সময় এরা এক সংগে জুড়ে যায় না। এই সাইন্যাপ্সের ভিতর দিয়েই এক স্নায়ুকোষ দিয়ে অন্য স্নায়ুকোষে আবেগ সহজেই পথ করে নেয়। এইভাবে অসংখ্য synapse-এর মধ্য দিয়ে আবেগ মস্তিষ্কে পেঁছয়। এর গতিপথ একমুখী। প্রতিদিন আমাদের শরীরের কোটি কোটি স্নায়ুকোষ কাজ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

এই কাজের ফলে তাদের রসদ যায় ফুরিয়ে। তখন আসে অবসাদ। রাত্রে আমাদের ঘুমের মধ্যে স্নায়ুকোষগুলি নিজেদের রসদ সংগ্রহ করে পুষ্ট হয়ে পরদিনের কাজের জন্য অপেক্ষা করে। আমরা দেখি মদ খেয়ে লোকে দুঃখ ভোলে, মর্ফিয়া নিয়ে রোগের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পায়। এগুলো আর কিছুই নয়, এই সব অতি উত্তেজক জিনিসগুলো স্নায়ুসন্ধির বাধাকে প্রবল করে তোলে। ফলে দুঃখযন্ত্রণার অনুভূতিগুলো আর মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছয় না। তাই ঐ সময়টায় দুঃখযন্ত্রণা আর টের পাওয়া যায় না।

এই স্নায়ুসন্ধিগুলি ভেদ করে যেতে উত্তেজনার প্রথমটা কিছু অসুবিধা হয়। বার বার যাতায়াতের ফলে পথ কিছু সুগম হয়। কারণ স্নায়ুসন্ধি-সমূহ সহজে কোনো উত্তেজনাকে তার নির্দিষ্ট পথে যেতে দেয় না, বাধা দেয়। ঐ সব স্নায়ুসন্ধির ভিতর দিয়ে যাতায়াত করে পূর্ববর্তী উত্তেজনা তার নিজের পথকে সহজ করে নিয়েছিল, নতুন উত্তেজনা এসে সেই আগের পথটি ধরে যায় না। তার ফলেই এই বাধার সৃষ্টি হয়। আমরা যখন নতুন কোনো কিছু শিখি, সে কবিতাই হোক, অংকই হোক বা অন্য কিছুই হোক, প্রথমবার আমাদের একটু অসুবিধা হবে। তারপর বারে বারে অভ্যাস করতে করতে জিনিসটা সহজ হয়ে যাবে। কারণ তখন স্নায়ুসন্ধির পথটি সরল হয়ে গেছে। সেখানে আর বাধা নেই, শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই বারংবার কোন কাজ করার অভ্যাসের একটা দাম আছে। অনবরত কাজের জন্য স্নায়ুসন্ধিগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন আর তার কাছে থেকে ভাল কাজ পাওয়া যায় না। তাই তার ক্লান্তি দূর করার চেষ্টা করতে হয়। সেটা খানিকটা বিশ্রামের সাহায্যে সম্ভবপর হয়। অনেক সময় দেখা যায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বহুক্ষণ একটা কবিতা নিয়ে বসে আছে। কিছুতেই মুখস্ত করতে পারছে না। সেই সময় তাদের যদি বলা হয় 10 মিনিট ঘুরে এসো, তারপর মুখস্ত করো তাহলে ভাল ফল পাওয়া যায়। অনেক সময় গভীর রাত্রে ক্লান্তি ও অবসাদ নিয়ে পরীক্ষার পড়া পড়তে হয়। কিছুই মনে থাকে না। কিন্তু পরদিন ভোরে সেই পড়াই সহজে হয়ে গেল। আবার অনেকে রাত্রিতে চা, কফি প্রভৃতি খেয়ে ঘুম তাড়িয়ে পড়াশুনো করে। চা বা কফি—এই ধরনের জিনিস—শরীরে উত্তেজনা আনে। উত্তেজনায় স্নায়ুসন্ধির বাধা কিছুটা দূর হয়। কিন্তু এইভাবে উত্তেজক দ্রব্যের সহায়তায় কাজ করা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

মস্তিষ্ক—প্রাণিজগৎকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বর্তমান

মানুষের এই পরিণতি হয়েছে একটা ক্রমবিবর্তনের ধারা বেয়ে। আচার-আচরণে সে অন্য সকল প্রাণীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তার এই শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে তার বোধ-কেন্দ্র মস্তিষ্ক। সমস্ত প্রাণীর চেয়ে তার মস্তিষ্কের গঠন ও আকার উন্নততর। প্রাণিজগতে এককোষী অ্যামিবার বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই। সে তার ঐ একমাত্র কোষ দিয়েই সবকিছু করে। সামান্য অ্যামিবা থেকে বহুকোষী মেরুদণ্ডী প্রাণী এসেছে, আর সেই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভিতর আস্তে আস্তে বোধ এসেছে। আবার মানুষের মধ্যে সেই বোধ পূর্ণতা পেয়েছে।

কিন্তু মস্তিষ্কের পরিমাপটাই সবচেয়ে বড় নয়। দেখা গেছে বহু মনীষির মস্তিষ্কের আকার অতি সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক কম। আলোকপ্রাপ্ত সভ্য মানুষের চেয়ে একজাতের এস্কিমোর মস্তিষ্ক বৃহৎ হলেও তাদের বুদ্ধি বেশী নয়। বুদ্ধি নির্ভর করে অন্য বিষয়ের উপর। বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করে মগজের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন নিউরন যত কাছাকাছি হয়ে সাইন্যাপ্সের সৃষ্টি করেছে তার উপর।

যার মাথায় যত বেশী এই কাজ হবে তার বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য তত বেশী। ইতর প্রাণীর মস্তিষ্কে এই সাইন্যাপ্সের সংখ্যা খুবই কম থাকে।

আমাদের মাথার নিউরনগুলো দুই রঙের হয়—সাদা এবং ধূসর বা ছাই রঙের। যার মাথায় যত ধূসর বা ছাই রঙের নিউরন আছে তার বুদ্ধির কৌশল তত বেশী। সাদা জিনিসের কাজ মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। শৈশবে এগুলি তৈরী হয় না আর বার্ধক্যে এগুলির অবনতি হয়। সেইজন্য এই দুই সময়ে বুদ্ধি ক্ষীণ হয়ে যায়। ধূসর বা ছাই রঙের জিনিস মানুষের অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়, চিন্তার পরিচালনা, বিচারবিবেচনা প্রভৃতির সহায়।

মস্তিষ্কের মধ্যে যে ছোট বড় খাদ আছে, তা যার যত বেশী হবে তার ছাই বা ধূসর রঙের জিনিস তত বেশী থাকবে। তাই বুদ্ধিমান লোকদের মস্তিষ্ক বেশী কোঁচকানো, তার খাদের সংখ্যাও বেশী।

আমাদের দেহের ডানদিকের সমস্ত শিরা উপশিরা মস্তিষ্কের বাঁ ধারে এসে মিলেছে আর বাঁ ধারের শিরা উপশিরাগুলি এসে মিলেছে মস্তিষ্কের ডান দিকে। তাই আমাদের ডানদিকের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিয়ন্তা বাম মস্তিষ্ক, আর বাঁদিকের নিয়ন্তা ডানদিকের মস্তিষ্ক।

গুরু মস্তিষ্ক (cerebrum) আমাদের মাথার অধিকাংশ স্থান জুড়ে

রয়েছে, ঘাড়ের একটু ওপর থেকে আরম্ভ করে সমস্ত মাথাটাই এর অধিকারে। প্রধানতঃ দুভাগে বিভক্ত cerebrum এই স্নায়ুমণ্ডলীর আবেগকে বয়ে আনে। আর এখান থেকেই সেই আবেগের প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট অংগে গিয়ে পেঁছিয়। cerebrum-এর এক এক অংশ এক এক কাজ করে। যে অংশগুলিতে আবেগ এসে তার উপস্থিতি জানায় তাকে বলে sensory area. আর যে জায়গাগুলি থেকে তার প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট হয় তাকে বলে motor area. আর যে এই অংশগুলির মধ্যে সংযোগ করে তাকে বলে connective area. লঘু মস্তিষ্কের (cerebellum) অবস্থিতি cerebrum এর নীচে আর ঘাড়ের ওপরে।

আমাদের দেহে বহু পেশী আছে। আমাদের বহু কাজ আছে যা করতে দেহের একাধিক পেশীর সাহায্য নিতে হয়। cerebellum এই সব পেশীকে নিয়ন্ত্রিত করে।

ঘাড়ের নীচের থেকে আরম্ভ করে ছোট ছোট হাড়ের সমষ্টি হল মেরুদণ্ড। এরা সোজা নীচের দিকে নেমে গেছে। এই ছোট ছোট হাড়গুলির মধ্যে আছে মেরুমজ্জা। প্রত্যেক হাড়ের সংযোগ থেকে ৩১ জোড়া স্নায়ু বেরিয়েছে। এইগুলি মেরুদণ্ডের দুই পাশ থেকে বেরিয়ে আবার একসংগে মিশেছে। এইগুলির আবার বহু শাখা প্রশাখা আছে। এইগুলি বিভিন্ন পেশী, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে মিশেছে।

আমাদের প্রতিদিনের খুঁটিনাটি সমস্ত কাজের মূলে পেশী। মস্তিষ্ক প্রতিটি আবেগের একটি করে প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট পেশীতে পাঠায়। পেশী তা কাজে পরিণত করে। দেহের সমস্ত পেশীকে আমরা প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করতে পারি, ঐচ্ছিক আর অনৈচ্ছিক। সাধারণতঃ বাহ্য দেহের কাজে আমরা যে পেশীগুলোকে ইচ্ছামত চালনা করতে পারি সেগুলিকে বলে ঐচ্ছিক পেশী। কিন্তু আমাদের দেহের ভেতরের যে কাজগুলো আপনা থেকেই হয় সেই কাজে পেশীগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে। এগুলি আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। তাই এরা অনৈচ্ছিক। যেমন, রক্তচলাচল, পরিপাক, শ্বাসপ্রশ্বাস—এগুলি অনৈচ্ছিক পেশীর কাজ। কলকব্জা যন্ত্রপাতির কাজের মূলে যেমন লিভার থাকে, তেমনি পেশীদের কর্মশক্তির মূলেও আছে বিভিন্ন রকমের লিভার। আমাদের হাত পা মাথা ইত্যাদি নানা অংগপ্রত্যংগ নাড়াবার পেছনে কাজ করে নানারকমের লিভার। ঐচ্ছিক পেশীগুলিকে সঙ্কোচনশীল পেশীগুলির সাহায্যে আমরা কোনো জিনিসকে টানতে পারি, চাপ দিতে পারি।

আর প্রসারণশীল পেশীদের দিয়ে এর উল্টো কাজগুলিই করি। যেমন, কিছু ছুঁড়ে দেওয়া বা সরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। মস্তিষ্ক প্রেরিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া মাত্রই ফুলে ওঠা পেশীদের ধর্ম। অনৈচ্ছিক পেশীদের আমরা ঐচ্ছিক পেশীর মত নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। কিন্তু আমাদের মনের অবস্থার প্রভাব এই পেশীগুলির উপর খুব বেশী পড়ে। ক্ষীণ মানসিক স্বাস্থ্য এই পেশীগুলির কাজে বাধা দেয়। আর মানসিক স্বাস্থ্য যখন সজীব থাকে তখন এদের কাজ ভাল হয়। মানুষের সুখদুঃখের উপর সবরকমের পেশীরই শক্তি নির্ভর করে।

পেশীর আলোচনায় আমরা দেখেছি, কর্মশক্তির মূলে আছে পেশী। সুতরাং তার পরিপোষণ, বৃদ্ধি এবং কর্মশক্তি জাগরূক করবার দিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। পেশীর পুষ্টি খাদ্যগ্রহণে ও ব্যায়ামে। খাদ্য পরিপাকের কাজটা পেশীকেই করতে হয়। আর পরিপাকের মধ্য দিয়েই তার নিজেব পুষ্টিসাধন করতে হয়। কাজের ফলে দেহের যে ক্ষয় হয়, তার পূরণের প্রয়োজনীয়তা আছে। খাদ্য সেই ক্ষয় পূরণ করে। পেশীকে সক্রিয় ও তার কর্মশক্তি বাড়াবার জন্য ব্যায়ামের দরকার। ঐচ্ছিক পেশীগুলি এই ব্যায়ামে বিশেষ উপকৃত হয়। অনৈচ্ছিক পেশীগুলির উপর থাকে ঐচ্ছিক পেশীগুলি। তাই ব্যায়ামের ফলে ঐচ্ছিক পেশীগুলির পুষ্টি পরোক্ষভাবে অনৈচ্ছিক পেশীগুলির পুষ্টিতে সহায়তা করে। তবে অত্যাধিক ব্যায়ামের ফলে পেশীগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়ে ও তাদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ভাল হয় না। ফলে তারা নিজেদের নির্দিষ্ট কাজ ভালভাবে করতে পারে না। কোনো পেশীকেই একটানা একটা কাজে নিযুক্ত রাখলে সেই পেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বহুক্ষণ ধরে একটানা লিখে গেলে হাত টনটন করে। তখন ঐ পেশীর বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে যদি আবার লেখা যায় তবে সজীবতা ফিরে আসে। পেশী যদি সতে? থাকে তাহলে আমাদের দেহ অক্সিজেন বেশী করে নিতে পারে। অক্সিজেন আমাদের দেহের ভিতরের গ্লানি দূর করে, দেহে সজীবতা আনে। পেশীরা যাতে কাজ ভাল করে করতে পারে তার জন্য আধুনিক নার্সারী স্কুলগুলোয় পেশীর সুষ্ঠু সঞ্চালনের উপযোগী নানা কাজ দেওয়া হয়।

গ্রন্থি

আমাদের দেহের গ্রন্থিদের মোটামুটি ভাবে দুভাগে ভাগ করা যায়। একরকম **Duct Glands** এবং অপরটি **Ductless Glands.** এই দুই রকমের

গ্রন্থিই রস ক্ষরণ করে। Duct gland-গুলির ক্ষরণ বাহ্যিক। যেমন আমাদের নাক, চোখ, জিভ প্রভৃতি থেকে যে জল পড়ে তা এই গ্রন্থিরই কাজ। Ductless gland-গুলির ক্ষরণ আমরা চোখে দেখতে পাই না। তারা দেহের মধ্যে রস ক্ষরণ করে। সেই রস রক্তে সঞ্চারিত হয়ে আমাদের দেহের সর্বাঙ্গীন বিকাশের পথে বিশেষ সাহায্য করে। এদের হরমোনও বলা হয়। Ductless gland-গুলির মধ্যে থাইররেড, অ্যাড্রিনাল, পিটুইটারি প্রভৃতি নানা রকমের গ্রন্থি আছে। দেহের উপর এই গ্রন্থিগুলির প্রভাব লক্ষণীয়।

থাইরয়েড গ্রন্থি—এই গ্রন্থিটি আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থিটি যদি তার নির্দিষ্ট রস ক্ষরণ না করে তাহলে শরীরের চামড়া শুকিয়ে যায়, চর্বি যায় কমে, মাথার চুল উঠে যায়, শরীরে তাপ কমে যায়। শরীর আর বাড়ে না। এর অভাবে শরীরেরও যেমন ক্ষতি হয় মানসিক অবস্থারও তেমনি অধঃপতন হয়। কোনো কাজে উৎসাহ থাকে না, দিনরাত ঘুম আসে। বুদ্ধির ধার নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণত: Cretin নামে যে জড়বুদ্ধি লোকেদের দেখা যায় তাদের ঐ অবস্থার মূলে থাইরয়েডের ক্রিয়া। এই জাতীয় জীবদের দেহে থাইরয়েড-রস ক্ষরণ হয় না। থাইরয়েডের কাজ যে বয়সেই বন্ধ হোক না কেন সেই বয়সেই দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা ক্ষুণ্ণ হয়।

যদি থাইরয়েডের ক্ষরণ বেশী হয় তাহলে কম ক্ষরণের ঠিক উল্টো ফলই দেখা দেয়। দেহের অসম্ভব বৃদ্ধি হয়। শরীরে উত্তেজনা হয়। মানুষ চঞ্চল হয়ে পড়ে; হৃৎপিণ্ড তাড়াতাড়ি চলে। থাইরয়েড গ্রন্থির আমাদের দেহমন ও তাদের কার্যকলাপের উপর বিশেষ প্রভাব আছে। থাইরয়েডের চিকিৎসা করে রোগগ্রস্ত বহু লোককে সুস্থ করা হয়েছে।

অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি—এই গ্রন্থি যদি নিয়মিত রস ক্ষরণ না করে তাহলে শরীরের পেশীগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। দেহের রঙের পরিবর্তন হয়। দেহ ক্রমাগত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়। এই গ্রন্থি বেশী কাজ করলে পুরুষদেহের লোম বৃদ্ধি পায়, মানুষ আনন্দ বেদনায় সহজেই উত্তেজিত হয়। স্ত্রীদেহে এই গ্রন্থির বেশী কার্যকারিতায় পুরুষভাব প্রকাশ পায়।

এই গ্রন্থি যদি সুষ্ঠুভাবে কাজ করে তাহলে পেশীরা সতেজ হয় ও কর্মক্ষমতা যায় বেড়ে। পেশীরা যখন বেশী পরিশ্রম করে তখন তাদের উত্তাপ বেড়ে যায়। এই উত্তাপের সমতা আনবার জন্য ঘাম হয়। এই গ্রন্থি সেই কাজে সাহায্য করে। এই গ্রন্থি বীরকে বীরত্বে উদ্বুদ্ধ করে আবার কাপুরুষকে পলায়নে সাহায্য করে।

পিটুইটারি গ্রন্থি—এই গ্রন্থি ভালভাবে কাজ না করলে দেহের বৃদ্ধি হয় না। Midgets নামে জড়বুদ্ধিদের রোগের মূলে এই গ্রন্থি। এদের বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের মত হয় না। এর রসক্ষরণ বেশী হলে দেহের কোনো কোনো অংশের অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয়। স্নায়ুমণ্ডলীর সঙ্গে এর যোগ খুব বেশী।

এই গ্রন্থির অবস্থান মাথার পাশের দিকের খুলির অভ্যন্তরে মধ্যমস্তিষ্কের ওপরে। অনেক রকমের হরমোন এই গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় বলে এর গুরুত্ব এত বেশী। পিটুইটারি গ্রন্থির দুটি অংশ আছে। আর এই অংশ দুটির কাজও পৃথক। সম্মুখভাগের গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হরমোন দেহের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কিন্তু এর অত্যধিক ক্রিয়ার ফলে যৌন আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। মানসিক দিক থেকে পিটুইটারি গ্রন্থির সম্মুখভাগের হরমোন বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে। আবার এই গ্রন্থির পশ্চাদ্ অংশে যে হরমোন ক্ষরিত হয় তা পাকস্থলী ও জরায়ুর কাজকে প্রভাবিত করে। মোট কথা, পিটুইটারি গ্রন্থি মধ্যমস্তিষ্কে অবস্থিত থ্যালেমাসের (Thalamus) সংগে সংযোগ রক্ষা করে বলে মানুষের অনুভূতির ক্ষেত্রেও তার প্রভাব যথেষ্ট।

১০। শিক্ষা ও মন

শিক্ষার সঙ্গে মনের সম্পর্ক আছে। আর শিক্ষার মাধ্যমে মনের পরিবর্তন ঘটে। মন বলতে আমরা বুঝি মানবসত্তার এমন একটি বিশেষ অংশ যার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। মনের ভিন্ন ভিন্ন দিক আছে। যেমন —চিন্তনের দিক, অনুভূতির দিক ও আচরণের দিক। চিন্তনের ক্ষেত্রে দেখা যায় মানুষে মানুষে বা প্রাণীতে প্রাণীতে অনেক পার্থক্য আছে। এই চিন্তন-প্রক্রিয়া মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। চিন্তনের সাহায্যে মানুষ সৃষ্টিজগতে বিশেষ আসন করে নিয়েছে। যে কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের চিন্তাজগৎকে প্রভাবিত করে। আমরা যখন কোনো বিষয়কে জানি সেই জানার মাধ্যমে আমাদের চিন্তন সমৃদ্ধ হয়। চিন্তনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই সব জ্ঞানদায়ক অবগতিকে (cognition) কেন্দ্র করে। যে কোনো প্রকার জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়া তাই চিন্তনের পর্যায়ভুক্ত। তার মধ্যে আছে প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি, কল্পন ইত্যাদি। এই চিন্তনকে এক বিশেষ ধরনের প্রত্যক্ষণ বলে দার্শনিক লক্ (Locke) মনে করেছেন। তাঁর মতে বিভিন্ন ধারণার মধ্যে মিল

ও অমিল প্রত্যক্ষ করার প্রক্রিয়াই হল চিন্তন। চিন্তনের সাহায্যে মানুষ যুক্তির দ্বারা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসে, সমস্যার সমাধান খোঁজে, খণ্ড-ছিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্রতী হয়। তাই চিন্তন মানুষের একটি বিশেষ সম্পদ। একটি ভাবমূর্তি বা কল্প চিন্তনকে পুষ্ট করে। প্রত্যক্ষণের সঙ্গে চিন্তনের নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে। প্রত্যক্ষণ বস্তু-নির্ভর কিন্তু চিন্তন বিমূঢ় ধারণাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। যে কোনো বিষয়ে সামগ্রিক জ্ঞানলাভ করতে গেলে চিন্তনের বিশেষ প্রয়োজন। সাধারণতঃ চিন্তনের ক্ষেত্রে আমরা প্রতীক ব্যবহার করে থাকি। বিশ্লেষণ-ক্রিয়ার মাধ্যমে বিমূর্ত অবস্থায় চিন্তনের প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। সবসময় সে উদ্দেশ্যমুখী। একটি উদ্দেশ্যের অভিমুখে চিন্তনের ধারা প্রবাহিত হয়। সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞানীদের মতে চিন্তনের ধর্ম সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলা। অবশ্য চিন্তন যে উদ্দেশ্যের অভিমুখী হয় তা কখনও জ্ঞানলাভ, আবার কখনো ব্যবহারিক নৈপুণ্য হতে পারে।

চিন্তনের আর একটি বিশেষ ধর্ম হল সক্রিয়তা। যদিও প্রত্যক্ষণ, কল্পন ইত্যাদি প্রক্রিয়াতে মন সক্রিয় থাকে, চিন্তনের ক্ষেত্রে মনের সক্রিয়তা অধিক প্রবল হয়; কারণ সেখানে প্রেষণা ও মনঃসংযোগের বিশেষ প্রয়োজন। উদ্দেশ্যের পথে মন যখন সক্রিয়ভাবে এগিয়ে যায় তখনই চিন্তনের প্রয়োজনে হয়। দেখা যায় চিন্তন-প্রক্রিয়ার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উপ-প্রক্রিয়া আছে। যেমন (ক) বিশ্লেষণ, (খ) সংশ্লেষণ (Synthesis), (গ) উদ্দেশ্যের অনুধাবন বা উদ্দেশ্যাভিমুখিতা, (ঘ) জ্ঞানের সামান্যীকরণ (Generalization) (ঙ) বিমূর্ত ভাবগ্রহণ (Abstraction).

চিন্তনের বাহন কি? এই প্রশ্ন নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। মনোবিদ্‌গণ চিন্তনকে জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়া ব'লে মনে করেন। তাঁদের মতে এই বাহন প্রধানতঃ চারপ্রকার—(১) ভাবমূর্তি বা কল্প (Image), (২) ধারণা বা প্রত্যয় (Concept), (৩) সংকেত বা চিহ্ন (Symbol or Sign) ও (৪) অবধারণ বা বিচারকরণ (Judgement or Reasoning)। প্রাথমিক বাহন হিসাবে ভাবমূর্তি বা কল্পকে স্থান দেওয়া হয়েছে। অনেক মনোবিদ্ মনে করেন যে ভাবমূর্তিকে বাদ দিয়েই চিন্তন সম্ভব। কিন্তু টিচেনার (Titchnor)-এর মতে ভাবমূর্তি ছাড়া চিন্তন সম্ভবপর নয়। তাই এ-বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। স্টাউট (Stout) অবশ্য জেমস্ (James)-এর মতবাদকে সমর্থন

করে বলেছেন যে, চিন্তন-প্রক্রিয়ায় ভাবমূর্তিহীন পরিবর্তন অস্পষ্ট হলেও তাদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ চেতনা অবিচ্ছিন্ন হলেও সেখানে যে ভাবমূর্তির সৃষ্টি হয় তা অবিচ্ছিন্ন নয়, তাদের মাঝে মাঝে ফাঁক আছে।

ভাবমূর্তি যেমন চিন্তনের একটি বাহন তেমনি এর অপর একটি বাহন হল ধারণা। যেমন ভাবমূর্তির সাহায্যে আমরা বিশেষ বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করতে পারি তেমনি ধারণার সাহায্যেও আমরা বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করতে পারি। একই শ্রেণীর বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে সাধারণ গুণ বর্তমান আছে তার অভিজ্ঞতাই হল ধারণা। এই ধারণা ব্যক্তিমনের সক্রিয়তার ফলশ্রুতি। কারণ ব্যক্তিমানস যত ক্রমপরিণতি লাভ করে ততই ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধারণা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন—ব্যক্তিবিশেষের ধারণা, জাতিগত ধারণা ও বিমূর্ত ধারণা। প্রত্যেক শ্রেণীর ধারণার মূলে কতকগুলি মানসিক ক্রিয়া কাজ করে। আমাদের বস্তু সম্পর্কে সাধারণ বিশেষ কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই পর্যায়গুলি হ'ল তুলনা, বিমূর্তীকরণ, সামান্যীকরণ এবং নামকরণ। এই সব প্রক্রিয়ার দ্বারা যে সাধারণ ধারণা জন্মায় তার পেছনে থাকে সক্রিয় মানসিক ইচ্ছা। দেখা যায় শিক্ষাক্ষেত্রে ধারণার অভাবে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের বিকাশ হয় না। তাই কিভাবে এই ধারণাকে স্পষ্টভাবে জাগিয়ে দেওয়া যায় সে বিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার অবকাশ আছে।

সংকেতকে আশ্রয় করে চিন্তন বিকাশ লাভ করে। চিন্তনের দু'রকমের সংকেতের ব্যবহার দেখা যায়—প্রতীক (Symbol) ও চিহ্ন (Sign) প্রতীক এবং চিহ্ন অপ্রত্যক্ষ বস্তুকে অন্য কোনো প্রত্যক্ষ বস্তুর সাহায্যে চিন্তনের বিষয়বস্তু হিসাবে উপস্থাপনে সহায়তা করে। চিন্তন বস্তুর অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা জন্মিয়ে দেয়, আর প্রতীক বস্তুর অনুধাবনে সহায়তা করে।

ভাষার সঙ্গে চিন্তার ও চিন্তনের বিশেষ সম্পর্ক আছে। চিন্তন প্রক্রিয়ার অভিব্যক্তি হয় ভাষার মাধ্যমে। চিন্তার বিবর্তনে ভাষার আবির্ভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভাষার মাধ্যমে চিন্তন বিকাশ লাভ করে। ভাষার বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে চিন্তনের বিশেষ ভূমিকা আছে। ধ্বনি উচ্চারণ থেকে শুরু করে অর্থবোধ, ব্যাক্যের ব্যবহার ও বিমূর্ত শব্দের প্রয়োগ পর্যন্ত সর্বত্র চিন্তন নানাভাবে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে।

চিন্তনের আর একটি স্তর হ'ল বিচারকরণ। উন্নতধরনের চিন্তনে বিচার-

করণের বিশেষ সার্থকতা আছে। বিচারকরণের সাহায্যে নতুন পরিস্থিতিতে অভিযোজন সম্ভবপর হয়। যে কোনো সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে অংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন যে অন্তর্দৃষ্টির (Insight) মাধ্যমে সম্ভব হয় তা বিচারকরণেরই ফলশ্রুতি। এরই মাধ্যমে আমরা একটি ধারণার সঙ্গে আর একটি ধারণার স্থাপন করি। এই ধারণাই হল অতীত অভিজ্ঞতার উপাদান। কেবল অভিজ্ঞতাই নয়, তার সার্থক প্রয়োগ না হলে সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হয় না। যে কোনো সমস্যাকে কেন্দ্র করে এই বিচারকরণ প্রক্রিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে। ডিউই বিচারকরণের পাঁচটি সোপানের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল (ক) সমস্যার উদ্ভব, (খ) সমস্যার পর্যবেক্ষণ, (গ) তথ্যানুসন্ধান, (ঘ) প্রকল্প-গঠন এবং (ঙ) প্রয়োগ ও পরীক্ষণ। প্রতিটি পর্যায়ের বা সোপানের মাধ্যমে বিচারকরণ পরিণতি লাভ করে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে চিন্তনের গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিন্তনের বিকাশ সাধন করাই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। আবার শিক্ষার জন্যও চিন্তনের প্রয়োজন। কারণ চিন্তন-প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে শিখনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা যায়, আর বিমূর্ত বিষয় সম্পর্কেও জ্ঞান আহরণ করা সম্ভবপর হয়।

ভাবমূর্তি বা কল্পের মাধ্যমে চিন্তন সম্ভবপর হয়। তাই শিক্ষার্থীরা যাতে এই ভাবমূর্তিগঠনে উৎসাহিত হয় সেদিকে শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে। মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে বিমূর্ত জ্ঞানের সঞ্চার, প্রত্যক্ষ বস্তু থেকে ভাবমূর্তির দিকে এগিয়ে যাওয়া বোধ হয় মনোবিজ্ঞান-সম্মত। এই ভাবমূর্তি গঠনের ব্যাপারে শিক্ষকের যথেষ্ট ভূমিকা আছে। দেখা যায় যে, এক এক জন শিক্ষার্থী এক একটি ইন্দ্রিয়কে কেন্দ্র করে এক এক প্রকার ভাবমূর্তির গঠনে প্রণোদিত হয়। তাই শিক্ষকের কাজ হ'ল শিক্ষার্থীদের এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বস্তু সম্পর্কে ধারণা অস্পষ্ট থাকে। তার ফলে তাদের বিষয়জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। এই ধারণার সুষ্ঠু গঠনের জন্য বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যগুলিতে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের সামনে তুলে ধরলে বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে তাদের ধারণা জন্মায়। ধারণা-গঠনের ক্ষমতা ব্যক্তির সাধারণ মানসিক ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। তবে তা

অনুশীলনের দ্বারা বাড়ানো যায়। ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করলে এই ধারণা গঠনের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

ভাষার বিকাশ না হলে শিক্ষার কাজ সম্পূর্ণ হয় না, কারণ শিক্ষার মাধ্যম হল প্রতীক বা ভাষা। চিন্তনের প্রধান উপাদান প্রতীক। এই দিক থেকে চিন্তন ও শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বার করা কঠিন নয়। তাই শিক্ষার্থীদের ভাষার বিকাশ করতে হলে চিন্তনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্রমানুসারে অগ্রসর হতে হবে।

পরিশেষে এই কথা বলা যায় যে, শিক্ষার্থীর বিচারকরণের বিকাশ না ঘটলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। বিচারকরণের দ্বারাই জীবনের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়। কোন পরিস্থিতিতে কিভাবে সমাধানে পৌছানো যায় তার প্রশিক্ষণ বাঞ্ছনীয়। বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করে শিক্ষক যদি তাদের সহায়তায় ভিন্ন ভিন্ন সমাধান খোঁজেন তাহলে ক্রমশঃ শিক্ষার্থী আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এই আত্মনির্ভরশীলতাই নিরপেক্ষ চিন্তনের সহায়ক। সংক্ষেপে বলা যায় যে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিন্তনকে যত জাগ্রত করা যায় ততই শিখন ও শিক্ষা ফলপ্রসূ হয়। শিক্ষার্থীদের অলস মনকে তথ্য ভারাক্রান্ত করে লাভ নেই, তাদের মধ্যে চিন্তাশক্তি, স্মৃতি ও কল্পনা, বিচার-বুদ্ধি ও বিশ্লেষণক্ষমতা জাগিয়ে তুলতে পারলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

১১। সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ

প্রত্যেক জীব তার জন্মক্ষণে কতকগুলো বিশেষ প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়। যেমন জীবের ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তির প্রকাশ জীবের জন্মের অব্যবহিত পরেই দেখা যায়। আমরা আমাদের পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকেই কাজ করি। কিন্তু নবজাতকের অভিজ্ঞতার অবকাশ কোথায়? সেইজন্য তার সেই কাজের ব্যাখ্যা হয় মূলগত সংস্কার দিয়ে। মূলগত সংস্কারের পিছনে কোনোরকম অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা নেই। আপনা-আপনিই তা ঘটে। জীব-জগতের এক এক শ্রেণী এক একভাবে আপন-সংস্কারের প্রকাশ করে যায়। প্রত্যেক শ্রেণীরই সংস্কারের প্রকাশ একই ধরনের। তার মধ্যে কোনো হেরফের নেই। তাই সংস্কারকে বদলানো বিশেষ সম্ভবপর হয় না। সংস্কারের

প্রকাশে প্রাণীরা যন্ত্রচালিতের মত কাজ করে তাতে কোনো বুদ্ধিবিবেচনা থাকে না বললেই চলে। কারণ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে পরিবেশকে একটু ওলট-পালট করে দিলেই তারা কিছুই করতে পারে না। কিন্তু সংস্কার দিয়ে যে সব কাজ হয়ে থাকে সেগুলো সুন্দর আর পরিপাটি হয়। তার পেছনে যে শিক্ষা নেই বা বুদ্ধি নেই তা বোঝানো ভার। বাবুই পাখির বাসা দেখলে মনে হয় যেন কত পটু হাতের কাজ। সহজাত সংস্কারগুলো সুপ্ত অবস্থায় সব সময় জীবের অন্তরে থাকে। উপযুক্ত পরিবেশে তার স্ফুরণ হয়। কোনো পাখিকে জন্মের পর থেকেই খাঁচায় পুরে রেখে বেশ কিছুদিন পরে তাকে ছেড়ে দিলে সে একেবারেই উড়তে পারবে না—এমন নয়। একটু উড়তে সে পারবে। কেননা ওড়বার কায়দা সে ভুলে যায়নি। শুধু অনভ্যাস তার ওড়ার পথে বাধা হয়।

নিম্নস্তরের জীবদের মধ্যে উচ্চস্তরের জীবের শৈশবে বুদ্ধিবিবেচনার স্থান নেই। তাই প্রকৃতি সেখানে তাদের বাঁচবার অবলম্বন হিসেবে দিয়েছে তাদের মধ্যে সংস্কারের বীজ। তাই নিম্নস্তরের জীবেরা আহার অন্বেষণ, আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি করে মূলগত সংস্কারের বশে। কতকগুলো সংস্কার মানুষের মধ্যে প্রায় সমস্ত জীবন ধরে থাকে, আবার কতকগুলি সংস্কার শিক্ষার সঙ্গে পরিমার্জিত হয়।

মূলগত সংস্কার সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের বাক্‌বিতণ্ডার শেষ নেই। আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানী সংস্কারকে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রাণীদের সংস্কারের মধ্যে যে জন্মজন্মান্তর ছাপ আছে সেটা তাঁরা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে ক্রমবিবর্তনের পথে এককোষী জীব আজ মানুষে পরিণত হয়েছে। পরিণতির পথে জীবদেহে নানা পরিবর্তন হয়, যেমন, কোষবৃদ্ধি নানারকম অস্থিগ্রন্থির সমাবেশ ইত্যাদি। দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা ও ব্যবহারের জগতেও পরিবর্তন এসেছে। আচরণবাদীরা প্রাণিজগতের reflex জাতীয় ব্যবহারকে সংস্কার বলেছেন। তাঁদের মতে সংস্কার কতকগুলো reflex-এর সমষ্টি। Reflex হচ্ছে সেই ধরনের ব্যবহার যার মূলে বুদ্ধিবিবেচনার অবকাশ নেই। সেগুলো খুবই তাড়াতাড়ি হয়। যেমন হঠাৎ আলোর ঝলকে চোখ বন্ধ করা।

সহজাত প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ

সাধারণতঃ সংস্কারের পরিবর্তন বিশেষ হয় না। কারণ সংস্কার জন্মগত,

তবে আমাদের প্রায় সব কাজের ওপরই বুদ্ধি-বিবেচনার বেশ কিছু আধিপত্য আছে। প্রয়োজনবিশেষে আমাদের মন সংস্কারের প্রকাশে বাধা ও উৎসাহ দেয়। আমরা যতই উন্নত হচ্ছি ততই আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করছি। হাসিটা আমাদের অন্যতম প্রবৃত্তি। কিন্তু এমন বহু জায়গা আছে যেখানে আমরা প্রাণ খুলে হাসতে পারি না। সেখানে আমাদের হাসির প্রবৃত্তিকে আমরা দমন করি। আদিমযুগের মানুষের কথা শুনলে আমরা শিউরে উঠি। তারা বন্য পশু হত্যা করে পুড়িয়ে আধকাঁচা অবস্থাতেই রাক্ষসের মত খেত। তাদের কাছে তখন মা, বাবা, ভাই, বোন কেউ আপন হত না। আহার্যের অংশীদার তারা সহজে কাউকে করতে চাইত না। ক্ষুন্নিবৃত্তির সেই আদিম প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যেও আছে কিন্তু ঐ রকম করে তার প্রকাশ করতে আমরা লজ্জা পাই।

আদিম মানুষ ক্রোধের প্রকাশ করত ভীষণভাবে। কিন্তু বর্তমানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ক্রোধের প্রকাশকে মার্জিত করার একটা সযত্ন প্রচেষ্টা রয়েছে। ইতর প্রাণীদেরও সংস্কারের পরিবর্তন শিক্ষা দিয়ে করানো যায়। সাধারণতঃ বিড়াল মাছ-ই ভালোবাসে। তাকে আমরা নিরামিষের পরিবেশে রেখে নিরামিষাশী করতে পারি। বাঘের ধর্ম প্রাণী হত্যা করা ও তার মাংস খাওয়া। এইজন্য শিকারীরা বনের মধ্যে ছাগল বা তার পূর্ব-রজনীর অধভুক্ত প্রাণীটিকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে আড়ালে গা ঢেকে থাকে। কিন্তু চতুর নরখাদক বাঘের কাছে এ চালাকি অনেক সময়েই ধরা পড়ে যায়।

বুদ্ধির আলোকে আমাদের সংস্কারকে বহুরূপে মার্জিত করা যায়। খাঁচায় বন্ধ পাখি ভাল উড়তে পারল না কারণ তার অভ্যাস নেই। অভ্যাস যেমন আমাদের নতুন জিনিস দেখায় তেমনি পুরনো জিনিসের ভিত্তিকেও দৃঢ় করে।

প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ

ম্যাগডুগালের মতে, প্রক্ষোভের ব্যাখ্যা ছাড়া সংস্কারের সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় না। সংস্কার ও প্রক্ষোভ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সংস্কারের প্রকাশের ইন্ধন যোগায় আমাদের মনের অনুভূতি বা প্রক্ষোভ। এটা ম্যাগডুগালের মতে। তিনি ১৪টি মূল প্রবৃত্তির কথা বলেছেন। এই প্রবৃত্তিগুলির সঙ্গে জড়িত (প্রক্ষোভ) অনুভূতিগুলিকেও তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন।

(1) Escape—পালান	(1) Fear—ভয়
(2) Combat—যুদ্ধের ইচ্ছা	(2) Anger—ক্রোধ
(3) Repulsion—ঘৃণা	(3) Disgust—বিরক্তি
(4) Parental—বাৎসল্য	(4) Tender Emotion—স্নেহপ্রীতি
(5) Appeal—অনুনয়	(5) Distress—দুঃখ
(6) Mating—যৌনতা	(6) Lust—কাম
(7) Curiosity—কৌতূহল	(7) Wonder—বিস্ময়
(8) Submisson—আত্মসমর্পণ	(8) Negativeself-feeling—হীনমন্যতা
(9) Self-assertion—আত্মপ্রতিষ্ঠা	(9) Positiveself-feeling—আত্মগৌরব
(10) Gugarions—দল বাঁধার ইচ্ছা	(10) Feeling of loneliness—একলা বোধ করা
(11) Food-seeking—খাদ্যান্বেষণ	(11) Gusto—ক্ষুধা
(12) Acquisition—জমানো	(12) Feeling of ownership—নিজস্ব বোধ
(13) Construction—গড়া	(13) Feeling of creativeness—সৃজন স্পৃহা
(14) Laughter—হাসি	(14) Amusement—আনন্দ।

মনোবিজ্ঞানীরা সকলে ম্যাকড্যুগালের সঙ্গে একমত নন। তাঁরা সংস্কার ও প্রক্ষোভের মধ্যে এই অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক স্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে সহজাত সংস্কার যখন আপন প্রকাশের পথ রুদ্ধ দেখে তখনই মনের মধ্যে প্রক্ষোভ জাগে। তাই সংস্কার ও প্রক্ষোভ একসঙ্গে আসে না, পর পর আসে। তাঁরা আরও বলেন যে এই ধরনের ধরাবাঁধা ছকে মানুষের সংস্কার বা অনুভূতি চলে না। কারণ বুদ্ধির প্রভাব মানুষের উপর প্রচুর। ইতর প্রাণীদের মধ্যে এ ধরনের শ্রেণীবিভাগ করলেও করা যেতে পারে। কারণ মানুষের মস্তিষ্কের মত তাদের মস্তিষ্কের গঠন এত জটিল ও উন্নত নয়। জীবদেহের ক্রম-বিবর্তনের ধারাগুলো অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যজগতের যেমন জটিলতা বাড়ছে মনোজগতেরও জটিলতা সেই পরিমাণেই

বাড়ছে। নীচুস্তরের প্রাণীদের মধ্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি ও বংশবৃদ্ধি এই দুটি সংস্কারই প্রবল। প্রত্যেক আবেগের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক পরিবর্তন হয়। যেমন ভয় পেলে মুখ চোখ বসে যায়, হাত পা কাঁপতে থাকে, তেমনি রোগা হলে চোখ ঠিকরে বেরোতে চায়, হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়, রক্তের চাপ বাড়ে।

শিক্ষকের কাজ

সবরকম সুশিক্ষা দান ও সু-অভ্যাস গঠনের প্রকৃষ্ট সময় শৈশব। বর্তমানে শৈশবের শিক্ষার ভার বহুলাংশে এসে পড়েছে শিক্ষকদের উপর। এখন আর শিশুদের বেশীদিন মার আঁচলে বাঁধা থাকতে হয় না। তিন বছর পড়তে না পড়তেই তারা preparatory school-এ যেতে পারে। কারণ যদিও শিশুর স্থান মায়ের কোলে, তবুও সেখানে যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষাদান করা হয় সেটা অধিকাংশ বাড়ীতেই অসম্ভব। তাই শিক্ষককে প্রতিনিয়ত সতর্ক থাকতে হবে। সহজাত প্রবৃত্তিকে আমরা বর্জন করতে পারি না। ছোট শিশু যখন নতুন স্কুলে আসে তখন নতুন নতুন পরিবেশে সে বিহ্বল হয়ে পড়ে। প্রথম প্রথম তার মনে হয় যেন তার চিরপরিচিত পরিবেশ থেকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। শিক্ষকদের দেখে সে ভয় পায়, অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিশতে পারে না। সব সময় একটা আড়ষ্টতা তাকে ঘিরে থাকে। এর ফলে তার মনোজগতে একটা আলোড়ন হয়। তার বাড়ীর ছোট ভাইবোনদের ওপর তার হিংসা হয়। কেননা সে স্কুলে যাচ্ছে আর তারা বাড়ীতে আনন্দে বসে আছে। প্রত্যেকের এই মনোভাবের প্রকাশ সমান হয় না। কোনো কোনো শিশু তাই স্কুলে যেতে কেঁদেকেটে অস্থির হয় কেউ বা অনিচ্ছায় অপরিতৃপ্ত মন নিয়ে স্কুলে যায়। শিক্ষকের এই বিভিন্ন ধরনের শিশুদের নিয়ে কাজ করতে হয়। তাই তিনি প্রতিটি শিশুর সঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করে তাদের স্কুলজীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। বিদ্যালয়কে যেন তারা ভয় করার বদলে ভালবাসতে পারে সেটাই বড় কথা।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বেশী করে দেখা দেয় বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যাগুলো। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা নানা কারণে তাদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। শিক্ষককে নিপুণতার সঙ্গে এই কৈশোরের সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। উত্তেজনা বা উদাসীনতা কোনোটাই তাঁর থাকা উচিত নয়। অনেক সময় দেখা যায় যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ

শেষ করে নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তারা পুরানো পরিবেশ ছেড়ে এসে মনোকষ্টে থাকে। এ সময় তাদের সঙ্গে যদি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার না করা হয় তাহলে প্রভূত মানসিক ক্ষতি হয়। বাড়ীর সংস্কারপূর্ণ জীবনের সঙ্গে স্কুলের জীবনের একটা দ্বন্দ্ব তাদের মনকে নিরন্তর ক্ষুব্ধ করে। শিক্ষক যিনি হবেন এদিকে তাঁর দৃষ্টি রাখতে হবে।

আবার অনেক সময় আমরা দেখি যে শিক্ষার্থীর বিষয় নির্বাচনে স্বাধীনতা থাকে না। তার অভিভাবকরাই সে ভারটা নিজেরা তুলে নেন। এর ফলে শিক্ষার্থী নিজের পছন্দমত বিষয় নিতে পারে না, আর সে দুঃখ তার মন থেকে কোনোদিন যায় না। অপছন্দের বিষয়ে সে মন দিতে পারে না, তাই তাতে সে ভাল করতে পারে না, আবার পরবর্তী জীবনে তাই সে ব্যর্থ হয়। বাড়ীর সবাই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হবে বলে বাবা জোর করে I. Sc.-তে ভাল-করা ছেলেকে পাঠালেন B. Com-এর দরজায়। ছেলের ইঞ্জিনিয়ার হবার ইচ্ছে, তাই শত মুখস্থ করেও হয়ত B. Com তার পাশ করা হল না। তাই বিষয় নির্বাচনের ভার মূলতঃ শিক্ষার্থীর হাতে থাকবে। তবে শিক্ষকের কাজ তাকে প্রবণতা অনুযায়ী চালনা করা। তাই শিক্ষক আজ আধুনিক কালের নানারকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে তার প্রবণতার খোঁজ করে যদি তাকে সেই দিকে এগিয়ে নেন তবে বিষয় নির্বাচন তার তার কাছে কঠিন হয় না। স্কুলে যেসব শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়ে বা অকৃতকার্য হয় তারা মনে দমে থাকে। তাই শিক্ষকের কাজ হবে তাদের দমা ভাবটা কমানোর জন্য উৎসাহ দেওয়া।

বেশীর ভাগ সময় দেখা যায় যে, চটপটে প্রিয়দর্শন শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের একটা দুর্বলতা থাকে। এর ফলে তাদের সামান্য সামান্য দোষত্রুটি তাঁদের চোখে পড়ে না। বাকী যারা থাকে তারা সেই রকম বিশেষ সুবিধার অধিকারী না হওয়ায় মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয় ও অন্যদের ঈর্ষা করে। অনেক সময় তারা লঘু অপরাধে গুরু শাস্তি পায়। তখন তাদের মনের ক্ষোভ তারা নানা ভাবে প্রকাশ করে। শিক্ষককে তাই সব সময় নিঃস্বার্থ হতে হবে। ভালদের তিনি ভালবাসবেন সেই সঙ্গে খারাপদের তিনি অবহেলা করবেন না। শিক্ষকরা সবসময় চিন্তা করে শাস্তি দেবেন। কারণ শাস্তির মূল্য যেন তারা বুঝতে পারে। শিক্ষকরা অত্যাধিক শাস্তি কখনই দেবেন না। কিশোর ছাত্রদের মধ্যে অনেকে ভীতু প্রকৃতির থাকে। তারা একটু বকুনি খেলেই ভয়ে কাঠ হয়ে যায় ও তাদের মনোজগতে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ছোটবেলায় ইঁদুর ও আরশোলার

ভয় অনেক কিশোরের মনে এমন বাসা বেঁধে থাকে যে বড় হয়েও তারা তা ভুলতে পারে না। তাদের সেই ভয় বকে বা ঠাট্টাবিদ্রূপ করে ছাড়াতে গেলে ভাল হয় না।

আনন্দের মধ্য দিয়ে কাজ করতে সকলেই ভালবাসে। শিক্ষক তাই পড়াকে শিক্ষার্থীদের কাছে নীরস আনন্দহীন না করে বিষয়ের বৈচিত্র্য আনতে পারেন। নানারকম উপকরণের সাহায্যে শিক্ষামূলক ভ্রমণের মধ্য দিয়েও বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়। আর তাদের কাজকে পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করে তাদের আনন্দ দিতে পারেন। কারণ ছোটদের কাছে পুরস্কারের লোভ কম নয়। ছোট শিশুরা ভাঙা-গড়ার কাজ বেশী ভালবাসে। শিক্ষক তাদের সেই কাজে যথেষ্ট উৎসাহ দেবেন। তাদের সেই খেলাকে ছেলেমানুষির চোখে দেখে তাদের অবজ্ঞা করবেন না বা নিবৃত্ত করবেন না। কারণ তাদের মনের কল্পনা এদের মধ্যে দিয়েই রূপ পাবে।

খেলাটা সব ছেলেমেয়েই অল্প বিস্তর ভালবাসে। খেলার মধ্য দিয়ে শিক্ষক যেমন পড়াশুনা বিষয়ক বহু জিনিস শেখাতে পারেন তেমনি পারেন নিয়মানুবর্তিতা, দলের প্রতি আনুগত্য প্রভৃতি শেখাতে। খেলার মধ্য দিয়েই ছেলেরা পরস্পরকে সাহায্য করে।

১২। প্রবৃত্তি ও শিক্ষকের দায়িত্ব

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবৃত্তির গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। একথাও মনে করা ভুল যে, প্রবৃত্তির ওপর শিক্ষকের কোনো নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নেই। সহজাত প্রবণতা হিসেবে প্রবৃত্তিকে কাজে লাগানো যায়। তাই তাকে অস্বীকার না করে কিভাবে এই সহজাত বৃত্তি জীবন ও শিক্ষার কাজে নিয়োজিত করা যায় এ বিষয়ে চিন্তার অবকাশ আছে। যে কোনো শিক্ষার পরিকল্পনা রচনার আগে শিশু ও শিক্ষার্থীর প্রবৃত্তির প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে শিক্ষার কার্যক্রম রচনা করা বাঞ্ছনীয়। এমন অনেক প্রবৃত্তি আছে যা জীবনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, যার অবদমন না করে তার সুসংহত প্রকাশের পথ উন্মোচিত করলে সুফল পাওয়া যায়। কারণ এই সহজাত বৃত্তিগুলিকে নির্বাসিত করা সহজ নয়। এদের অবদমনও বাঞ্ছনীয় নয়। মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে সার্থক প্রকাশের পথে মুক্তি দিতে হবে। আর সেখানেই শিক্ষকের কৃতিত্ব।

সম্প্রতি ম্যাক্‌ডুগালের প্রবৃত্তিবাদ সম্পর্কে কিছুটা সংশয় জেগেছে। কিন্তু তাকে অস্বীকার করার মতো স্পর্ধা নিয়ে কোনো গবেষণা অন্য কোনো বিশিষ্ট মতবাদ সুস্পষ্ট করে তোলে নি। কেবল তার নামান্তর ঘটেছে মাত্র। বর্তমানে প্রবৃত্তিকে সমাজের অনুমোদিত ধারায় বইয়ে দেবার প্রচেষ্টা চলেছে। ইংরাজীতে একে বলা হয় sublimation. মনোবিজ্ঞানীরা একেই মধ্যপন্থা হিসেবে মেনে নিয়েছেন। একে বলা যায় উদ্গমন। যে কোনো সহজাত প্রবৃত্তিকে তার স্বাভাবিক প্রবাহ থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য কোনো বাঞ্ছনীয় ধারায় প্রবাহিত করার নামই উদ্গমন। এই উদ্গমনের প্রক্রিয়াকে যতভাবে কাজে লাগানো যাবে ততই শিক্ষার সুফল ঘটবে।

এখন দেখা যাক কোন্ প্রবৃত্তির কিভাবে উদ্গমন সম্ভবপর করা যায়।

প্রথমেই আসে কৌতূহল প্রবৃত্তির কথা। কারণ এই প্রবৃত্তিটি খুব প্রবল। নানাভাবে এই প্রবৃত্তি শিশুদের জীবনে উঁকি দেয়। সেই কৌতূহলকে নিবৃত্ত না করে কিভাবে তাকে জাগিয়ে দেওয়া যায় তা চিন্তনীয়। যতই এই কৌতূহল প্রবৃত্তি সজাগ হবে ততই শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চারিত হবে, ততই শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে নানা প্রশ্ন করবে। এই জিজ্ঞাসু মনকে শ্রদ্ধা করতে হবে। প্রতিটি মনের কোণে যে প্রশ্ন ভীড় করে আ বুঝে সেই কৌতূহল মেটাবার পথকে দেখিয়ে দেওয়া শিক্ষকের কাজ। একই বিষয়কে যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় সে সম্পর্কেও তাদের সচেতন করে তুলতে হবে। মোট কথা, শিক্ষার্থীর মনকে নাড়া দিতে হলে চাই কৌতূহল প্রবৃত্তির উদ্রেক। তবেই শিক্ষায় সন্দীপন সার্থক হয়।

একইভাবে যৌন প্রবৃত্তিরও উদ্গমন সম্ভব। এই যৌন প্রবৃত্তিকে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় পরিচালিত করতে পারলে শিক্ষার্থীর পক্ষে তা কল্যাণকর হয়। যে সৃষ্টির স্পৃহা যৌন প্রবৃত্তির মূলে আছে তা নানা সৃজনাত্মক কাজের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। তাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ, রসানুভূতি যা সুপ্ত আছে তাকে চারুশিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করতে উৎসাহিত করা উচিত। যেমন, ছবি আঁকা, কবিতা লেখা ও অনুরূপ সৃজনাত্মক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর এই যৌন প্রবৃত্তির উদ্গমন ঘটে। এই উদ্গমনের ফলে আত্মপ্রকাশের বাঞ্ছনীয় পথগুলি প্রশস্ত হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের সৃজনশীলতার উন্মোচন। সৃষ্টিধর্মী মন উজ্জীবিত হয়ে ওঠে মৌল প্রবৃত্তির উদ্গমনের ফলে। তাই ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তির উদ্গমনে সহায়তা করা শিক্ষকের একান্ত কর্তব্য।

যুদ্ধ-প্রবৃত্তির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ না করে যদি এই সংগ্রামের প্রবৃত্তিকে ব্যাধি, অন্যায় ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পরিচালিত করা হয় তাহলে তা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর হয়।

১২। বুদ্ধি ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাৎপর্য

দেখা যায় বুদ্ধির সংজ্ঞা নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে। আজও তার অবসান হয় নি। তবে এই সংজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে চারটি শ্রেণীতে তাদের ভাগ করা যায়। (১) জৈবিক সংজ্ঞা, (২) শিক্ষামূলক সংজ্ঞা, (৩) মানসিক শক্তি-সংক্রান্ত সংজ্ঞা ও (৪) পরীক্ষা-নির্ভর সংজ্ঞা। জীবনের সঙ্গে সংগতি রেখে চলবার যে শক্তি তাকে জৈবিক অর্থে বুদ্ধি বলা হয়। এই বুদ্ধি পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনে সহায়তা করে। অভিনব পরিস্থিতিতে আমাদের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সংগঠনের যে মানসিক ক্ষমতা তাকে বলা হয় বুদ্ধি। তাই দেখা যায় যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা জীবনের জটিল পরিস্থিতির মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন সমাধানের পথ খুঁজে বার করেন।

ব্যক্তির বুদ্ধি তার অভিযোজন শক্তির ওপর নির্ভরশীল। এই অভিযোজন শক্তি অবশ্য তার অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে। যে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনে নৈপুণ্য অর্জন করেছে তার বুদ্ধি আছে সন্দেহ নেই। এই অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শেখার ক্ষমতাকে বুদ্ধি বলা যায়।

এবার প্রশ্ন আসে যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বুদ্ধির তারতম্য কি করে বোঝা যাবে। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে বুদ্ধি কি ? তা জানতে হবে, বুদ্ধির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে। এই নিয়ে অনেক গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সমীক্ষা চলেছে। কিন্তু তবুও মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতানৈক্য থেকে গেছে।

কথায়, কাজে, ব্যবহারে, আচরণে, পারিপার্শ্বিক ও পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় নিপুণতা বা ক্ষিপ্রতায় বুদ্ধির প্রকাশ ঘটে থাকে। এই বিভিন্ন প্রকাশ বা অভিব্যক্তিই বুদ্ধির বিচার বা পরিমাপের একমাত্র সহায়ক কিন্তু, মৌলিক বুদ্ধি কি—এটাই হল প্রশ্ন।

বুদ্ধির প্রকৃত অবস্থা নিয়ে মনোবিজ্ঞানবিদদের মধ্যে অনেক মতভেদ চলে আসছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে বুদ্ধির সম্পর্কে কেউ কেউ বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে বুদ্ধি মানুষের একটি সাধারণ কর্মক্ষমতা, যা নিয়ে মানুষ তার

চিন্তাধারাকে নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তিনি আরও বলেছেন যে বুদ্ধি দিয়েই সকল রকমের জটিল সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। মানুষের ধীশক্তি বা বুদ্ধি তাকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিপুণভাবে কাজ করতে সহায়তা করে। বুদ্ধির আরও কয়েকটি ভাগ আছে--

(১) কথোপকথন।

(২) অঙ্ক গণনা।

(৩) কর্মক্ষমতা।

যদি আমরা বুদ্ধিকে এই দিক থেকে বিচার করি, তবে আমাদের এর ক্রিয়াগুলি নিয়ে আলোচনা করা দরকার—থর্নডাইক (Thorndike) বুদ্ধিকে কয়েকটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যেমন,

(১ লঘু কর্মক্ষম শক্তি।

(২) সামাজিক কর্মক্ষমতা।

বুদ্ধি জটিল কিন্তু এর একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। Thorndike সাধারণ ক্ষেত্রে ধীশক্তির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে বুদ্ধি একটি নির্দিষ্ট শক্তি এবং এর একটা নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। তাঁর মত অনুসারে একজন নিপুণ ব্যক্তির, একজন সুদক্ষ যন্ত্রীর এবং একজন শিল্পীর ধীশক্তি বা বুদ্ধির তুলনা করা সম্ভব নয়। তাঁদের ক্ষমতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজের মধ্যে প্রকাশ পায়, Spearman বলেছেন যে বুদ্ধি মানুষকে সমস্ত রকমের জটিলতার সম্মুখীন হতে সহায়তা করে। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ নৈপুণ্যকে দুই বা ততোধিক ভাগে ভাগ করে তাঁদের এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁরা বুদ্ধির উপাদানগুলি কয়েকটি পর্যায়ে বিশ্লেষণ করেছেন। একে Perry, Vernon এবং Burt এর Hierarchical Theory বলা হয়।

প্রথমটি গতিময় গুণ। বুদ্ধি চিন্তাধারা বা মানুষের বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। এটি হল জন্মগত গুণ বা ক্ষমতা। অবশ্য পরিবেশ এর বিকাশের পথে সহায়তা করে।

যদিও বুদ্ধি আমাদের জ্ঞান আহরণ করতে সাহায্য করে, কিন্তু জ্ঞান আর বুদ্ধি এক নয়। যাই হোক না কেন, শিক্ষকের কাজ হল কিভাবে তার উৎকর্ষ সাধন করা যায়, কিভাবে তাকে কাজে লাগান যায়। বর্তমান গবেষণা একটি বিশেষ দিকে আলোকপাত করেছে। সেই হল বুদ্ধির সঙ্গে পরিবেশের

সম্পর্কের ওপর। Mc. V. Hunt তাঁর Intelligence and Experience গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে বুদ্ধির কেবল একটি দিকেই বিকাশ হয় না। তার দুটি dimension আছে একটি vertical আর একটি horizontal এই horizontal development নির্ভর করে পরিবেশের ওপর। পরিবেশকে সমৃদ্ধ করতে পারলে বুদ্ধির কিছুটা উৎকর্ষ আনা সম্ভবপর। এটাই হল আশার কথা। আগে ধারণা ছিল মানুষ যে নির্দিষ্ট বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় তার কোনো ক্ষয়-বৃদ্ধি নেই। ইংরাজীতে একে বলা হত constancy of I. Q.। এই মত অনুযায়ী কিছুতেই বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিবর্তিত করা যায় না। কিন্তু আজ সে মতের আংশিক পরিবর্তন ঘটেছে। সেখানে শিক্ষক অভিভাবকের কিছুটা আশা জেগেছে যে হয়ত তাঁরা বুদ্ধির বিকাশের পথকে নানাভাবে প্রশস্ত করতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা এই যে যদি শিক্ষার্থী শৈশব থেকে স্নেহ ভালবাসা ও সুযোগ পায় তাহলে অনুকূল পরিবেশে তাদের বুদ্ধি বিকাশের পথ খুঁজে পায়। তা না হলে তার প্রকাশের পথ রুদ্ধ হয়। তাই দেখা গেছে একদল যারা অল্পবুদ্ধি বলে অভিহিত তাদের সমস্যার মূলে আছে cultural deprivation. অর্থাৎ তাদের পরিবারের মধ্যে স্নেহ ভালবাসা ও অনুকূল পরিবেশের অভাব। কাজেই কি গৃহে, কি বিদ্যালয়ে যাতে শিক্ষার্থীদের আবেগগত প্রয়োজন মেটে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন। সেদিকে ঘাটতি থাকলে বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব সব কিছুরই বিকাশ ব্যাহত হয়।

মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। বুদ্ধির সঙ্গে সাফল্যের সম্পর্কও আছে বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন। আচরণবাদী থর্নডাইকের মতে বুদ্ধি কয়েকটি সামর্থ্যের সমষ্টি আবার স্পিয়ারম্যান বুদ্ধির যে অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন তাকে সাধারণ সামর্থ্য বা ইংরাজীতে 'জি' (G) বলা হয়েছে। এই সাধারণ সামর্থ্যই মানুষের আচরণে ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। তাই আজও এর প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কার কত সাধারণ বুদ্ধি আছে তা জানলে অর্থাৎ প্রতিটি শিক্ষার্থীর শক্তি-সম্ভাবনা জানা থাকলে তাকে নির্দেশ দিতে সুবিধা হয়। কে কোন্ শাখায় পড়াশোনায় সাফল্য লাভ করবে বুদ্ধি থাকলে তা নির্ধারণ করা সহজ হয়। তাই বুদ্ধির পরিমাপের সার্থকতা আছে। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিহিত শক্তির ক্রমবিকাশের দায়িত্বও শিক্ষক-অভিভাবকদের ওপর।

সাধারণ শক্তিসামর্থ্য ছাড়াও বিশেষ সামর্থ্যের কথাও কেউ কেউ বলেছেন ;

ইংরাজীতে একে বলা হয়েছে "S" বা Specific ability এই বিশেষ শক্তি জানা থাকলে নির্দেশের কাজ আরও সহজ ও ফলপ্রসূ হয়। এই বিশেষ সামর্থ্য পরিমাপের উপায় আজ উদ্ভাবিত হয়েছে। বৃত্তিমূলক নির্দেশের জন্যে এর উপযোগিতা অনেক বেশী।

তাই শিক্ষকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে তার কাজ অসম্পূর্ণ থাকে।

বুদ্ধির পরিমাপ

ফরাসী মনোবিজ্ঞানী বিনে (Binet) প্রথমে মৌলিক বুদ্ধির পরিমাপের প্রয়াসী হন। এই বিষয়ে পরীক্ষা ও গবেষণা শুরু করেন। তাঁর উদ্ভাবিত বুদ্ধি পরিমাপক পরীক্ষাপদ্ধতি Terman কর্তৃক পরিমার্জিত হয়ে 'ট্যারম্যান বুদ্ধি-পরিমাপ-প্রণালী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি তাঁর পরীক্ষার দ্বারা বুদ্ধি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে বুদ্ধি বা ধীশক্তি জটিল বিষয়ের চিন্তা করবার শক্তিমাত্র। Wechsler বুদ্ধিকে কর্মকুশলতা বলে বিশ্লেষণ করেছেন। বুদ্ধি একটি ক্ষমতা বা শক্তি যার কল্যাণে মানুষ সমস্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে। Patterson অথবা Terman নানারকম কৃত্য অভীক্ষার (Performence test) উপর জোর দিয়েছেন। তাছাড়া Wechsler দু-রকম পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। একটি মৌখিক, অন্যটি কার্যিক।

এই অভীক্ষায় এক একজনকে আলাদাভাবে পরীক্ষা করতে হয়, ফলে সময় ও ব্যয় বেশী পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈন্যদের উৎকর্ষ নির্ণয়ের জন্য Group test বা দলগত পরীক্ষার উদ্ভব হয়। এর ফলে একই সময়ে অনেকের বুদ্ধির পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এর পর শিক্ষিতদের জন্য army alpha test আর অশিক্ষিতদের জন্য army beta test এর প্রচলন হয়। রুচি ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা পরিমাপের জন্য British Psychologioal laboratory ও Chicago-র Culture fair test-ও আছে। বর্তমানে আমেরিকায় WAIS (Weschler Adult Intelligence Scale) ও W. S. C. (Weschler Intelligence Scale for Children)-এর। সংক্ষেপে বলা যায় যে বুদ্ধির প্রকাশ প্রয়োগ সর্বাধিক। নানাদিকে আর বিভিন্ন আচরণের মধ্যে তা বোঝা যায়। কেউ বা দ্রুত চিন্তা করতে পারে, কেউ বা সমস্যার সহজ সমাধান খুঁজে বার করে, কারো বা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বেশী অসুবিধা হয় না।

আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে তার বিপরীতও দেখা যায়। শিক্ষার্থীদের আচরণও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলে তাদের বুদ্ধির কিছুটা পরিচয় মেলে। কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের আচরণ দেখে তাদের বুদ্ধি সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেওয়া হয়। এই ধারণা বিজ্ঞানসম্মত না হলে তা থেকে অনেক কিছু অনর্থ ঘটতে পারে। যদিও বা কারো বুদ্ধি কিছুটা বা কোনোদিকে অল্প হয় তাকে হতাশ করা কোনোমতেই উচিত নয়। বরঞ্চ তার যে যে দিকে নৈপুণ্য আছে সেদিকেই তাকে উৎসাহ দিতে হবে। এইভাবে নানারকম শিক্ষার্থীকে নিয়ে তাদের সামগ্রিক জীবনের উন্নতি সাধনে প্রয়াসী হতে হবে।

বুদ্ধি ছাড়াও আর একটি মানসিকতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তাকে বলা যায় প্রবণতা বা Aptitude. এই প্রবণতার মাধ্যমে একজনের আগ্রহ ও নৈপুণ্য প্রতিফলিত হয়। যার যেদিকে ঝোঁক তার সেই দিকে গেলে কাজে কিছুটা সাফল্য আসে। শুধু বুদ্ধি বা নৈপুণ্য থাকাই নয় আগ্রহেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রবণতাকে নানাভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, কলা, বিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে প্রবণতার তারতম্য দেখা দেয়। কেউ বা যন্ত্রবিজ্ঞানে আগ্রহী ও নিপুণ আবার কারো প্রবণতা চারুশিল্পের দিকে। বৃত্তিশিক্ষার নির্দেশের ব্যাপারে এই প্রবণতার বিশেষ স্থান আছে। প্রশ্ন হল এই প্রবণতা সঞ্চার করা যায় কিনা। এ বিষয়ে মতভেদ থাকলেও দেখা যায় যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানাভাবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আগ্রহ সঞ্চার করা যেতে পারে। কিন্তু নৈপুণ্য বাড়ানো যায় কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। একমাত্র অভ্যাসের ফলে কারো কোনো বিষয়ে নৈপুণ্য থাকলে তাকে কিছুটা বাড়ানো সম্ভব হতে পারে। তাই প্রবণতা বেশ কিছুটা সহজাত একথা মনে হয়।

শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তি সম্পর্কে আলোচনা করার সময় তার প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের কথা এসে পড়ে। কারণ মানুষ প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়। সংস্কারের মত কয়েকটি প্রবৃত্তি জীবনের এক একটি স্তরে বিশেষ প্রবল হয়। যেমন শৈশবে কৌতূহল, কৈশোরে যৌনপ্রবৃত্তি। এছাড়া কয়েকটি মূল প্রবৃত্তি জীবনের সব স্তরেই থেকে যায়। ক্ষুন্নিবৃত্তি, পলায়নের প্রবৃত্তি, সঞ্চয়, সংগ্রাম করা, গঠন করা ইত্যাদি সহজাত প্রবৃত্তি প্রত্যেকের মধ্যেই থাকে। এমন কি পশুজগতেও তার প্রকাশ দেখা যায়। এই প্রবৃত্তির পিছনে কোনো বুদ্ধির প্রয়োজন নেই কারণ এরা যে সহজাত। এমন কি কোনো রকম অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা মূলগত সংস্কারের পিছনে কাজ করে না, আপনা-আপনি তা

ঘটে। জীবজগতে এর প্রভাব অপরিসীম। অনেক সময় শ্রেণী শিক্ষক একই শিক্ষার্থীকে কখনো মনোযোগী আবার কখনো অমনোযোগী দেখেন। এর কারণ কি ?

মনের অবস্থা সব সময় একরকম থাকে না। স্বভাবতঃই মন চঞ্চল। তাই যতক্ষণ একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে মনকে নিবদ্ধ না করা যায় ততক্ষণই বিষয়বস্তু অস্পষ্ট থাকে। ইংরাজীতে কথা আছে যে—Our attention is the result of focus of our mind. কাজেই মনোযোগ হল চেষ্টাপ্রসূত।

বুদ্ধি ও শিক্ষকের দায়িত্ব ঃ

বুদ্ধি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদের ফলে বুদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই সংজ্ঞাগুলিকে সাধারণত চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যেমন (ক) জৈবিক সংজ্ঞা (খ শিক্ষামূলক সংজ্ঞা, (গ) মানসিক শক্তি-সংক্রান্ত সংজ্ঞা ও (ঘ) পরীক্ষা-নির্ভর সংজ্ঞা। বুদ্ধির যে কোনো সংজ্ঞাই আমরা গ্রহণ করি না কেন একটি বিষয়ে সকলেই একমত তা হলো বুদ্ধি আমাদের সহজাত। কারণ তা নিয়ে আমরা জন্মাই। এই সহজাত শক্তির পূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেওয়া যায় উপযুক্ত শিক্ষা-পরিবেশ রচনার মাধ্যমে। এই-খানেই শিক্ষা ও শিক্ষকের দায়িত্ব এসে পড়ে। যে সব মতবাদ বুদ্ধিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। যেমন—(১) রাজতন্ত্রবাদ (Monarchic view), (২) সামন্ততন্ত্রবাদ (Oligarchic view) ও ৩) অরাজকবাদ (Anarchic view). রাজতন্ত্রবাদ বুদ্ধিকে এক কেন্দ্রীয় মানসিক শক্তি হিসাবে পরিগণিত করে। এই মতবাদ বিশ্বাস করে যে, বুদ্ধি মনোজগতের সর্বময় কর্তা এবং এরই নির্দেশে সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। অপরপক্ষে, সামন্ততন্ত্রবাদ বুদ্ধির এই সর্বময় প্রভুত্বকে স্বীকার করে না। তাদের মতে বুদ্ধি বলে কোনো একক মানসিক শক্তি থাকতে পারে না। কয়েকটি বিশিষ্ট নির্দিষ্ট মানসিক শক্তির সমন্বয়ই হলো বুদ্ধি। এই প্রসঙ্গে স্পীয়ারম্যানের বুদ্ধির উপাদানতত্ত্ব উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে যে কোনো রকমের বৌদ্ধিক কাজ করতে গেলে সাধারণতঃ দু'রকমের মানসিক উপাদানের প্রয়োজন হয়—(১) সাধারণ উপাদান ও (২) বিশেষ উপাদান। ঐ ছাড়া থমসনের (Thompson) বুদ্ধি সম্পর্কে বিশেষ মতবাদ উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে আমাদের মন কয়েকটি মৌলিক পরস্পরনিরপেক্ষ উপাদানের সমন্বয়ে

গঠিত। এই মৌলিক উপাদানগুলি দলগতভাবে গ্রথিত এবং এর দ্বারা বৌদ্ধিক কাজের ব্যাখ্যা সহজ হয়। এই প্রসঙ্গে বার্ট (Burt) ও ভার্নন (Vernon). এর তত্ত্ব প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা তিনধরণের উপাদানকে মানুষের বুদ্ধির ভিত্তি বলে গ্রহণ করেছেন। যে সব শক্তি নিয়ে মানুষের সামগ্রিক বুদ্ধির প্রকাশ হয় তাদের মধ্যে যে শ্রেণীবিন্যাস লক্ষ্য করা যায় সেখানে একটি ক্রমপর্যায় বর্তমান। ইংরাজীতে একে বলা হয় hierarchical theory.

এর পরে আমেরিকার প্রখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক থার্স্টোনের (Thurston) বহু উপাদান তত্ত্ব স্মরণীয়। কারণ, এই তত্ত্বটি শিক্ষায় নির্দেশনার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক। এমনকি বর্তমানে যে বুদ্ধি ও অভীক্ষা আমেরিকায় বহুল ভাবে প্রচলিত সেই ওয়েক্সলারের (Wechsler) অভীক্ষা প্রণয়ন এই তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত।

শিক্ষাক্ষেত্রে বুদ্ধির গুরুত্ব সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে বুদ্ধিই যে একমাত্র সাফল্যের নির্দেশক নয় একথা আজ স্বীকৃত হয়েছে। বুদ্ধি জন্মগত ক্ষমতা, আর একে বাড়ানো যায় না—এমন একটি বিশ্বাস এখনও টিঁকে আছে। কিন্তু বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি বুদ্ধির স্বরূপ সম্পর্কে যে আলোকপাত করেছে তার তাৎপর্য আছে। যদিও বুদ্ধ্যঙ্কের স্থিরতা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি তবুও একথা মনে হয় যে বুদ্ধির একটি অংশ নির্দিষ্ট, যা নিয়ে মানুষ জন্মায়। কিন্তু আর একটি দিক থাকে যা শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা পরিবেশনের মাধ্যমে বাড়ানো যায়। তাই শিক্ষার কাজ হবে বুদ্ধির সেই দিকটিকে সমৃদ্ধ করা।

বর্তমানে বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ধারণ করার জন্য নানারকম অভীক্ষা প্রণীত হয়েছে। অবশ্য এই সব অভীক্ষা কিছুটা সীমিত। তবুও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বুদ্ধির পরিমাপ না করলে তার ওপর ভিত্তি করে নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। আজ কি বৃত্তিমূলক নির্দেশ, কি শিক্ষামূলক নির্দেশনা উভয় ক্ষেত্রেই নির্দেশের জন্য বুদ্ধির পরিমাপের সার্থকতা আছে। এর ফলে শিক্ষার অপচয় বা অবক্ষয় কমে আসবে। যার যে টুকু শক্তি তাকে কিভাবে পূর্ণ পরিণতি দেওয়া যায়, কিভাবে তাকে কাজে লাগানো যায় এর জন্য বুদ্ধ্যঙ্ক জানবার প্রয়োজন আছে।

১৩। অভিনিবেশ ও শিক্ষকের দায়িত্ব—

শিক্ষক যখন শ্রেণীতে পড়ান তখন তিনি বিশেষ বিশেষ শিক্ষার্থীকে

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অমনোযোগী দেখেন। কখনো দেখা যায় তাদের মন শ্রেণী থেকে অনেক দূরে। নিরুদ্দেশের যাত্রী হয়েছে তারা। উধাও মন নিয়ে হয়ত বা মেঘের সঙ্গী হয়েছে। এমনি অভিজ্ঞতা বিরল নয়। তাই শিক্ষকের কাজ হবে তার মনটিকে আবার বিষয়ের দিকে ফিরিয়ে আনা এবং পাঠের দিকে আগ্রহ সঞ্চার করা। বুঝতে হবে যে মনের এটা স্বাভাবিক ধর্ম। নানাভাবে অভিনিবেশকে ভাগ করা হয়েছে।

অভিনিবেশকে অনেকেই মনোযোজন বলেছেন। সহজাত প্রবৃত্তি ও রসের সঙ্গে এই মনোযোজনের একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। যে সকল বিষয় সহজ প্রবৃত্তি বা প্রক্ষোভকে উদ্দীপিত করতে পারে সেটাই মনোযোগের স্বাভাবিক ক্ষেত্র। এই সকল ক্ষেত্রে চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। একে অনৈচ্ছিক মনোযোগ বলা চলে।

অন্যান্য বিষয়ে যে ঐচ্ছিক বা চেষ্টাপ্রসূত মনোযোজনের প্রয়োজন হয় তা ইচ্ছাশক্তির ফলে সম্ভব হয়। শিক্ষকের কাজ হবে ঐচ্ছিক মনোযোগের বিষয়কে অনৈচ্ছিক মনোযোগের বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা।

মনোযোগকে আরও নানাভাগে ভাগ করা যায়। যেমন একটা হচ্ছে সংস্কার জাত বা সহজাত মনোযোগ। এই মনোযোগ আমাদের সহজাত সংস্কারের তাড়নায় আপনা থেকেই এসে যায়। খাদ্যান্বেষণ আমাদের একটা সহজাত সংস্কার। সে বিষয়ে আমাদের মনোযোগ স্বতঃস্ফূর্ত।

ব্যক্তিবিশেষে মনোযোগের তারতম্য হয়। কোনো কোনো লোক কোনো জিনিসেই বেশীক্ষণ মন দিতে পারেন না। তাঁদের অনবরত মনের ওপর একটু জোর খাটাতে হয়। আবার যাঁদের মনোযোগ স্থির ও নির্দিষ্ট তাঁরা অনায়াসেই যে-কোনো বিষয়ে মনোযোগকে ধরে রাখতে পারেন।

এছাড়াও অনেকে কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বা বিষয়ে গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে পারেন। আবার অনেকের মনোযোগ হয় বিস্তৃত ও ব্যাপক। সাধারণতঃ বিজ্ঞানীদের নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে হয়। কিন্তু মনোযোগ যাদের ব্যাপক হয় তাদের লক্ষ্য অল্পবিস্তর সব জিনিসের উপরেই পড়ে। কোনো বিশেষ একটা কিছুকে নিয়ে তারা লেগে থাকে না।

যারা স্থির মনোযোগী তারা কোনো বিষয়ের গভীরে গিয়ে তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে থাকে। যারা অস্থির মনোযোগী তারা তা পারে না।

শিশুদের মনোযোগ আর বয়স্কদের মনোযোগের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

শিশুরা যে-সব জিনিসে উৎসাহী বয়স্করা তাতে নয়। দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম— এইসব সম্বন্ধে বড়দের গভীর চিন্তা। বড়দের যা প্রিয়, শিশুদের তা প্রিয় নয়। শিশুরা রঙীন জিনিস, খেলনা প্রভৃতি নিয়ে অবসর বিনোদন করে। ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে রুচির কিছু তারতম্য থাকে। তাই মনোযোগের বিষয়বস্তুতেও তফাৎ। সূক্ষ্ম কাব্যকলাতে মেয়েদের মনোযোগ ছেলেদের চেয়ে বেশী। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছেলেদের আগ্রহ বেশী।

এগুলো গেল ব্যক্তির দিক। বিষয়ের দিক থেকেও মনোযোগের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। যেমন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মনোযোগ ও বুদ্ধিগ্রাহ্য মনোযোগ। একটি প্রত্যক্ষ অনুভূতিজাত বিষয়ে মনোযোগ, অপরটি বুদ্ধি-গ্রাহ্য মনোযোগ। কতকগুলি বিষয়ের মনোযোগে আমরা বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করি, আবার কতকগুলি বিষয়ে মনোযোগের সময় আমরা বিগয়গুলির মধ্যে থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করি।

শিক্ষার সঙ্গে মনোযোগের সম্পর্ক আছে। মনোযোগ আমাদের অবাঞ্ছিত শ্রম ও সময় বাঁচায়। জানবার বহু জিনিস আমাদের চারিপাশে সবসময়েই রয়েছে। আমাদের বিঘ্নসংকুল সীমিত জীবনে তাদের আয়ত্তে আনা বেশ শক্ত। প্রতিটি বিষয়ে মনোযোগের জন্য বেশ পরিশ্রমও করতে হয়।

শিশুরা স্বভাবতঃই চঞ্চল। কোনো জিনিসেই তারা বেশীক্ষণ লেগে থাকতে পারে না। আর নীরস জিনিসের বেলায় তো কথাই নেই। শিশুদের পড়ায় মনোযোগটা যাতে চেষ্টাকৃত না হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয় তারই প্রচেষ্টা করা উচিত। তাদের মনোযোগ নির্ভর করে তাদের পরিবেশের ওপর। তাই নার্সারী স্কুলগুলিতে গেলে বোঝা যায় যে সেটা শিশুদেরই জগৎ। বর্ণপরিচয় থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয়েই তাদের আকৃষ্ট করতে হলে চাই বৈচিত্র্য। গতানুগতিকভাবে গুণতে না শিখিয়ে তাদের যদি খেলাচ্ছলে শিক্ষা দিতে পারা যায় তাহলে সুফল হয়।

নীরস পাঠ সহজেই ক্লান্তি টেনে আনে। চিত্তাকর্ষক পাঠ শিক্ষার্থীদের ক্লান্তিকে দূর করে। সীমিত সময়ের জন্যে কে কতক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে তা দেখার প্রয়োজন, তাই তার পরিমাপের সার্থকতা আছে।

কাজেই দেখা যায় যে চেষ্টাকৃত অভিনিবেশের প্রয়োগই শিক্ষাক্ষেত্রে বেশী, কারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করবার মত আয়োজন সীমিত, তবে শিক্ষকের নৈপুণ্য ও শিক্ষণ কৌশলের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। অতি সাধারণ বিষয়বস্তুকেও তিনি আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন। এই মনোযোগ

ছাড়া আরও কয়েকটি দিকে শিক্ষকের দৃষ্টি দেবার অবসর আছে। স্মৃতি, কল্পনা ও চিন্তনের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত পার্থক্য দেখা যায়। এমন দেখা যায় যে কারো একবার পড়লে বিষয় আয়ত্তে আসে, কারো বা বহুবার অনুশীলন করেও বিষয় আয়ত্তাধীন হয় না।

শিক্ষাক্ষেত্রে মনোযোগ

মনোযোগ ব্যক্তিজীবনেব এক সক্রিয় মানসিক প্রক্রিয়া। শিখনের ক্ষেত্রে মনোযোগের গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। শিক্ষার্থীদের মধ্যে মনোযোগের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এই মনোযোগের কয়েকটি প্রকার ও পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। যেমন, এক রকম মনোযোগ আছে যা মূলতঃ প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত। এই ধরনের মনোযোগ স্বতঃস্ফূর্ত এবং ইচ্ছানিরপেক্ষ। শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করতে হলে এই ধরনের মনোযোগের বিশেষ সার্থকতা আছে। আর এক ধরনের মনোযোগের কথা বলা হয়েছে যা ইচ্ছা প্রণোদিত। যখন স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগের অভাব ঘটে তখন প্রয়োজন অনুসারে ইচ্ছা-প্রণোদিত মনোযোগের সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে। আর শিক্ষক এই কাজে বিশেষ সহায়ক হতে পারেন। কিভাবে এই ইচ্ছা-প্রণোদিত মনোযোগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায় সেবিষয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। শিক্ষকের দায়িত্ব হবে স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগের সহায়তায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধীরে ধীরে ঐচ্ছিক মনোযোগ সৃষ্টি করা। কিন্তু আদর্শ স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগ সবসময় সঞ্চারিত করা সম্ভব হয় না। তাই ইচ্ছা-প্রণোদিত মনোযোগর সাহায্য নিতে হয়। নানা প্রকার শিক্ষামূলক প্রদীপনের মাধ্যমে অভিনবত্ব ও গতিশীলতা পাঠের মধ্যে আনতে পারলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মনোযোগ বা অভিনিবেশ বাড়ানো যায়। তাছাড়া শিক্ষার্থীর মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এনে ও নানাভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণা সঞ্চার করে এই মনোযোগ বাড়ানো যায়। যেমন ক্রিয়াকেন্দ্রিক শিক্ষা (project method) ও দলগত আলোচনা এবং শিক্ষায় প্রদীপন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষায় মনোযোগকে কার্যকরী করে তোলে। এছাড়া পুরস্কার ও শাস্তি ঘোষণার মাধ্যমেও আগ্রহ কমবেশী সঞ্চারিত হয়। ইংরাজীতে যাকে programmed learning বলা হয়েছে তার মূল নীতি অনুসরণ করলেও আগ্রহ সঞ্চারের ব্যাপারে সুফল পাওয়া যায়।

১৪। স্মৃতি ও তার শিক্ষাগত তাৎপর্য্য

স্মৃতি কি ? তার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি কি সে সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। স্মৃতি এমনই একটি শক্তি যা আমাদের আয়ত্তাধীন কোনো বিষয়কে মনের মধ্যে সংরক্ষণ করতে ও প্রয়োজনানুযায়ী সেই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করতে সহায়তা করে। প্রতিদিন আমাদের সামনে বহু ঘটনাই ঘটে চলেছে। প্রতিটি ঘটনাই আমাদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। কিন্তু সব কথাই আমাদের মনে থাকে না। কিন্তু কতকগুলি কাজ বা ঘটনা আমাদের মনে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ছাপ রেখে যায়। পুনরাবৃত্তির ফলে স্মৃতির ছাপ আরো স্পষ্ট হয়। স্মৃতির মূলে মনের কয়েকটি ক্রিয়া আছে। প্রথমতঃ বিষয়ের আয়ত্তীকরণ। নতুন বিষয়টা বারে বারে অভ্যাস করলে তবেই তা আমাদের মনের মধ্যে গ্রথিত হয়। দেখতে হবে যে কত অল্প সময়ে আমরা কত বেশী জিনিস আয়ত্ত করতে পারি। কোনো বিষয় তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করার মূলে আছে শিখবার রীতি। ছোটদের পৃথকভাবে অ আ শেখবার জন্যে স্বরবর্ণ মুখস্থ করাতে যে সময় বা শ্রম লাগবে, ছড়ার মধ্যে দিয়ে শেখালে তার চেয়ে অনেক কম সময়ে শিক্ষার্থী তা শিখতে পারবে।

দ্বিতীয়তঃ, যে বিষয়টা আমাদের আয়ত্ত হল সেটাকে আমাদের সংরক্ষণ করতে হয়। প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর তার ছাপ রেখে যায়। তবে কোনো ছাপ খুব স্পষ্ট হয় আবার কোনটা অস্পষ্ট। নিত্যনতুন অভিজ্ঞতার ঢেউ আমাদের পুরনো ছাপগুলোর উপর গিয়ে পড়ে। তাতে গভীর ছাপগুলোই জেগে থাকে আর অগভীরগুলো মুছে যায় বা তলিয়ে যায়। তাই অতীতের সব কিছুই আমাদের মনের মধ্যে সবসময় সচেতনভাবে জেগে থাকে না। অধীতবিদ্যা যদি আমরা মনে আনতে না পারি তাহলে সেখানে আমাদের স্মরণশক্তি অকেজো হয়ে রইল।

স্মৃতি মূলতঃ কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীরই কাজ। যখন কোনো উত্তেজক আমাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি জাগায় তখনই জ্ঞানবাহী স্নায়ু তাকে পৌঁছে দেয় কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীতে আর কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলী কর্মবাহী স্নায়ুদের মাধ্যমে তার প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়ে পৌঁছে দেয়। ফলে স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে একটা খাতের সৃষ্টি হয়। একই ধরনের উত্তেজক যখন আবার আসে তখন আর বিশেষ অসুবিধা হয় না। আগেরবারের প্রতিক্রিয়ার পথেই সে চলে। স্মৃতিতে

নতুন অভিজ্ঞতা আহরণ করে তাকে সংরক্ষণ করলেই চলেনা, তাকে প্রয়োজন মতো কাজে লাগাতে হয়।

স্মৃতি সাধারণতঃ দু-রকমের। একটা অভ্যাসগত স্মৃতি, অপরটি যৌক্তিক স্মৃতি। অভ্যাসগত স্মৃতিকে ইংরাজীতে Rote memory বলা হয়। কারণ পুনরাবৃত্তির মাধ্যমেই এই ধরনের স্মৃতির সৃষ্টি। যেমন নামতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নামতা মুখস্থ বলার পেছনে Rote memory-টাই বেশী কাজ করে।

যৌক্তিক স্মৃতি হচ্ছে সেই ধরনের স্মৃতি যেখানে আমরা কোনো বিষয়কে মনে আনি নিছক অভ্যাস বলেই নয়, সেই বিষয়ের অন্তর্নিহিত অংশগুলোর সম্পর্ক নির্ণয় করে। নৌকাডুবিতে বেঁচে যাওয়া লোক তুফানের দিনে নৌকোয় চড়লে নৌকাডুবির স্মৃতিতে ত্রস্ত হয়ে ওঠে। এছাড়া desoluiarv memory বলে একরকমের স্মৃতি আছে। এটা একটা বিশেষ মানসিক শক্তি। অনেকে কোনো বিশেষ ঘটনা, কোনো বক্তৃতার অংশবিশেষ, কবিতা, সন-তারিখ প্রভৃতি নানাধরনের জিনিস মনে রাখতে পারে। স্মৃতির মাপকাঠির কতকগুলি প্রণালী আছে—যেমন, আয়ত্তীকরণ প্রণালী। এই প্রণালীতে কতকগুলি বাক্যসমষ্টি শিক্ষার্থীকে কিছুক্ষণ দেখিয়ে সরিয়ে নিয়ে তাকে বলতে বলা হয়। প্রথমে ভুল হয় এবং যতক্ষণ না ঠিক হয় ততক্ষণ শেখানো ও বলানো পর্যায়ক্রমে চলে। প্রথমবারের মনে রাখার সংগে দ্বিতীয়বারের তুলনা করলে সংরক্ষণের আনুপাতিক হিসাব পাওয়া যায়।

এতে শিক্ষার্থীকে বিষয়টা পড়িয়ে নিয়ে যতক্ষণ না সে সঠিকভাবে বলতে পারে ততক্ষণ তাকে বলে দিতে হয়। ভোলার হারটা থেকেই সংরক্ষণের ক্ষমতা ঠিক করা যায়।

স্মৃতির স্থায়িত্ব সকলের সমান নয়। সাধারণ কথায় বুদ্ধিমানদের স্মৃতি-শক্তি সাধারণতঃ বেশী। অনেকে বিষয়বস্তু তাড়াতাড়ি আয়ত্তে আনতে পারে আবার তাড়াতাড়ি ভুলতেও পারে। অনেকে তাড়াতাড়ি আয়ত্তে এনে বহুদিন ধরে বিষয়টিকে সংরক্ষণ করতে পারে। অনেকে ধীরে ধীরে আয়ত্ত করেও দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে পারে। আবার অনেকে আয়ত্তে আনতেও যেমন দেরী করে, তেমনি তাড়াতাড়ি ভুলেও যায়। যে যে বিষয়বস্তু অনুষংগ পদ্ধতির সাহায্যে শিখি, বা যুক্তির মাধ্যমে ভালভাবে বুঝতে পারি, সেগুলো বেশীদিন মনে থাকে।

সমস্ত জীবন ধরে বহু রকমের অভিজ্ঞতা আমাদের হয়। কিন্তু সব

আমাদের মনে থাকে না। কতকগুলি অতি দুঃখের বা সুখের স্মৃতি আমাদের মনে থেকে যায়। তাদের আমরা কখনোই ভুলি না। এ-সব স্মৃতি আমাদের মনে থেকে যায়। এ-সব ঘটনা এমন গভীর ছাপ ফেলে যায় যে শত চেষ্টাতেও আমরা তা মুছতে পারি না। বহু বিচিত্র বিরোধী ঘটনার ছাপ সেই ছাপকে ম্লান করে দিতে পারে না।

স্মৃতির হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায় কিনা এটাই হল প্রশ্ন। স্নায়ুমণ্ডলীর গঠনের ওপর স্মৃতি নির্ভর করে। অনুকূল স্নায়ুমণ্ডলীর গঠন ভাল ফল দেয়। স্নায়ুমণ্ডলীর গঠনের পরিবর্তন করা যায় না, তবে চেষ্টা করলে স্মৃতির অল্প বিস্তর হেরফের করা সম্ভব। শিক্ষকের দায়িত্ব এখানেই শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে না পারলে সে পাঠকে আয়ত্ত করতে পারবে না। আর আয়ত্ত না করতে পারলে মনে রাখার কথাই ওঠে না। ছড়া, ছবি, উদাহরণের মাধ্যমে যদি পড়ানো যায় তাহলে মনে থাকে বেশী। বিষয়কে সব সময় সরস ও সজীব করে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করতে হবে। প্রতিটি বিষয় শিক্ষা দেবার আগে যদি একটা পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করা যায় তাহলে পরিপ্রেক্ষিতের সূত্র ধরে বিষয়টিকে মনে আনা সহজ হয়।

পাঠকে ছাত্রদের কাছে অতি সুগম ও সরস করতে হয়। কানে শোনা বিষয় থেকে চোখে দেখা বিষয় বেশী মনে থাকে। তাই বিজ্ঞানে পাতার বিষয় পড়াবার সময় যদি শিক্ষার্থীদের বাগানে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন পাতার আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া হয় তাহলে সেটা মুখে বোঝানোর চেয়ে বহুগুণ কার্যকরী হয়। আবার পর্যবেক্ষণমূলক কাজগুলো, যেমন বীজের অঙ্কুরোদ্গম ও গাছে পরিণত হবার বিষয়টা যদি শিক্ষার্থীদের নিজেদের পরীক্ষা করতে দেওয়া যায় তাহলে তাদের বিষয়টা মনে তো থাকবেই, উপরন্তু উৎসাহ জাগবে। মনে রাখার মূলে থাকে আগ্রহ ও উৎসাহ। অন্য সমস্ত চিন্তা সেই সময়ের মতো সরিয়ে যদি কোনো বিষয়ে মন দেওয়া যায় তাহলে স্মৃতির ছাপ মনের উপর গভীরভাবে পড়বে। Method of correlation-এর উদ্দেশ্য অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় আলাদা করে পড়ালে সময় লাগে বেশী এবং বিষয়গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ছাত্ররা নির্ণয় করতে পারে না। সাধারণভাবে যে কোনো একটা বিষয় ধরে নিয়ে পড়ানো যায়।

মোটকথা, কেবল আবৃত্তির সাহায্যে মুখস্থ করাই নয়, অনুষঙ্গ পদ্ধতির

সাহায্য নিয়ে বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মনে রাখার কাজ সহজ হয়। তাই সব ক্ষেত্রে Logical memory (যৌক্তিক স্মৃতি)-কে গড়ে তুলতে সহায়তা করতে হবে। তার ফলে শিক্ষার্থীর মনের ওপর চাপ কিছুটা কমে যায়। এছাড়া মানুষের স্মৃতি নির্ভর করে তার অভ্যাসের ওপর। অনুকূল পরিবেশ ও মানসিক অবস্থা স্মৃতিকে ও স্মৃতির সঞ্চয়কে সহজ ও সুগম করে তোলে। অনেক সময় শ্রাব্য-চাক্ষুষ সহায়তায় স্মৃতিকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। অর্থাৎ বিষয়বস্তুকে নানাভাবে নানা ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে পারলে তা সহজে মনে থাকে ও স্মৃতি অধিককাল স্থায়ী হয়। কারো বা নীরব পাঠে, কারো বা সরব পাঠে আবৃত্তির কাজ সহজ হয়। এক একজন এক একভাবে বেশী মনে রাখতে পারে। কেউ বা শুনে, কেউ পড়ে, বলে ও লিখে বেশী মনে রাখার চেষ্টা করে। তাই শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে মাত্র একটি নির্দিষ্ট ধারায় সকলের স্মৃতি উন্মেষিত বা স্থায়ী হয় না।

এই স্মৃতিকে নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, একাগ্রতা ও পরিবেশ স্মৃতির কাজকে প্রভাবিত করে। অনেকের দুই একবার পড়েই মুখস্থ হয়ে যায় কিন্তু তাদের বেশীদিন মুখস্থ থাকে না কিন্তু অনেকের আবার তার উল্টো অর্থাৎ মুখস্থ হতে দেরী হয় আবার মুখস্থ থাকে বেশীদিন। ইংরেজীতে একে বলে memorising and retention অর্থাৎ মুখস্থ করা এবং তাকে মনে রাখা। সমস্ত স্মৃতি পদ্ধতিগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এর বিশেষ তিনটি দিক আছে। Recognition, recall ও retention অনেক সময় অনেকগুলি জিনিষের নাম দেওয়া হল, কোন নামটি ঠিক এটা শিক্ষার্থী দেখে বলতে পারে। অর্থাৎ অনেকগুলির মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার কাজে তার কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু তাকে যদি বলা হয় ঐ নামটি নিজের থেকে বলতে তাহলে হয়তো সে পারবে না। তাই দেখা যায় যে recognition থেকে অনেকের পক্ষে recall কঠিন। Recall করার জন্য মনের উপর বেশী চাপ পড়ে। তাই আজ আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে recognition এর কিছুটা অবকাশ দেওয়া হয়। ইংরাজীতে একে বলা হয় Multiple choice—অনেকগুলির মধ্যে একটিকে সঠিক বলে বেছে নেওয়া।

স্মৃতিকে ঘিরে এই যে রহস্য তা রয়ে গেছে। মানুষ কি মনে রাখে, কি ভুলে যায়, কেমন করে ভুলে যায় এ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। অনেকরকম

ব্যাখ্যা থাকা সত্ত্বেও মনে হয়েছে যে এ রাজ্য এখনও অস্পষ্ট। কারণ অবচেতন মনের যে প্রক্রিয়া তা আজও রহস্যময়। অনেকদিন একজনকে ভুলে গেছি, তার নাম ভুলে গেছি হঠাৎ সেই নামটা দশ বছর বাদে মনে হল। এর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করা সত্যিই কঠিন। তারপর আর একটা কথা আছে "ভুলে থাকা নয় তো সে ভোলা, বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছে সে দোলা" অর্থাৎ যা আমরা ভুলে গেছি বলে মনে হয় তা মন থেকে একেবারে মুছে যায় না। মনের অবচেতন স্তরে তা তলিয়ে যায়। আর কখনও কখনও তারা ফাঁকি দিয়ে উঠে পড়ে। তখন হঠাৎ বহুদিনের ভুলে যাওয়া জিনিষ স্মৃতিপটে জাগে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই রহস্য অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। অনেকে বলে থাকেন যে ভোলাটা হ'ল মনের স্বাভাবিক ধর্ম। বালুচরের ওপর পুরানো ঢেউ যে দাগ রেখে যায় নতুন ঢেউ এসে তা মুছে দেয়। তেমনি নতুন অভিজ্ঞতার তরঙ্গ নতুন রেখাপাত করে মনেরই সৈকতে। আসল কথা ভোলার একটা রীতি আছে। যে যা মনে রাখতে চায় বা ভুলতে চায় সেই অনুযায়ী আমাদের মানসিক প্রক্রিয়া চলতে থাকে। অনেকের ছোটখাট ব্যাপার কিছুই মনে থাকে না। কিন্তু তারা কবিতার ছত্রের পর ছত্র মুখস্থ বলতে পারে। তাই শিক্ষকের কোনো আশু সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবার আগে শিক্ষার্থীর মনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন। যা কিছু আমরা শিখি তার কিছুটাতো ভোলার প্রয়োজন আছে। আর ভুলতেও হবে তা না হলে নতুন জিনিষ শিখব কি করে? স্মৃতিশক্তি সীমিত। নানা পর্যায়ে এই স্মৃতির প্রকাশ; যেমন ধারণা, ধ্যান, আবৃত্তি ইত্যাদি। সংস্কৃতে একটি কথা আছে "আবৃত্তিঃ সর্ব শাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী।" অর্থাৎ একটি বিষয়ে যদি আমরা একাগ্র হয়ে আবৃত্তি করতে থাকি তাহলে তা মনে থাকবেই এমনকি পুনরাবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাই শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি করতে উৎসাহ দিতে হবে। এই আবৃত্তির মাধ্যমে তারা ভাবাবেগ প্রকাশ করবে এবং ক্রমশঃ বিষয়রসকে অনুভব করবে। বিশেষ করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবৃত্তির বিশেষ উপযোগিতা আছে। দুঃখের কথা আজ অনেক উন্নত শ্রেণীতেও অনেককে একটি কবিতা আবৃত্তি করতে বললে তার যথাযথ আবৃত্তি হয় না। তার ফলে মনেও তা দাগ কাটে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে স্মৃতি আমাদের একটি বিশেষ শক্তি। এই শক্তি সীমিত হলেও প্রয়োগের গুণে বা দোষে তাকে কমবেশী কার্যকরী করা যায়। তাছাড়া মানুষের

চিন্তাবিক্ষোভকে কমিয়ে এনে মনের স্থৈর্য বাড়িয়ে স্মৃতিকে বিশেষ ফলপ্রসূ করা যায়। মন যদি ভাবস্থির হয়, যদি সমাহিত থাকে তবে নির্মল মুকুরের মত যে কোনো বিষয়ের ছায়া তার ওপর স্পষ্ট হয়ে ওঠে আর সহজেই তা মনে থাকে। তাই শিক্ষককে নির্দেশ দিতে হবে কিভাবে তার মুখস্থ করার কাজটিকে সহজ ও সুগম করে তুলতে পারে। সময়, পরিবেশ, মানসিক অবস্থা প্রত্যেকেরই বিশেষ প্রভাব আছে। অনেকেই মনে করেন যে সকালে মুখস্থের কাজ সহজ হয় আর তার কারণ হ'ল পরিবেশ তখন স্নিগ্ধ থাকে ও মনও সতেজ থাকে।

অনেক সময় দেখা যায় যে একটা জিনিষ কিছুতেই মনে থাকছে না। বারংবার পড়া সত্ত্বেও মনে কিছু দাগ কাটছে না। এসব ক্ষেত্রে কি করা উচিৎ? এর একটা উপায় হল প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে মানসিক প্রক্রিয়াকে আরও সজীব করে তোলা। এই আলোচনার ফলে মন নাড়া পায় এবং আলোচনার বিশেষ বিশেষ দিক অনুষঙ্গের কাজ করে। দেখা গেছে ছোট ছোট দলে ভাগ করে বিষয়বস্তুকে নানাভাবে আলোচনা করলে শিক্ষার পথ সহজ হয়।

এই স্মৃতিকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি প্রশ্ন মনে জাগে। যেমন, স্মৃতিশক্তি নিয়ে মানুষ জন্মায়, না স্মৃতিশক্তিকে চেষ্টার ফলে বাড়ানো যায়? অনেক সময় দেখা যায় যে, জীবনের এক এক স্তরে এক এক রকম স্মৃতিশক্তি শিক্ষার্থীর পাঠানুশীলনে সহায়তা করে। প্রথম জীবনে মানুষের অনুকরণ করার শক্তি প্রবল থাকে। সে যা কিছু শোনে তাই তার সহজে মুখস্থ হয়ে যায়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই রকম স্মৃতি ক্রমশঃ হ্রাস পায়। কিন্তু পরে আর এক রকম স্মৃতিশক্তির উন্মেষ হয়। ইংরাজীতে একে বলে Logical memory (যৌক্তিক স্মৃতি)। স্মৃতির এই দিকটি কিভাবে কাজে লাগানো যায় সে বিষয়ে শিক্ষকের চিন্তা ও গবেষণার অবকাশ আছে।

স্মৃতি ও শিক্ষকের কর্তব্য

বর্তমানে আমরা শিক্ষার্থীর ভাষামূলক শিখনকে প্রাধান্য দিই। ক্রিয়া-কেন্দ্রিক শিক্ষার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলেও গতানুগতিক পুনরাবৃত্তি—মূলক শিখন আজও টিঁকে আছে। তাই আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থাও গতানুগতিক ধারায় চলে আসছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে স্মৃতিলব্ধ তথ্যের উপস্থাপন করতে পারলে পরীক্ষায় সাফল্য সুনিশ্চিত হয়। কিন্তু

প্রশ্ন হলো এই স্মৃতিকে কিভাবে প্রকৃত শিক্ষার দিকে উদ্দিষ্ট করা যায়, কিভাবে স্মৃতি উজ্জীবিত করা যায়।

স্মরণক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এর কয়েকটি উপাদান আছে। যেমন (১) শিখন, (২) ধারণক্রিয়া (retention), (৩) পুনরুত্থাপন, (৪) পুনরুদ্রেক, (৫) প্রত্যভিজ্ঞা। প্রতিটি পর্যায়ে স্মৃতির যে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া রয়েছে তাকে স্বতঃস্ফূর্ত করতে হলে কয়েকটি উপায় উদ্ভাবন করা যেতে পারে। যেমন (ক) পাঠ্য বিষয়ে বস্তুকে অতীত অভিজ্ঞতা বা ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে তাকে অর্থপূর্ণ ভাবে উপস্থাপিত করলে ধারণ ও শিখন দুই প্রক্রিয়াই সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠবে।

(খ) পাঠ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে তার সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা দেওয়া ফলপ্রসূ হয়।

(গ) শিক্ষার্থীর প্রবণতা ও আগ্রহের দিকে দৃষ্টি রেখে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন হলে স্মরণপ্রক্রিয়া কার্যকরী হয়।

(ঘ) একটি নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করে এই স্মরণপ্রক্রিয়াকে সহজ করা যায়।

(ঙ) পাঠ দানের সময় শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের সক্রিয় শিক্ষণের নীতি অনুসরণ করতে বলেন তাহলে তা কার্যকরী হয়।

(চ) শিক্ষণ সময়ের দৈর্ঘ্য ঠিকমতো নির্বাচন করে শিক্ষার্থীদের অবসাদ আসার আগেই আলোচনা সাময়িক ভাবে বন্ধ করা বাঞ্ছনীয়।

(ছ) শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চারের জন্য বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর কোনো চাহিদার সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে তাদের মধ্যে প্রেষণা জাগ্রত হয়।

(জ) বিষয়বস্তুর উপযোগিতা বুঝে অভিজ্ঞতার প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার্থীর স্মরণ প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করে তোলা সহজ হয়। তাই শ্রেণীপাঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের এই কয়টি নীতির অনুসরণ করা উচিত। মোটকথা অভ্যাসগত ও যান্ত্রিক স্মৃতির পরিবর্তে যুক্তি প্রতিষ্ঠিত বা যৌক্তিক স্মৃতির প্রয়োগের দিকে শিক্ষার্থীকে অনুপ্রেরিত করতে হবে।

প্রকৃত স্মৃতি ও স্থায়ী স্মৃতিকে উন্মেষিত করার সব রকম আয়োজন করতে হলে জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতার সঞ্চয়নকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। আদর্শগত দিক থেকে যুক্তিভিত্তিক স্মৃতি (logical memony) স্থায়ী স্মৃতি, সক্রিয় স্মৃতি (active momany) ও ব্যক্তিগত স্মৃতি অন্যান্য স্মৃতির থেকে

শিক্ষাক্ষেত্রে অধিক সহায়ক। তাই কিভাবে এই স্মৃতিগুলিকে কার্যকরী করা যায় সেবিষয়ে বিশেষ চিন্তা ও গবেষণার অবসর আছে।

১৫। কল্পনা ও শিক্ষকের দায়িত্ব

স্মৃতি ছাড়াও আরও অনেক মনের শক্তি শিক্ষার্থীর জীবনকে প্রভাবিত করে। যেমন কল্পনা। কল্পনার ফলে অনেক সৃষ্টিমূলক কাজ সম্ভব হতে পারে। যেমন কাব্যরচনা ও ছবি আঁকা কল্পনার ফলশ্রুতি। বাস্তব থেকে নেওয়া হলেও ভাববিলাস তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই কল্পনার তারতম্য দেখা দেয়। সাধারণতঃ দুরকমের কল্পনা থাকতে পারে। একটি হল মুক্ত কল্পনা আর একটি অমুক্ত। এই কল্পনার নানাদিক সম্বন্ধে শিক্ষকের সজাগ থাকা প্রয়োজন। বাস্তবজীবনে এদের প্রয়োজন আছে। আমাদের মনের সৃজনশীলতার ফলশ্রুতিহিসাবে কল্পনার প্রকাশ হতে পারে। যেমন সাহিত্য, শিল্প, দর্শন সবদিকেই কল্পনার অবদান আছে।

কল্পনার উপযোগিতা যথেষ্ট। ইংরাজীতে যাকে creative imagination বলা হয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তার মূল্য যথেষ্ট। বিজ্ঞানীদের কল্পনা কত উদ্ভাবন ঘটিয়াছে। শিল্পীর সৃষ্টির মূলে আছে এই কল্পনা। আমাদের সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান, নৃত্য, সংগীত সমস্ত বিষয়ের গবেষণার মূলেও intellectual imagination এর প্রভাব। দেশের সমৃদ্ধি বা ব্যক্তিজীবনের সমৃদ্ধি practical imagination এর ফলে সম্ভবপর হয়।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নানা সংঘাত আসে। আমাদের বহুবাসনা এই সংঘাতে চূর্ণ হয়ে যায়। আমাদের মন সেই সব বাসনাপূরণের কামনায় চঞ্চল হয়। নিরর্থক কল্পনায় হয়তো বিশেষ কোনো কাজই হয়না।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা স্বভাবতঃ কল্পনা-প্রবণ। পারিপার্শ্বিককে ঘিরে তারা প্রথমে কল্পনার জাল বুনতে থাকে। যতই তাদের বয়স বাড়তে থাকে ততই তাদের কল্পনা জগৎ প্রসারিত হয়। কল্পনাকে বিকশিত করে জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া শিক্ষার উদ্দেশ্য। ছোটবেলা থেকে যাতে শিশুরা ভাল কাজ করার প্রেরণা পায় সেই ধরণের কল্পনা জাগিয়ে দেওয়া উচিত। কল্পনা মিথ্যাশ্রয়ী হলে তার পরিণতি ভালো না হ'তে পারে। প্রায়ই আকাশ-

কুসুম চিন্তা করা সুস্থ চিত্তের লক্ষণ নয়। কল্পনাকে যদি বাস্তবাভিমুখী করা যায় তবেই সফল পাওয়া যায়।

আমাদের জীবনে বহু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যা আমরা মনে স্থান দিতে চাই না। এইসব চিন্তা আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর চাপ সৃষ্টি করে মনের বিকার ঘটায়।

স্মৃতি ও কল্পনা উভয়ক্ষেত্রেই আমরা মানসিক ছবির (Imagery) উপর নির্ভর করি। স্মৃতির বেলায় আমাদের অভিজ্ঞতার সূত্রকে টেনে মনে করতে চেষ্টা করি। কিন্তু কল্পনায় অভিজ্ঞতার সামগ্রিক রূপ কাজে লাগে।

জীবনের অতৃপ্ত অক্ষমতাকে ভুলতে না পেরে অনেক সময় মানুষ কল্পনার আশ্রয় নেয়। দিবারাত্র এইসব কল্পনার প্রশ্রয় দিলে বাস্তব দৃষ্টি হারিয়ে যায়। তখন আর সাধারণ সুস্থ মন থাকে না। বিকৃতকল্পনা চিত্তের বিকার এনে দেয়। এই ধরনের অসুস্থ লোকেদের অনেকের ধারণা হয় যে তারা আগে খুব ভালো ও বড় ছিল। এই চিন্তা তাদের মনে একটা স্থায়ী জটের সৃষ্টি করে।

অনেকে মিথ্যা জিনিস নিয়ে বড়াই করে। এর মূলে আর কিছু নেই আছে শুধু মিথ্যা কল্পনা। জীবনের ক্ষেত্রে তারা সর্বদিক দিয়েই পিছিয়ে পড়ে আছে। কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তারা নিজেদের বিদ্বান অর্থবান বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। এইভাবে তারা চিরকাল নিজেদের সান্ত্বনা দিয়েই চলে।

ব্যক্তিগত জীবনেও অনেকে নিজেদের অতিরিক্ত বুদ্ধিমান বলে মনে করে। তারা যা করে তাই ঠিক, আর অন্যসকলে যা করে তাই ভুল। এই ধরনের মিথ্যা ধারণা গড়ে তোলা সুস্থ মনের লক্ষণ নয়।

প্রত্যক্ষ ও কল্পনা

যে সব জিনিস আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তা প্রত্যক্ষ। আর যে সব বিষয় আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বাইরে, মন কল্পনার সাহায্যে তাদের ছবি আঁকে। এই মানস-ছবিই (imagery) হল কল্পনার উপাদান। কল্পনার বৈশিষ্ট্য এখানেই। প্রত্যেকের সম্পর্ক শুধু বর্ত্তমানের সঙ্গেই। কিন্তু কল্পনার গতি বাধাবন্ধহীন, অপরিসীম, কল্পনায় আমরা দূরে অতীতে চলে যেতে পারি। আবার ভবিষ্যতেও যেতে পারি। মন তার অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে নানাভাবে নাড়াচড়া করে। কখনও স্মৃতিমন্থন, কখনও রোমন্থন চলতে থাকে।

কল্পনার শ্রেণীবিভাগ

কল্পনা সচেষ্ট ও নিশ্চেষ্ট এ দুরকমের হতে পারে। সৃজনাত্মক কল্পনা আমাদের মন থেকেই কতকগুলো ছবি আঁকে। Creative imagination সবসময়ই বাস্তবাভিমুখী হয় না। যখন বাস্তবাভিমুখী হয় তখন তাকে বলা হয় বাস্তব কল্পনা practical imagination)। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তব কল্পনার উদাহরণ।

Receptive imagination এর ক্ষেত্রে কল্পনার একটা নির্দিষ্ট উত্তেজক থাকে। যেমন সৃষ্টিবিষয়ক প্রদর্শনী দেখে এসে মনে মনে কৃষিবিদ হবার কল্পনা জাগে।

যে সব কল্পনা বুদ্ধির বা জ্ঞানের বিকাশ ঘটায় তাদের বলা হয় intellectual imagination, একটা অতি সামান্য বিষয়ের কল্পনা বহুসময় দার্শনিকের গবেষণার উৎস হয়।

যে কল্পনার আশ্রয় করে প্রতিমাশিল্পী দেবীর দেহ অপার্থিব রূপলাবণ্যে ভরে দেয় তা হচ্ছে aesthetic imagination.

বিষয়বস্তু হিসাবে আবার কল্পনা বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি হয়। রাজার সোনার মুকুটের খাদ পরীক্ষা করতে গিয়ে আর্কিমেডিস বিখ্যাত আপেক্ষিক গুরুত্বের সূত্র বার করেন। মহাশূন্যে ভাসমান গ্রহ উপগ্রহের কল্পনা বিজ্ঞানীদের মনে এনে দিল কৃত্রিম উপগ্রহের পরিকল্পনা। এসব বৈজ্ঞানিক কল্পনার উদাহরণ।

আবহাওয়া প্রতিকূল দেখে ধারণা হল যে ধান এবার হবে না, তাই কিছু ধান কিনে রাখা হল। এটা হল expectation, আবার আবহাওয়া অনুকূল দেখে ভবিষ্যতে ভালো ধান হবে, এই চিন্তাটি হল anticipation-এ দুটো এক ধরনের কল্পনা।

যে কল্পনা করবার সময় আমাদের মন নিঃসীম শূন্যে পাখীর মতো বাধা-বন্ধ হীন হয়ে ঘুরে বেড়ায় সেটা হল মুক্ত কল্পনা (Free imagination); আর যেখানে কল্পনা সহজ পথ না পেয়ে নানা প্রতিকূলতার আবর্তে ঘোরে সেটা হল controlled imagination. Illusion, Hallucination, Dream এগুলো কল্পনারই শাখাপ্রশাখা।

একটা বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য বোধ থেকেই Illusion এর জন্ম হয় কিন্তু Hallucination-এর উল্টোটাই হয়। সেখানে বস্তু বা বিষয়ের অস্তিত্ব থাকে

না। আপনাথেকেই ভাব এসে কল্পনাকে আশ্রয় করে। মনের বিরুদ্ধে ইচ্ছে অনেক সময় স্বপ্নে রূপ পায়। অনেক সময় যে কল্পনার সমাপ্তি হয় নি, ঘুম এসে গেছে, স্বপ্নে সেই কল্পনার সমাপ্তি হয়।

কল্পনার উপযোগিতা :

কল্পনা যে সবসময় কালই হরণ করে তা নয়, সুস্থ কল্পনার উপযোগিতা আছে। Creative imagination আমাদের মনের সৃজনধর্মিতার পরিপোষক। বিজ্ঞানীর কল্পনা কত উদ্ভাবন ঘটিয়েছে। শিল্পীর প্রেরণার মূলে আছে এই কল্পনা। আমাদের সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, নৃত্য, সংগীত সমস্ত বিষয়ের গবেষণার মূলেই যেমন intellectual imagination, দেশের সমৃদ্ধি বা ব্যাক্তিজীবনের সমৃদ্ধির মূলে তেমন practical imagination। Practical imagination-ই জন্ম দিয়েছে ভাকরানাঙ্গল আর দামোদর বাঁধের, বিশাখাপত্তনমের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নানা সংঘাত আসে। আমাদের বহু বাসনা সেই সংঘাতে চূর্ণ হয়ে যায়। সেই অনন্ত বাসনা আমাদের অবচেতন মনের আঁধারে ডুবে যায়। সময় এবং সুযোগ পেলেই তারা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তখন আমাদের মন সেইসব বাসনাপূরণের কামনায় চঞ্চল হয়। নিরর্থক কল্পনায় হয়তো বিশেষ কোনো কাজই হয় না। কিন্তু কারো মনে হয়তো খুব লেখাপড়া করার শখ কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় তা পূর্ণ হয়নি। এই চিন্তাই তাকে বড় হবার সময় ও সুযোগ খুঁজে দেবে।

আবার সমস্ত সময় সংসারের ঝামেলায় মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে সেইসময় নিভৃত অলস কল্পনা আমাদের শ্রান্তি দূর করতে সাহায্য করে। ছোটছোট ছেলেমেয়েরা বড়দের থেকে অনেক বেশী কল্পনা করে। তখন তাদের মন থাকে কল্পনাপ্রবণ। শুধুমাত্র মা বাবা আর পারিপার্শ্বিককে ঘিরে তারা প্রথমে কল্পনার জাল বুনতে থাকে, যতই তাদের বয়স বাড়তে থাকে ততই তাদের চোখ খোলে তাদের কল্পনাতেও তখন পরিবর্তন আসে। তাই শিশুদের চরিত্রকে এমনভাবে তৈরী করতে হবে যে তারা সুস্থ কল্পনা নিয়ে যেন জীবনের পথে এগিয়ে যেতে পারে। তবে একথা সত্যি যে অবাস্তব ভীরু কল্পনাকে রুখতে না পারলে ভবিষ্যত ভালো হয় না। তবে ছোটবেলা থেকে যাতে শিশুরা ভালো কাজ করবার প্রেরণা পায়, সেই ধরনের কল্পনার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত। Radio দেখে রজুরে

জানতে ইচ্ছে হয় Radio-র কলাকৌশল। তাকে যদি সে সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া যায় তাহলে সেটা তার হৃদয়গ্রাহী হবে আর সে সম্বন্ধে সে চিন্তা করে ভবিষ্যতে একজন বিশেষজ্ঞ হতে পারে। কল্পনার বিশ্লেষণে দেখতে হবে, কল্পনা যেন মিথ্যাশ্রয়ী না হয়। পড়বার সময় হয়ত পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না মনে মনে কল্পনা করল তার শরীর ভাল নেই, আজ যা হল না, কাল সে শেষ করবে। কিন্তু পরদিনও অমন অজুহাত এল। এ ধরনের কল্পনা সুস্থ চিত্তের লক্ষণ নয়। কল্পনাকে যদি বাস্তবাভিমুখী করা যায় তাহলে সুফল পাওয়া যায়।

আমাদের জীবনে বহু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যা আমরা চিন্তা করতেও ভালবাসি না। এর ফলে এই সর্বচিন্তা আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীতে এমন কতকগুলো ক্রিয়া করে যার ফলে মনের বিকার ঘটে।

স্মৃতি ও কল্পনা উভয়ক্ষেত্রেই আমরা মানসিক ছবির (Imagery) উপর নির্ভর করি। স্মৃতির বেলায় আমাদের অভিজ্ঞতার সূত্রকে টেনে মনে করতে চেষ্টা করি, কিন্তু কল্পনায় অভিজ্ঞতার সামগ্রিক রূপকে ভিত্তি করে রঙে রসে জাল বুনি।

কল্পনার বিকার ঃ

দেহ যাদের অসুস্থ, তাদের মনের মধ্যে বিকৃত কল্পনার জন্ম। দেহে মনে যারা দুর্বল, জীবনের সংগ্রামের অগণিত বাধাবিপত্তিতে তারা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। তাদের জয় করবার কল্পনা তারা আনতে পারে না। এইভাবে নিরন্তর পিছিয়ে পড়ে জীবনের ক্ষেত্রে তারা পঙ্গু হয়ে যায়। অনেকে দিবারাত্র অবাস্তব কল্পনার প্রশ্রয় দিয়ে বিকৃতচিত্ত হয়ে পড়ে। তারা তখন আর সাধারণ সুস্থ মানুষের পর্যায়ে থাকে না। বিকৃত কল্পনা বিকৃত মস্তিষ্কের জন্ম দেয়। এই ধরনের অসুস্থ লোকদের অনেকের ধারণা হয় যে, তারা আগে খুব বড়লোক ছিল। এই চিন্তা এদের মনে একটা স্থায়ী জটের সৃষ্টি করে।

এসব ছাড়া আমরা সাধারণ জীবনে দেখি অনেকের বিদ্যা কিছুই নেই, তবুও সেই সব জিনিষ নিয়ে তারা বড়াই করে। এর মূলে আর কিছু নেই, আছে শুধু মিথ্যা কল্পনা। জীবনের ক্ষেত্রে তারা সব দিক দিয়েই পিছিয়ে পড়ে আছে, কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তারা নিজেদের বিদ্বান অর্থবান বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। এইভাবেই তারা চিরকাল নিজেদের সান্ত্বনা দিয়েই চলে।

আবার অনেকে জীবনে না চাইতেই সব পায়। তাদের মনে কোনো

অতৃপ্তির সুযোগ নেই। তাদের মনে কোনো দুশ্চিন্তা বা অশান্তি কিছুই থাকে না। তখন তারা দুঃখের কল্পনা করেই আনন্দ পায়। ধনীর দুলালী নিজেকে গরীব ঘরের মেয়ে ভেবে তার দুঃখের ভাগ নিতে চায়। আবার অনেক সময় সকলের চোখে পড়বার জন্য মুখ ভার করে থাকে, সকলে যাতে তাকে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করে, সাধাসাধি করে। অনেক সময় কাজে অসাফল্যের চিন্তা আমাদের এমন করে তোলে যে আমরা ব্যর্থতার কারণ চিন্তা না করে নিজের দোষ অপরের ওপর চাপিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করি। পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার মূলে নিজের ত্রুটি না দেখে পারিপার্শ্বিকের ওপর সব ত্রুটি চাপিয়ে দিই। পরাজয়ের অগৌরবের গ্লানি ঢাকবার জন্য মিথ্যা কল্পনার আশ্রয় নিই।

ব্যক্তিগত জীবনে আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে অনেকে নিজেদের অতিরিক্ত বুদ্ধিমান মনে করে। তারা যা করে তাই ঠিক, আর অন্য সকলে যা করে তাই ভুল। এই ধরনের চিন্তা যখন অত্যধিক মাত্রায় হয় তখনই মানসিক বিকার দেখা যায়।

Illusion, Hallucination, Day dreams—এসবগুলোও মনের বিকৃতি কল্পনা।

মনের ভুল ধারণা বা সুস্থকল্পনার অভাব স্নায়ুবিকাশের কারণ। আমাদের জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যে সেই সমস্ত ঘটনার কথা চিন্তা করতেই আমাদের লজ্জা বা দুঃখ হয়। সেই সব ঘটনা আমরা চেপে থাকি। অবচেতন মনে তারা নানা জটের সৃষ্টি করেও আমাদের মানসিক স্থৈর্য নষ্ট করে। মনোবিকারগ্রস্ত রোগীদের মধ্যে অনেকসময়ই দেখা যায় যে তারা ভুল বিশ্বাস নিয়ে অমনভাবে বসে আছে যে তাদের সেই ভুল বিশ্বাস থেকে নড়ানো যায় না। ভ্রান্তচিন্তা তাদের মনে এমনভাবে নিজের বাসা বেঁধে তাদের দুর্বল করে ফেলে যে তখন তারা ভ্রান্ত চিন্তারই দাস হয়ে থাকে।

ফ্রয়েডের মতে স্বপ্নে মানুষের নিরুদ্ধ ইচ্ছা পূর্ণ হয়। বহুকাজ মানুষ লোকলজ্জার ভয়ে বা অন্য নানা কারণে প্রকাশ্যে করতে পারে না। সেইসব চেতনমানসের অন্তরালে জেগে থাকে। ঘুমের মধ্যে তারা অবচেতনের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে। যাদের মনে এই নিরুদ্ধ ইচ্ছের সংখ্যা বেশী তারাই অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে। আপাতদৃষ্টিতে ঐসব স্বপ্নের কোনো অর্থ পাওয়া যায় না বটে কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা বলেন ঐসব স্বপ্নের রহস্য উদ্ঘাটন করলে অবচেতন মনের বহু জট খোলা যায়।

এখন প্রশ্ন হল কল্পনাশক্তির উন্মেষ কিভাবে হতে পারে। শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় যে অনেকে বাস্তবের সীমা অতিক্রম করে কল্পনাকে কাজে লাগাতে পারে না। ফলে সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে তাদের আত্মপ্রকাশ রুদ্ধ হয়; কল্পনা-শক্তিকে কি বাড়ানো যায়? এটাই হল অনেকের প্রশ্ন। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে নানা রকম কল্পনা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায়। যেমন সচেষ্ট ও নিশ্চেষ্ট কল্পনা। এছাড়া কল্পনাকে নানা শ্রেণীতেও ভাগ করা হয়েছে। ইংরেজীতে এদের বলা হয়—(ক) Creative imagination (খ) Practical imagination. যে কল্পনা সৃজনাত্মক বা creative তারা সবসময় বাস্তবাভিমুখী হয় না। তাই সেখানে বাস্তব কল্পনার সঙ্গে পার্থক্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৃজনাত্মক কল্পনার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। অর্থাৎ বাস্তবের শক্তিকে ছাড়িয়ে যে কল্পনা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে তাকে সৃজনাত্মক কল্পনা বলা হয়। কল্পনাকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও ভাগ করা হয়। যেমন Receptive imagination। এক্ষেত্রে কল্পনার একটা নির্দিষ্ট উত্তেজক থাকে। যেমন কৃষিবিষয়ক প্রদর্শনী দেখে এসে কারও কৃষিবিদ হবার কল্পনা জাগে। আর যে কল্পনা বুদ্ধি বা জ্ঞানের বিকাশ ঘটায় তাকে বলা হয় intellectual imagination। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, চারুকলা প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু নানারকম পরিকল্পনা যেমন পঞ্চবার্ষিকী বা অন্যকোনো শিল্প পরিকল্পনা practical imagination-এরই ফলশ্রুতি।

আমাদের প্রতিদিনের জীবনে নানা সংঘাত আসে। সেই সংঘাতে আমাদের আমাদের বহু ইচ্ছা চূর্ণ হয়। ফলে নৈরাশ্য ও দুঃখ আমাদের ভারাক্রান্ত করে তোলে। যে কামনা বাসনা পূর্ণ হয়নি সাময়িকভাবে অবচেতন মনের আধারে তা ডুবে যেতে পারে কিন্তু সময়ে সময়ে আবার অলস কল্পনার সাহায্যে আমরা কিছুটা তৃপ্তি পেতে চেষ্টা করি। এইভাবে কখনও কখনও কল্পনা আমাদের মনে সান্ত্বনা জোগায়। সে কল্পনা বাস্তবাভিমুখী না হলেও জীবনে তার মূল্য আছে। আমি বিদ্বান হতে পারলাম না। কিন্তু বিদ্বান হবার বাসনা আমাদের মধ্যে রয়েছে। তাই যে কোনো ভাবে শতসংগ্রামের মধ্যেও সেই কল্পনাকে পাথেয় করে আমি সংকল্প গড়ে তুলি। আর সেই সংকল্প একদিন কল্পনাকে বাস্তব রূপ দেয়। ফলে দেখা যায় যে কল্পনা যদি একটি দিকে ক্রমপরিবর্তন লাভ করে তাহলে তার মূল্য আছে। আর যদি কেবল তা

আকাশকুসুম রচনায় সাহায্য করে তাহলে জীবনে আরও বিপর্যয় ঘটতে পারে। এখন দেখা যাক শিক্ষাক্ষেত্রে এই কল্পনার স্থান কোথায়?

আর শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার্থীদের নানারকম কল্পনাকে আমরা শিক্ষকহিসাবে কিভাবে বুঝতে চেষ্টা করব।

প্রথমেই আসে শিক্ষকের কথা। অনেক শিক্ষকেরই স্বপ্ন থাকে তারা ভালো শিক্ষক হবেন। কেউবা সমাজসেবী হিসাবে কেউবা শিল্পী সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন—এরূপ আশা তারা পোষণ করেন। কিন্তু কজনের জীবনে সে সাধ পূর্ণ হয়? জীবনের আবর্তে ঘুরতে ঘুরতে যখন তাঁরা দেখেন যে তাদের অন্য কোনো পথ নেই তখন একটা হতাশা তাঁদের জীবনে ফুটে ওঠে। অধিকাংশক্ষেত্রেই এই নৈরাশ্য, ব্যক্তিগত জীবনের এই পরাজয় তাদের ব্রত উদ্‌যাপনের পথে অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। কোনোমতে কয়েকঘণ্টা সময় কাটিয়ে বিদ্যালয়ের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে তাঁদের মন অস্থির হয়ে ওঠে। এই ধরনের শিক্ষকের সংখ্যা আজ কম নয়।

এঁদের কিভাবে কল্পনার মাধ্যমে নৈরাশ্য থেকে বা বিড়ম্বনার থেকে আংশিকভাবে মুক্ত করা যায় সে কথা ভাববার আজ সময় এসেছে। মনে হয় ঐ দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে তাদের হতাশা আরও বেড়েই যায় তার চেয়ে শিক্ষার্থীকে ভালবেসে শিক্ষার কাছে কিছুটা আনন্দের পাথেয় সংগ্রহ করতে পারলেই বোধহয় ব্যক্তিগত জীবনের নৈরাশ্য কিছুটা কমে আসে, মন কিছুটা সান্ত্বনা পায়। নিজের জীবনে যে সাধ পূর্ণ হয়নি, যারা ভাবীকালের অগ্রদূত, তাদের জীবনের সেই সাধ মেটাতে সাহায্য করার মধ্যে তৃপ্তি আছে বৈকি। এই তৃপ্তি হচ্ছে শিক্ষকজীবনের মূল পাথেয়। অতৃপ্ত মন নিয়ে কোনো কাজই সার্থক হয় না। নানা পরিবার ও পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসে। বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থী দরিদ্র। তাদের মনে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বা কল্পনার অবকাশ কতটুকু। কিন্তু শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষক এইসব কিশোর প্রাণকে অনুপ্রাণিত করতে পারলে তাদের মনে কিছুটা আশার সঞ্চার হয়। প্রত্যেকের মধ্যেই যে আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে কঠোর সংকল্প নিয়ে তা পূর্ণ করবার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এরকম আশার বাণী শিক্ষকের কাছ থেকে এলে শিক্ষার্থী তাদের মহতী কল্পনাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। তা না হলে ফুলের মত কিছুদিনের মধ্যেই তারা ঝরে যায়। শ্রেণীতে পড়াতে পড়াতে শিক্ষকের একথা বুঝতে দেরী হয় না যে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে। এক একজনের

এক একদিকে আগ্রহ, এক একরকম বিশেষ শক্তি ও সম্ভাবনা। তেমনি কারও মধ্যে যাকে বলে বাস্তব কল্পনার প্রাচুর্য, কারও মধ্যে বা সৃজনাত্মক কল্পনার।

স্মৃতি ও কল্পনার পার্থক্য

স্মৃতি ও কল্পনা এই দুই রকম মানসিক প্রক্রিয়াতেই ভাবমূর্তি বা কল্পের সাহায্য নিতে হয়। কারণ এই দুই প্রক্রিয়ারই ভিত্তিস্থল আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা। অবশ্য স্মৃতি কল্পনার উপাদান সংগ্রহ করে। স্মৃতিতে আমাদের অতীত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় মাত্র, কিন্তু কল্পনায় ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে না। বরং কল্পনায় নতুন সংযোজনের ফলে এক স্বতন্ত্র ভাবমূর্তি ফুটে ওঠে। কাজেই স্মৃতির মধ্যে যে প্রত্যভিজ্ঞা (recognition) নিহিত আছে কল্পনায় তা নেই। যার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই এমন জিনিসও আমরা কল্পনা করতে পারি। তাই স্মৃতি ও কল্পনার মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও মানসিক প্রক্রিয়া হিসাবে তাদের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতেই হবে। অবশ্য এই দুইটি মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা স্পষ্ট সীমারেখা টানা সহজ নয়। মনে হয় একটি অপরটির পরিপূরক। এই কারণেই তাদের শিক্ষাগত তাৎপর্য সুস্পষ্ট হলেও উভয়কে পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করা কঠিন।

মানসিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে স্মৃতি ও কল্পনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উভয় ক্ষেত্রেই ভাবমূর্তি বা কল্পের সাহায্য নিতে হয়। অতীত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে এই মানসিক প্রক্রিয়া চলতে থাকে। কল্পনার ক্ষেত্রে আমাদের স্মৃতি সহায়ক হলেও অভিজ্ঞতার প্রসার ও নূতন ভাবমূর্তির সৃষ্টি এই মানসিক প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয়। তাই কল্পনাকে একটি বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়া হিসাবে মনস্তাত্ত্বিকরা মনে করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে এর মূল্য যথেষ্ট, কারণ যে কোনো নূতন সৃষ্টি করতে হলে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। এই কল্পনাকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা হয় যেমন—

(ক) ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনা।
(খ) রচনাত্মক ও গ্রহণাত্মক কল্পনা।
(গ) বিশেষ মানসিক উদ্দেশ্যজনিত কল্পনা।
(ঘ) বৌদ্ধিক কল্পনা।
(ঙ) সৌন্দর্যবোধের কল্পনা।
(চ) বিশ্বাসজনিত কল্পনা।

ইত্যাদি। এই বিশ্বাসজনিত কল্পনাকে আবার তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যেমন (ক) ঐতিহাসিক কল্পনা. (খ) বৈজ্ঞানিক কল্পনা ও (গ) প্রতীক্ষাজনিত কল্পনা।

এই কল্পনার বিকাশ নির্ভর করে আমাদের অভিজ্ঞতার ও মানসিকতার ওপর। যতই বয়স বাড়তে থাকে ততই অলস কল্পনা কমে আসে এবং বুদ্ধি-আশ্রিত কল্পনার আধিক্য দেখা দেয়। এছাড়া পরিণতির সংগে সংগে কল্পনা নানাধারায় উন্নত ও মার্জিত হয়। সুন্দরকে উপলব্ধি করা কিছুটা কল্পনা-সাপেক্ষ। সাহিত্য, কলা, চারুশিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে সৌন্দর্যোপলব্ধি ও রসানুভূতির স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষা ও কল্পন

যে কোনো সৃজনাত্মক কাজ বা সৃষ্টি নির্ভর করে কল্পনার প্রয়োগের ওপর। তাই কিভাবে শিক্ষার্থীর মনকে উন্নতধরণের ভাবমূর্তি সৃষ্টির পথে সহায়তা করা যায়, শিক্ষককে সে বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। তাঁর কাজ হবে উদ্দীপকের সাহায্যে পরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে এই সব ভিন্নমুখী কল্পনাকে জাগানো ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ ঘটানো। অনেকে বলে থাকেন যে, কল্পনার বেশী আশ্রয় নিলে মন তার বাস্তবধর্মিতা হারিয়ে ফেলে, কল্পনাবিলাস ও দিবাস্বপ্ন মনকে অপটু ও উন্মার্গগামী করে। এর মধ্যে আংশিক সত্য থাকলেও কল্পনার মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। কিভাবে অতীত অভিজ্ঞতার উপাদানগুলি একত্রিত করে সেগুলিকে ভাবমূর্তি সৃষ্টি করতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা যায় সেটি হলো শিক্ষকের চিন্তনীয় বিষয়। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের ওপর এই কল্পনার বিকাশ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। একই বিষয়কে নানাভাবে উপস্থাপিত করা যায়। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে নীরস বিষয়ও সরস হয়ে ওঠে। তাই কল্পনার রসে সঞ্জীবিত করে শিক্ষক যদি বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করে তুলতে পারেন তাহলে তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সার্থক কল্পনার প্রবণতাকে বাড়িয়ে দিতে পারে। অবশ্য এই জন্য চাই শিক্ষকের নিজের কল্পনার ঐশ্বর্য, চাই উপস্থাপনের নৈপুণ্য।

ইতিহাস, সাহিত্য ও বিশেষতঃ কবিতা পড়াবার সময় শিক্ষার্থীদের কল্পনার বিস্তার সাধন করা সহজ হয়। যে মৌলিক দৃষ্টি ও সৃজনশীল মন শিক্ষাকে উপভোগ্য করে তোলে তাকে জাগাতে হলে চাই শিক্ষকের অনুভূতিপ্রবণ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি। অবশ্য এই বিষয়ে প্রশিক্ষণের অবকাশ আছে।

কল্পনার উন্মেষ ও নিয়ন্ত্রণ দুই-ই নির্ভর করে সুসংহত ও সুসামঞ্জস মানসিক প্রক্রিয়ার ওপর। তাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই দুটি গুণের সঞ্চার করতে হলে তাদের মন যাতে সজাগ, সপ্রতিভ ও একাগ্র হতে পারে তার জন্য অনুরূপ পরিবেশ ও প্রস্তুতির সার্থকতা অছে। পর্যবেক্ষণের শক্তিকে ব্যাপক ও সমৃদ্ধ করলে অনেক সুফল পাওয়া যায়। একই পরিবেশ ভিন্ন মনে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। একই সূর্যাস্ত ভিন্ন মনে বৈচিত্র্যময় অনুভূতি সঞ্চার করে। কবি ও শিল্পীর দৃষ্টিতে সে স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে দেখা দেয়। এর থেকে বোঝা যায় যে প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে তাকে উন্মেষিত করতে গেলে সাধনা ও অনুশীলনের প্রয়োজন। আর সেই অনুশীলনের পথে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে দিতে হবে। এখানেই শিক্ষকের দায়িত্ব।

১৬। মানসিক স্বাস্থ্য ও কয়েকটি সমস্যা

যেমন দৈহিক স্বাস্থ্য মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তেমনি মানসিক সুস্থতা বা মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষার্থীর জীবনে একান্ত অপরিহার্য। সচেতন অনুভূতিকে নিয়েই আমাদের সম্পূর্ণ মনোজগৎ গ'ড়ে ওঠে না, অবচেতন মনের প্রভাব আমাদের মানসলোকে বিশেষ প্রবল। রুদ্ধ কামনা ও অনুভূতি চেতন-মানসে মুক্তি না পেলে মানসিক বিকার দেখা যেতে পারে। তাই বিস্মৃতির অন্ধকারে অনেক সময় আত্মগোপন ক'রে থাকে আমাদের মনের অনেক কিছু আকাঙ্ক্ষা ও কামনা। মনের গহনে তারা ডাক দিতে থাকে, শাসন ও অনুশাসনের বেড়াজাল ভেদ করবার সংকল্প নিয়ে। শেষে এইরকম বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা যখন প্রবল রূপ নেয়, তখন তাদের সুসংহত করা সম্ভব হয় না। তখনি নানা অনর্থের সৃষ্টি হয়; নানা উত্তেজনার ফলে দেখা দেয় 'হিষ্টিরিয়া' প্রভৃতি মানসিক ব্যাধি।

ফ্রয়েডের তত্ত্ব

ফ্রয়েডের মতে, যৌন আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি সবরকম মানসিক বিকারের মূল কারণ। তাই মানুষের সামাজিক বুদ্ধি যদি আদিম প্রবৃত্তির উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, তবে জটিল ও বিকারগ্রন্থির সৃষ্টি হয়। এইজট খুলতে না পারলে রোগ সারানো কঠিন হয়। সম্মোহন পদ্ধতিকে ফ্রয়েড স্বীকার করলেও, তিনি বুঝেছিলেন যে এর মধ্যে কয়েকটি ত্রুটি রয়েছে। তাই

সে পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে তিনি যে পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন, তা হ'ল রোগীর মনের সবকিছু খবর নিয়ে তাকে আরাম দেবার চেষ্টা। তাই পূর্ণ সহানুভূতি নিয়ে রোগীর মনের খবর জানবার জন্য যা তুচ্ছ বা অশ্লীল তা-ও তাকে দিয়েই প্রকাশ করাতে হয়। অনেকক্ষেত্রে পরিচিত জনের কাছেও তার খবর কিছুটা জানা যায়।

নানারূপ সমস্যা আজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। ফলে, নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি। কিন্তু এদের মূলে প্রধানতঃ কামভাব লক্ষ্য করা যায়।

শিশু অনেক সময় আপনাকেই বেশি ভালোবাসে ও আপনার দেহকে নিয়েই নিজের কাম তৃপ্ত করবার চেষ্টা করে। নিজের প্রেমেই সে মাতোয়ারা। তাই খেলাধূলা সবকিছু তার নিজেকে নিয়েই। এই স্তরে আত্মরতির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়।

কৈশোর থেকে যৌবনের উদ্গম হবার সংগে সংগে সমলিংগ কাম দেখা দেয়। এই সময় তাই বিপরীত লিংগের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে নিজেরই লিংগের প্রতি বিশেষ সজাগ হয়।

ফ্রয়েডের মতে, শৈশব থেকেই মানুষের কাম জাগতে থাকে। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ব্যাঘাত ঘটলেই যত সমস্যার সূচনা। আজ যেসব বিকার দেখা দিচ্ছে, তার মূল কারণ হ'ল শিক্ষার্থীর প্রাণশক্তিকে বা সহজাত প্রবৃত্তিকে বাঞ্ছনীয় নির্দিষ্ট মানসিক পথে প্রবাহিত করবার অক্ষমতা। ফলে, প্রকৃত শিক্ষার অভাবে তাদের মধ্যে নানারূপ বিকৃতি দেখা দেয়। কেবল এইসব মানসিক বিকারই নয়, বুদ্ধিহীনতা বা বৈক্লব্য আজ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবল সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এর মূলে আছে মানসিক দুর্বলতা ও চিত্তবিক্ষোভ।

অনেক সময় আবেগ, উদ্দাম ও উচ্ছ্বাস শিক্ষার্থীর মনকে বিকৃত ক'রে তোলে। কোনো অংগবিকার, যেমন তোতলামি, বাঁ হাতে কাজ করবার প্রবণতা প্রভৃতি অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা দেয়। অচেতন মনের রুদ্ধ আবেগ মুক্তির আস্বাদ পায়। তখন সে রূঢ় বাস্তবের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে কল্পনার আশ্রয় নেয়। এরই ফলে সাহিত্য, সংগীত ও চারুকলার জন্ম। এই বাস্তব থেকে পালিয়ে অবচেতন মন আত্মরক্ষার জন্যে নানা উপায় উদ্ভাবনের প্রয়াসী। কখনো নিজের কাজটির সমর্থনে যুক্তি খুঁজে বেড়ায় ও নানারূপ কৌশল অবলম্বন করে। ইংরাজীতে একে বলা হয় rationalisation। আবার কখনো নিজের

দোষ পরের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। ইংরাজীতে একে ব'লে, projection।

শিশুর সমস্যার সমাধান খুঁজতে হলে শিক্ষকের প্রধান কাজ হবে তার অন্তর্দ্বন্দ্বের সংবাদ নেওয়া, তাকে সহানুভূতি ও ভালোবাসা দিয়ে জয় ক'রে নিয়ে তার মনের খবর জেনে সমস্যা অনুযায়ী সমাধানের চেষ্টা করা, তার রুদ্ধ কামনার যথাসম্ভব মুক্তি দেওয়া ও সুশিক্ষার সাহায্যে তার স্বাভাবিক মনকে ফিরিয়ে আনা।

পিছিয়ে-পড়া শিশু

অনেক অভিভাবক ও শিক্ষকের কাছেই পিছিয়ে-পড়া শিশু এক বিরাট সমস্যা। কেবল লেখাপড়াতেই নয়, জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেও অনেককে পিছিয়ে পড়তে দেখা যায়। কেউ বা সমাজে, কেউ বা বুদ্ধিবৃত্তিতে, কেউ বা কোনো বিষয়ে পিছিয়ে পড়ে।

এই পিছিয়ে পড়া নানা রকমের হতে পারে, আর এর কারণও একটি নয়। বার্টের মতে, এটি একটি জটিল অবস্থার প্রকাশ, আর তার কারণও বিভিন্ন।

ব্যক্তিগত পার্থক্য শৈশব থেকেই লক্ষ্য করা যায়। কেউ অধ্যবসায়ী, কেউ স্থৈর্যহীন, কেউ সাহসী, কেউ ভীরু, কেউ উৎসাহী, কেউ বা উদাসীন। শিশুদের মধ্যে এই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেলেও মোটামুটি সকলেই পরিবেশ অনুযায়ী খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করে। এই পিছিয়ে পড়া শিশু সংখ্যানুপাতে কিছু কম হলেও এদের নিয়ে সমস্যা প্রবল।

সাধারণতঃ যেসব ছেলেমেয়ে লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়েছে, তাদের মধ্যে নিচের কয়েকটি লক্ষণ দেখা যায়—

(ক) মনোনিবেশের দৈন্য ;

(খ) কোনো বিশেষ অবস্থায় ঠিকমতো সাড়া দিতে বিলম্ব ,

(গ) কোনো কিছু বিশ্লেষণের সীমিত শক্তি ;

(ঘ) বিশেষ থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে পেঁছোবার অক্ষমতা ;

(ঙ) ভাব ও ভাষার মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলবার ক্ষমতার অভাব ;

(চ) নতুন পরিবেশে পরিচিতকে হারিয়ে ফেলবার প্রকৃতি ;

(ছ) কোনো কিছু শিখতে অসম্ভব দেরি করা ও তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া।

শিশুর পর পর কয়েকটি পরীক্ষার ফল দেখলে বোঝা যায়, শিশু কোন

বিষয়ে পিছিয়ে আছে। যদি দেখা যায় যে, কোনো শিশু সব বিষয়েই পিছিয়ে পড়েছে তাহলে তার বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু এছাড়াও বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। পিছিয়ে-পড়া ছেলেমেয়েকে সাহায্য করতে হলে কি কারণে সে পিছিয়ে পড়েছে তার কারণ বিশ্লেষণের প্রয়োজন। নানাকারণে এই সমস্যার উদ্ভব হতে পারে ;

(১) বুদ্ধিহীনতা,

(২) বিষয়ানুরাগের অভাব,

(৩) কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্বের উপাদানের অভাব—যথা, অধ্যবসায়হীনতা, আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ;

(৪) বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি ;

(৫) শারীরিক অসুস্থতা ও বৈকল্য।

কোনো সমাধান খুঁজবার আগে মূল কারণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে ও যথাসম্ভব তার প্রতিকার করতে হবে। যদি দেখা যায় যে, কোনো জন্মগত বুদ্ধিহীনতা বা মানসিক ও দৈহিক বৈকল্য এর জন্যে দায়ী, তবে এর সমাধান সাধারণ বিদ্যালয়ে সাধারণভাবে সম্ভবপর নয়। সুখের বিষয়, পিছিয়ে-পড়া ছেলেমেয়ের মধ্যে এদের সংখ্যা খুবই কম।

পিছিয়ে-পড়ার সংখ্যা ক্রমশই যে বেড়ে চলেছে, এর জন্যে পিতামাতা-অভিভাবকও কম দায়ী নন। অনেক সময় তাঁরা, প্রথম ভর্তির সময়ে, তাঁদের সন্তানদের যোগ্যতা বিবেচনা না করেই উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি করবার জন্যে উপরোধ ও অনুরোধ করেন। ফলে, ক্রমশঃ ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে ও শিশু পিছিয়ে পড়ে। তাই অভিভাবকদের কর্তব্য শিশুর যোগ্যতা বুঝে তাকে উপযুক্ত শ্রেণীতে ভর্তি করা। বাৎসরিক পরীক্ষান্তে অনেক অযোগ্য শিশুকে অভিভাবকদের অনুরোধে উঁচু শ্রেণীতে উঠিয়ে দিতে হয় ; এতে এই সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে।

আজ বিদ্যালয়ে এই সমস্যা যে প্রবল হয়ে উঠেছে তার অন্যতম কারণ প্রতিকূল পরিবেশ। চারদিকে প্রলোভন চিত্তবিক্ষেপের কারণ হয়ে উঠে। ফলে, শিক্ষার্থীর পাঠানুরাগ ক্রমশঃই কমে আসে। সমাজে উজ্জ্বল আদর্শের অভাবও এই বিক্ষেপের অন্যতম কারণ।

কিভাবে এর সমাধান হতে পারে? অভিভাবক বা পিতামাতার কর্তব্য—বাড়িতে শিশু যাতে আদর-যত্ন পায়, তার ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ হয়, সেদিকে

তাঁদের লক্ষ্য রাখতে হবে, শিশুর আবেগ-উচ্ছ্বাস, কৌতুক-কৌতূহলকে মর্যাদা না দিলে অনেক সময় তার মানসিক বৈকল্য দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শিশুকে যদি আত্মপ্রকাশের পথে বাধা দেওয়া হয় ও তার কৌতুহলী মনকে দমিয়ে দেওয়া হয়, তবে ভাবীজীবনে তার আত্মপ্রত্যয়ের অভাব বা অন্য কোনো বৈকল্য দেখা দিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, অভিভাবকদের আর একটি কাজ হবে শিশুর চাওয়াপাওয়া ও আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখা। শিশু কোন্ কাজ করতে ভালো-বাসে, কোন্‌দিকে তার স্বাভাবিক প্রবণতা, কোনো কাজে সে লেগে থাকতে পারে কিনা—এসব দিকে লক্ষ্য রেখে সেই অনুযায়ী উপদেশ নির্দেশ দেওয়া দরকার। শিশুর সামনে সবসময়ে একটি উজ্জ্বল আদর্শ তুলে ধরতে হবে এবং তার যেদিকে প্রবণতা সেদিকে তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে।

তৃতীয়তঃ, শিশুকে ছোট বলে অসম্মান করলে চলবে না। তার ব্যক্তিত্বের যোগ্য সম্মান দিতে হবে। তাই প্রত্যেক অভিভাবকের কাজ হ'ল তাকে কাজে উৎসাহ দেওয়া ও নিজে তার সঙ্গে কাজে ও খেলায় যোগ দেওয়া। শিশু কিশোরকে কেন্দ্র করে যেসব সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে তার মূল কারণ হ'ল তাদের প্রতি অভিভাবকদের উপেক্ষা।

শিশু-কিশোরের সবচেয়ে বড় কাম্য হ'ল পিতামাতা ও অভিভাবকদের সঙ্গ ও সান্নিধ্য। সে অভাব যে-কোনো ভাবেই পূরণ করা দরকার। যদি অভিভাবক ও সন্তানদের মধ্যে সম্পর্ক মধুর হয় অর্থাৎ যদি পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে একটি বোঝাপড়া থাকে তবে শিশুর ব্যক্তিত্ব কখনো খর্ব হতে পারে না। বাড়িতে অনুকূল পরিবেশে শিশু প্রসন্ন মনে পড়াশুনা করতে পারলে তার পাঠের প্রতি অনুরাগ বেড়ে উঠবে, পাঠের বিষয়বস্তুকে গল্প, খেলা ও শিশুর রুচি অনুযায়ী উপকরণের সাহায্যে সরস ক'রে তোলবার চেষ্টা করা তাই অভিভাবক ও শিক্ষক উভয়েরই কর্ত্তব্য।

১৭। সমস্যা-সমাধানে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কর্তব্য।

(ক) শিশুকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী ভর্তি করা ও শ্রেণীতে ওঠবার সময় যোগ্যতার দিকে দৃষ্টি রাখা অন্যতম কর্তব্য।

(খ) যারা তা সত্ত্বেও পিছিয়ে পড়েছে তাদের নানাভাবে পরীক্ষা করা ও কারণ নির্ধারণ করা উচিত। অবশ্য এর জন্যে অভীক্ষার প্রয়োজন।

(গ) যে যে বিষয়ে শিক্ষার্থী পিছিয়ে আছে সে বিষয়ে শিক্ষকের বিশেষ যত্ন নেওয়া এবং বিষয়ভেদে শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে ভাগ ক'রে প্রত্যেকের রুচি ও শক্তি অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া।

এইসব দলে বিশেষজ্ঞ শিক্ষককে প্রচুর সময় নিয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে হবে। এইসব শ্রেণীতে দলগত চেষ্টার মূল্য দিতে হবে ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শ্রেণীর পঠনকেও বৈচিত্র্য-পূর্ণ ও আনন্দময় ক'রে তুলতে হবে।

শিক্ষকের সঙ্গে অভিভাবকদের যোগাযোগ রাখার বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর গতিবিধি সুবিধা-অসুবিধা ও উন্নতির সম্পর্কে পাক্ষিক আলোচনা এই সমস্যা সমাধানের পথে সহায়তা করে।

এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অভীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি ও ব্যক্তিত্বের সঠিক খবর পেতে হলে অভীক্ষার প্রয়োজন।

তাছাড়া কোন শিক্ষার্থী কোন বিষয়ের কোন্ অংশে দুর্বল তা জানতে হলেও এই উদ্দেশ্যে প্রণীত অভীক্ষার (Diagnostic Test) প্রয়োজন। যেমন, কোনো শিক্ষার্থী যদি ইংরাজীতে দুর্বল হয়, তবে তার দুর্বলতা কি কি কারণে হতে পারে তা অভীক্ষার সাহায্যে নিরূপণ করা যায়। দেখা যায় যে, কারো হয়ত বর্ণাশুদ্ধি বেশি হয় বলেই ইংরাজীতে দুর্বলতা, কারো বা বাক্যবিন্যাসে অক্ষমতার জন্যে বিষয়-বস্তুর জ্ঞান কাজে লাগে না।

শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় থেকে পলায়ন

গৃহে, বিদ্যালয়ে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যখন শিক্ষার্থী তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের উপযোগী পরিবেশ না পায় তখনই তার চিত্তবিকৃতি দেখা দেয়। ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়ে সে হয়ে ওঠে অসামাজিক বা অস্বাভাবিক। এই চিত্তবিকৃতি বা অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিই শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয় থেকে পলায়নের প্রেরণা জোগায়।

বিদ্যালয় থেকে পলায়নের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নিম্নলিখিত কারণগুলিই প্রধানতঃ এইরূপ প্রবৃত্তির জন্য দায়ী ঃ

(১) পরিবেশ—পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি বিদ্যালয়, গৃহ ও আঞ্চলিক

প্রভাব। যখন এই পরিবেশ অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে তখন কতকগুলি নীতি-বিরুদ্ধ অভ্যাস ক্রমশঃ শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ করে।

(২) মানসিক সংঘাত—বিভিন্নমুখী বাসনার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি বাসনা প্রাধান্যলাভ করে এবং তা চরিতার্থ না হওয়ায় শিক্ষার্থীর মন ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে।

(৩) অসংহত ব্যক্তিত্ব—শিক্ষার্থী তার নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ না পেয়ে ক্রমশঃই মনের সন্তুষ্টি ও স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে। এ থেকেই নানারকম দুর্মতি তার মনে বাসা বাঁধে এবং সেগুলির বহিঃপ্রকাশের সুযোগ দিতে সচেষ্ট হয়।

(৪) বয়ঃসন্ধিজনিত আকাশ-কুসুম কল্পনা—বয়ঃসন্ধিক্ষণ শিক্ষার্থীর জীবনের এক ভয়ংকর সময়। এই সময়ে তার মনে নানা অবান্তর ও নিষেধাত্মক চিন্তার উদ্রেক হয়ে থাকে। সে নিজেকে ঠিকভাবে কোথাও খাপ খাওয়াতে পারে না এবং অনেক সময় খেয়ালবশে বা অন্য কোনো কারণে অন্যায় কাজ ক'রে থাকে।

(৫) নিজের সম্বন্ধে হীন ধারণা—শিক্ষার্থী অনেক সময় নিজেকে অপরের সঙ্গে তুলনায় হীন মনে করে। এই কারণে বিদ্যালয় থেকে পলায়ন এবং অপরাপর হীন প্রবৃত্তি তার মনে জাগে।

(৬) বাড়ী বা বিদ্যালয়ে প্রদত্ত কাজে ভীতি—কারণে-অকারণে শিক্ষার্থীর মনে যদি ভীতির সঞ্চার হয় তাহলে তার মনে এরূপ দুরভিসন্ধি জাগতে পারে।

(৭) বিদ্যালয়ে উপযুক্ত আকর্ষণের অভাব—বিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের যদি প্রবল আকর্ষণ না থাকে তাহলে স্বভাবতঃই তার মনে হবে কিভাবে বা কখন সে বিদ্যালয় ত্যাগ করবে।

(৮) বাইরের আকর্ষণ—সিনেমা, খেলাধুলো ইত্যাদি বাইরের অধিকতর প্রবল আকর্ষণও অনেক সময় শিক্ষার্থীকে এরূপ কার্যে প্ররোচিত করে।

(৯) সময়-সূচীর ত্রুটী—একঘেয়ে আনন্দহীন সময়-সূচীও শিক্ষার্থীকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করে, যার ফলে বিদ্যালয়-জীবনের সমস্ত কিছুই তার কাছে বিসদৃশ ও প্রাণহীন মনে হয়।

সমস্যার সমাধানকল্পে নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে ঃ

১। বিদ্যালয় পরিবেশের উন্নতি সাধন করতে হবে।

(ক) বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে হবে ;

(খ) শিক্ষার্থীর প্রতি আন্তরিক স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে এবং তাকে তার জীবনপথে উপযুক্ত উৎসাহ ও প্রেরণা দিতে হবে ;

(গ) বিদ্যালয়ে সমগোষ্ঠী গঠন ক'রে বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে আনন্দ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ দান করতে হবে।

২। শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলনের সাহায্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা শিক্ষার্থীর উন্নতি বিধানের প্রয়াস বাঞ্ছনীয়।

৩। বিদ্যালয়-জীবনেই নীতিশিক্ষার বাস্তব রূপায়ণ হওয়া সম্ভব। প্রার্থনাসভা, মনীষীদের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়।

৪। সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করতে হবে। সমাজের গঠনপ্রণালী শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়েই কাজের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে হবে।

৫। শিক্ষার্থীর জীবনে আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

"মিথ্যাকথা বলা"

চিত্তবিকৃতির আর একটি বহিঃপ্রকাশ মিথ্যা কথা বলা। জেনে বা না জেনে সত্যকে এড়িয়ে চলা বা ঢেকে রাখার নাম মিথ্যা কথা বলা। সাধারণতঃ দুই প্রকারের মিথ্যা কথা বলা দেখা যায়—

(ক) সাময়িক ভাবে মিথ্যা কথা বলা, (খ) অভ্যাসবশে মিথ্যা কথা বলা।

সাময়িকভাবে মিথ্যা কথা বলা চেষ্টা করলে শোধরানো যায়, কিন্তু যখন কারণে বা অকারণে মিথ্যা কথা বলা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় তখন শিক্ষকদের হাতে প্রতিকারের ব্যবস্থা বিশেষ কিছু থাকে না।

শিক্ষার্থীর মিথ্যা কথা বলার বহুবিধ কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলি নিম্নরূপ :—

(১) পারিবারিক সমস্যা শিক্ষার্থীর জীবনে জড়িত হয়ে পড়ে। বিকৃত পরিবেশ থেকে কোনোরূপ সুশিক্ষাই সে লাভ করতে পারে না। ফলে, তার চিন্তাধারা উল্টো পথেই ধাবিত হয়।

(২) অনেকক্ষেত্রে বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ মনঃপূত হয় না বলে শিক্ষার্থীর মনে ধিক্কার আসে এবং সে বিকৃত রুচির আশ্রয় নেয়।

(৩) মনের তীব্র বাসনা চরিতার্থ করতে না পেরেও শিক্ষার্থীর মনে অস্বাভাবিকতা আসে এবং এই থেকেই নানারূপ কদর্য অভ্যাসের সৃষ্টি হয়।

(৪) অনেক সময় ভালোমন্দ বিচারশক্তির অভাবেও শিক্ষার্থী মিথ্যা কথা বলে।

(৫) কোনো কোনো শিক্ষার্থী কৌতুক সৃষ্টি ক'রে আনন্দ বা বাহবা পাবার প্রয়াস পায় ও এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিথ্যা কথার আশ্রয় নেয়।

(৬) নিজের দুর্বলতা অপরের নিকট লুকিয়ে রাখতে গিয়েও শিক্ষার্থী মিথ্যা কথা বলে।

(৭) লজ্জা, ভীতি প্রভৃতি শিক্ষার্থীকে মিথ্যাভাষণে প্ররোচনা দেয়।

এর প্রতিকারের জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

১। শিক্ষক ও অভিভাবকের সহানুভূতিমূলক ব্যবহার তাকে অনেকটা সৎপথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে। শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলনের সাহায্যে শিক্ষার্থীর প্রতি উপযুক্ত যত্ন নেবার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

২। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও কাজে শিক্ষার্থীকে অংশ গ্রহণ করতে সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষার্থী যেন বুঝতে পারে যে সেও একজন দায়িত্বশীল, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তাছাড়া শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন কার্যে ব্যাপৃত রাখলে তার কার্যধারা ও চিন্তাধারারও পরিবর্তন সম্ভবপর।

বিদ্যালয়ে বিশৃংখল আচরণ

শৃংখলাবোধ বলতে আমরা দুই প্রকারের শৃংখলা বুঝি—(১) বাহ্যিক (২) আত্মিক (স্বতঃস্ফূর্ত)। বর্তমানে আত্মিক শৃংখলাবোধের উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়ে থাকে। কারণ বাহ্যিক শৃংখলা শিক্ষার্থীর উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়, এবং এর ফলে শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথে অন্তরায় ঘটে। বাধা ও ব্যর্থতা ক্রমশ তার মনে এনে দেয় একগুঁয়েমি এবং এ-থেকেই সে হয়ে ওঠে বিশৃংখল।

শৃংখলার অভাব ঘটে নানাকারণে—

(১) সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব—কদর্য পরিবেশে শিক্ষার্থীর রুচির অবনতি ঘটতে বেশি সময় লাগে না। দিনের পর দিন সে একে একে স্বাভাবিকতা থেকে দূরে চলে যায় এবং কদর্য আকাঙ্ক্ষায় তার মন ভরে যায়।

(২) বিশ্ব পরিস্থিতির অবনতি—পরিবর্তনশীল জগতের জটিলতা ও সমস্যা মানবজাতিকে গ্রাস করতে চলেছে। এইসব জটিলতা ও সমস্যার ঘূর্ণাবর্তে শিক্ষার্থীর অবনতি ঘটে।

(৩) গৃহ—পারিবারিক পরিবেশ শিক্ষার্থীর মনের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করে। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমান পরিবেশ বহুক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূলে নয়।

(৪) অস্বাভাবিক বা অপ্রীতিকর বিদ্যালয়-পরিবেশ শিক্ষার্থীর বিশৃঙ্খল স্বভাবের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। তার চোখে বিদ্যালয় যদি অসুন্দর ও অপ্রীতিকর হয় তবে বিদ্যালয়ের প্রতি তার স্বাভাবিক অশ্রদ্ধা দেখা দেয় এবং সে বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে।

(৫) সামাজিক আদর্শ থেকে বিচ্যুতি আংশিকভাবে এর জন্য দায়ী। সমাজে ক্রমশঃ ধর্মানুষ্ঠান ক্ষীয়মাণ হওয়ায় নৈতিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর কাছে প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসছে।

(৬) বিশৃঙ্খল পরিবারে থেকে শিক্ষার্থী তিলে তিলে বিশৃঙ্খল হ'য়ে পড়ে এবং বিদ্যালয় জীবনেও তার প্রকাশ ঘটে।

(৭) বর্তমানের গুরুভার পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তার জন্যে তাদের মনে নৈরাশ্য ও বেপরোয়া ভাব আসে।

(৮) শিক্ষার্থী-সংখ্যার আধিক্যবশতঃ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনা। এই কারণে অবহেলিত শিক্ষার্থী অনেক সময় বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে।

(৯) বর্তমান পরীক্ষাব্যবস্থাকে আংশিকভাবে এর জন্য দায়ী করা যায়। পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার দিকেই শিক্ষার্থীর লক্ষ্য থাকে, শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের দিকে তার নজর বেশি থাকে না।

(১০) শিক্ষাপদ্ধতি যদি ত্রুটিপূর্ণ থাকে তা হ'লে তখন শিশু পাঠে না পায় আনন্দ, না পায় মনের খোরাক। তা থেকেও সে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে।

(১১) শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে রাষ্ট্রের অসাফল্যকে এর জন্য কিছুটা দায়ী করা যায়। শিক্ষার্থী জানে শিক্ষালাভ করেও তাকে হয়তো বেকার হয়ে থাকতে হবে। ফলে সে পাঠে আগ্রহ দেখায় না বা বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে।

বিশৃঙ্খলা দূর করতে হলে নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে :—

(১) গৃহ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতিবিধান করতে হবে। সুস্থ পরিবেশে শিক্ষার্থী দেহে ও মনে স্বভাবতই সুস্থ হয়ে ওঠে এবং বদভ্যাস বর্জন করে।

(২) বিদ্যালয়-জীবনকে অধিকতর আকর্ষণীয় ও প্রাণময় করে তুলতে হবে। আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর গতিপথ সরল ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে হবে।

এইসব ব্যবস্থা অবলম্বন করলে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়কে সহজে গ্রহণ করতে পারবে এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত কার্যসূচীর মধ্যে নিজেকে সুষ্ঠুভাবে মানিয়ে নিতে পারবে :

বৃটেনের শিক্ষা-সংস্থার অধীনস্থ ক্লিনিকে মনস্তাত্ত্বিক হিসেবে কাজ করার সময়ে যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্তমান গ্রন্থের লেখক আহরণ করেছেন তা থেকে এমনি ক্লিনিকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা তাঁর সুস্পষ্ট হয়েছে। কিভাবে এই সব ক্লিনিক শিক্ষার্থীদের মানসিক ব্যাধির আরোগ্য সাধন করে, অন্যত্র তা আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

অনেক শিক্ষার্থী দেখা যায়, যাদের আচরণ বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দেয়। যেন কোনোকিছু নিয়মশৃঙ্খলা মানা তাদের নিষেধ। তাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পিছনে কোথায় যেন একটা অসংগতি থাকে। ইংরেজীতে একে বলা হয় Non-conforming attitude অর্থাৎ কোনোকিছুকে মেনে নেওয়া এদের স্বভাববিরুদ্ধ। এই ধরনের শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। অর্থাৎ এদের সকলের জন্যেই শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার আয়োজন। কি করে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আনা যায়, কিভাবে তাদের সমাজবিরোধী মনোভাবের অবসান ঘটানো যায় তা নিয়ে শিক্ষককে চিন্তা করতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে হবে।

আর একপ্রকারে আচরণের বৈষম্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তা হল ধ্বংসাত্মক কাজের দিকে তাদের আগ্রহ। সবকিছু ভাঙার মধ্যেই তারা আনন্দ পায়। শিক্ষকের পক্ষে এই ধরনের সমস্যার সমাধান করা সহজ নয়। তাই তাদের বিরূপ আচরণের কারণ বুঝতে চেষ্টা করা ছাড়া তার পক্ষে আর কিছু করা কঠিন। বিশেষজ্ঞ ছাড়া এই ধরনের সমস্যার বা মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসা করা অসম্ভব। অবশ্য যাদের মধ্যে সমস্যা খুব জটিল নয় শিক্ষক তাদের বুঝাতে চেষ্টা করে, স্নেহ ভালবাসা দিয়ে তাদের আচরণের কিছুটা পরিবর্তন আনতে পারেন।

শ্রেণীর মধ্যে অল্পবিস্তর আচরণগত সমস্যা শিক্ষকের দৃষ্টিপথে আসে। এমন অনেক শিক্ষার্থী আছে যাদের আচরণ আবেগধর্মী। তার পেছনে

কোনো যুক্তি নেই। এই সব শিক্ষার্থীদের মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

(ক) সহজেই যারা বিরক্ত হয়,

খ) যারা অনর্থক আশংকার দোলায় দুলতে থাকে,

(গ) ক্রোধ যাদের সহজে অভিভূত করে,

(ঘ) যারা একগুঁয়ে ও যুক্তিতর্কের ধার ধারে না,

(ঙ) যারা বৈক্লব্যগ্রস্ত।

এছাড়া এমন অনেক শিক্ষার্থী থাকে যারা কোনো শৃংখলা মানতে চায় না। উচ্ছৃংখল জীবন তাদের ক্রমশঃ দিশাহারা করে।

এইসব সমস্যার সমাধানে কিভাবে শিক্ষক সাহায্য করতে পারেন? বিদ্যালয় জীবনে তা কতখানি সম্ভব? একথা বলাই বাহুল্য যে শিক্ষকের সময় সীমিত। তার ওপর পাঠ্যসূচী ও পরীক্ষার তাগিদ। এতরকম তাগিদের মাঝখানে এসব সমস্যা মেটানো বেশ কঠিন, সন্দেহ নেই। এর জন্যে চাই শিক্ষকের অন্তর্দৃষ্টি, প্রাণশক্তি ও অফুরন্ত উৎসাহ। একমাত্র শিক্ষাকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করতে না পারলে শিক্ষার্থীদের জন্যে স্বার্থত্যাগ করা সহজ নয়। বিদ্যালয়-জীবনের গন্ডীর মধ্যে শিক্ষকের ভূমিকা আবদ্ধ না রেখে সমাজসেবার সংকল্প নিলে শিক্ষকের ভূমিকা সম্পূর্ণ হয়।

১৮। অভ্যাস ও তার শিক্ষাগত তাৎপর্য

জীবনের অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয় দুষ্ট অভ্যাসের ফলে। সদভ্যাস গড়ে তুলতে না পারলে জীবনে এগিয়ে যাওয়া কঠিন। তাই যাতে শৈশব থেকেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সদভ্যাস গড়ে ওঠে তার জন্য চেষ্টা করা উচিত। সদভ্যাস গড়ে উঠবার সংগে সংগে খারাপ অভ্যাস একে একে বিদায় নেয়। কিভাবে এই অভ্যাস গড়ে তোলা যায় এটাই চিন্তনীয়। অভ্যাসের মূলে কি কি প্রবৃত্তি ও প্রেষণা কাজ করে, অভ্যাস গঠন করা বাঞ্ছনীয় কিনা এ নিয়ে অনেক প্রশ্ন জাগতে পারে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে The best habit is to have no habit অর্থাৎ কোনোরকম অভ্যাসের দাস হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু সাময়িকভাবে কয়েকটি সদভ্যাস গড়ে তুললে তা কাজে লাগে। বারবার একই কাজ করার ফলে অভ্যাস গড়ে ওঠে। যখন একটি দক্ষতা জন্মায় তখন নিশ্চিন্ত

মনে সেই কাজ নির্ভুলভাবে করা সহজ হয়। যেমন টাইপ্ করা যার কাজ সে সহজভাবেই টাইপ করতে পারে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী তার মন অন্য কাজে নিয়োজিত করতে পারে। কারণ যে কাজে সে অভ্যস্ত তা সে অবলীলাক্রমে করে যেতে পারে। কর্মাভ্যাস ছাড়াও আরো কয়েকটি অভ্যাস আমাদের কাজের পথে সহায়তা করে যেমন সকালবেলায় ওঠা অভ্যাস, একই সময়ে খাওয়ার অভ্যাস। এইসব অভ্যাসের ফলে শরীর ও মন সুস্থ থাকে, চিত্তের ভারসাম্য থাকে। অনেক সময় দেখা যায় মন বিক্ষিপ্ত হয়েছে কিন্তু তবুও নিষ্ঠা ও সদভ্যাসের ফলে সেই মানসিক অবস্থাকে অতিক্রম করা যায়। কাজের অভ্যাস জীবনের একটা বিশেষ পাথেয়। যদি বিশেষ বিশেষ দিকে কাজের অভ্যাস গড়ে তোলা যায় তাহলে মানুষ জীবনের অনেক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারে। নৈরাশ্য, হতাশা, নিঃসঙ্গতা এই সব কিছু অতিক্রম করতে সহায়তা করে মানুষের সদভ্যাস। শুধু কর্মাভ্যাসই নয় সৎচিন্তার অভ্যাসও জীবনকে বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত রাখতে সহায়তা করে। তাই এ নিয়ে গীতায় যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার বিশেষ তাৎপর্য আছে। কর্মযোগী হতে পারলে মানুষের অনেক দুঃখের লাঘব হয়। যাই হোক্, সদভ্যাসের প্রয়োজন জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখন শিক্ষার্থীদের মধ্যে কয়েকটি অভ্যাসের কথা ধরা যাক—যেমন প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে পড়তে বসা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নিয়ে পাঠাভ্যাস করা। দেখা যায় অনেক শিক্ষার্থীর পাঠে মন বসছে না। পড়ার সময় নানারকম চিন্তা তার মনকে কোথায় নিয়ে যায়। বিষয়বস্তু তার আয়ত্তে আসে না। শিক্ষার্থীজীবনের পথে এটি বিশেষ অন্তরায় এবিষয়ে সন্দেহ নেই। কিভাবে তার মনকে পাঠের দিকে নিয়োজিত করা যায় সে বিষয়ে নির্দেশ দেবার প্রয়োজন আছে। যে কোন সদভ্যাস গঠন করতে হলে চাই মানসিক প্রস্তুতি ও সংকল্প, চাই সেই অভ্যাস গঠনের প্রয়োজন বোধ। প্রেষণা এই অভ্যাস গঠনে উৎসাহিত করে। উপদেশ দিয়ে অভ্যাস গঠন করা সহজ হয় না। অনেক সময় পরিস্থিতি বা পরিবেশের উপর অভ্যাস গঠন নির্ভর করে। পুরস্কার, উৎসাহদান ইত্যাদি শিক্ষার্থীর চেতনাকে জাগায়। সচেতন অনুশীলন সু-অভ্যাস গঠনের সহায়ক।

এক কথায় অভ্যাস বলতে আমরা সেই দক্ষতাটুকুকেই বুঝি যেটা আসে বারবার একই কাজ করার মধ্য থেকে। এই দক্ষতাটুকু যখন আসে তখন আমরা

নিশ্চিন্ত মনে সেই কাজ ভুল না করেই করি। এটা অবশ্য সুস্থ মনের কথা। মন যখন বিচলিত থাকে তখন অভ্যস্ত কাজেও ভুল হয়।

অভ্যাসের সঙ্গে আমাদের সহজাত সংস্কারের একটা সম্পর্ক আছে। যেমন ক্ষুন্নিবৃত্তি আমাদের একটা সহজাত সংস্কার। এই অভ্যাসের সঙ্গে মনের যোগও গভীর। যেমন, বাঙালীদের ভাত খাওয়ার অভ্যাস। আমাদের সাধারণতঃ যা ভাল লাগে আমরা তাই অভ্যাস করি, আর যা ভাল লাগে না তা সহজে চাই না। তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সুফলের আশায় অনেক কিছু অভ্যাস করার প্রয়োজন হয়।

আমাদের সব কাজই চলছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর নির্দেশে। কোনো উত্তেজক যখনই কোনো খবর কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীতে পাঠায় তখনই সেই জায়গা থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলী পর্যন্ত একটা আলোড়ন জাগে। বার বার একই কাজ করলে রেখা গভীর ও স্বচ্ছন্দ হয়। অভ্যাসের মূলসূত্র পুনরাবৃত্তি। বারবার একই কাজ করলে পরের বার কাজটি করার সময় আর ভাবনাচিন্তার দরকার থাকে না, কাজটি প্রায় আপনা থেকেই হয়। যে বিষয়েই অভ্যাস করতে হবে তা নিয়মিত করতে হবে। কোনো অজুহাতে তাকে বাদ দিলে চলে না। কারণ কয়েকদিন অনিয়ম করলেই সাইন্যাপ্সের বাধা প্রবল হয়ে উঠবে। আর অভ্যাসের পুনরুজ্জীবন করতে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। ফলে যাদের মধ্যে ধৈর্যের অভাব তারা আর পারবে না। ভোরে ওঠার অভ্যাস বেশ কিছুদিন কষ্ট করে ভোরে উঠে করতে হয়। একবার ভালমত অভ্যাস হলে আর কষ্ট হবে না। যদি কোনো কারণে বেশ কিছুদিন ধরে বেলা করে উঠতে হয় তারপর ভোরে ওঠা বেশ কষ্টকর হয়। এই ভাবে আমাদের সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে অভ্যাসের সহায়ক করতে হবে। এমন অনেক কাজ আছে যা আপাত মধুর না হলেও ভবিষ্যতের পক্ষে ভাল। সেইসব কাজ অভ্যাস করতেই হয়।

নতুন কোনো অভ্যাস গঠনের সময় আমাদের সংকল্পের প্রয়োজন। অভ্যাস যান্ত্রিক হলে সময়ই বেশী নষ্ট হবে, সেই অনুপাতে কাজ হবে না। যদি একাগ্রভাবে কোনো স্থির লক্ষ্য নিয়ে অভ্যাস করা যায়, তাহলে কার্যক্ষেত্রে ভাল ফললাভ করা যায়।

জীবনে সু-অভ্যাসের প্রয়োজন সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। তবে অনেকে বলেন যে অভ্যাস মানুষকে যান্ত্রিক করে তোলে। জীবনে বহু কাজে আমরা অভ্যস্ত

হতে পারি। তার ফলে সেই সব কাজের জন্য আমাদের বেশী মন দিতে হয় না। নিয়মিত ব্যায়াম করে যদি আমরা নিজেদের দেহ সুস্থ রাখতে পারি তাহলে শারীরিক সুস্থতা বজায় রেখেও গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে ব্রতী হতে পারি।

অনেকে বলেন যে অভ্যাস নতুন কিছু গ্রহণে বাধা দেয়। এটা সব সময় ঠিক খাটে না। আমাদের মনের উপরই সব কিছু নির্ভর করে। হয়তো একজন যোগাসন করে শরীর রক্ষা করছেন। তিনি হয়তো ১০ বৎসর যাবৎ একই ব্যায়াম করে আসছেন। এমন সময় তিনি যদি কোনো ফলদায়ী নতুন আসনের খবর পান তাহলে তিনি সেটা নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন। নতুনকে গ্রহণ করার ক্ষমতাটা নির্ভর করে আমাদের মনের শক্তির ওপর। সংস্কারমুক্ত সচেতন মনই সেটা সবচেয়ে ভাল পারে।

অভ্যাস আমাদের পরিশ্রম বাঁচায়। অভ্যস্ত কাজে স্নায়ুমণ্ডলীর তেমন কষ্ট হয় না। অভ্যস্ত কাজে আমাদের নিপুণতা বেশী দেখা যায়। কিন্তু নৈপুণ্যমূলক অভ্যাসটা যত্নপ্রযুক্ত হওয়া চাই। তা না হলে নৈপুণ্য আসে না। আজীবন লিখেও বহু লোকের হাতের লেখা ভাল হয় না।

কুশলতা, ক্ষিপ্রতা ও তৎপরতার মূলে আছে সচেতন অভ্যাস।

শিক্ষাক্ষেত্রে অভ্যাসের একটা বড় মূল্য আছে। অভ্যাসে একটা যান্ত্রিকতা আছে সেটা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করবার উপায় নেই। অনেকে বলেন যে অভ্যাসের দাস হয়ে জীবন কাটানো মৃত্যুর সমান। জীবনে যদি শুধু অভ্যাসই থাকে, বিস্ময় রোমাঞ্চ এসব না আসে তাহলে জীবন ব্যর্থ। স্থিতিবাদীদের মতে, নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলাই উচিত। তা না হলে সমাজ চলতে পারে না। এই দুই দলের মতের সত্যতা আছে, তবে কোনো বিষয়েই চরমপন্থী হওয়া উচিত হয়। সাধারণের পক্ষে দুই-এর সম্মিলনই ভাল। সকলেই যদি গতানুগতিক অভ্যাসের দাস হত তাহলে বড় বড় আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এসব কিছুই সম্ভব হত না, অভ্যাস নিয়মানুবর্তিতা শেখায়। সকলেই যদি গতিবাদী হয় তাহলে সমাজ সংস্কার কিছুই বাঁচে না। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলাই দেখা দেবে। তাই নিয়মনিষ্ঠার প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করতে পারি না। অভ্যাস আমাদের এমনভাবে করতে হবে যাতে তার যান্ত্রিকতাটুকু প্রচ্ছন্ন থাকে। ছোট ছেলেদের প্রথম বর্ণপরিচয়টা গতানুগতিকভাবে না করিয়ে নানা রকমের খেলবার জিনিসের মাধ্যমে যদি হয় তাহলে সেটা বেশী ভাল হয়। এতে

অভ্যাসটা ঠিকই হয়, তবে ঠিক যান্ত্রিকভাবে নয়। বারে বারে ভুল করে তাই তাড়াতাড়ি জোর করে বকুনি দিয়ে কিছু অভ্যাস করাতে গেলে সে অভ্যাসটা ঠিকমত হয় না।

অভ্যাস মানুষের প্রবণতা জাগায়। যে গান ভালবাসে নিয়মিত গানের অভ্যাস তার গানের প্রবণতা আরো বাড়িয়ে দেয়। এখনকার শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রদের রুচি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাদের রুচি যে দিকে সেই দিকে তাদের চালনা করতে হবে ও অভ্যাসের সুযোগ দিতে হবে। ছোটো-বেলায় ছবি আঁকার প্রবণতাটুকু অভ্যাসের ফলে আর জীবনে বাড়তে পারে না।

শিক্ষকের কাজ হবে ছাত্রদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল যাতে হয় তারই ব্যবস্থা করা। যাতে তারা নির্মল-চরিত্র হয়, অফুরন্ত স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, কর্মক্ষেত্রে আগুয়ান হতে পারে তার চেষ্টাই শিক্ষক করবেন। চরিত্র গঠনের জন্য শিক্ষকের সব সময় দৃষ্টি থাকবে। ছাত্রজীবনে অনেকে পড়াশুনোয় অব্যাহতি খোঁজে ও নানারকম নেশায় মেতে থাকে। এসব ক্ষেত্রে উপদেশ না দিয়ে তাদের কথা সহানুভূতির সংগে বিবেচনা করে তাদের কু-অভ্যাসের পরিবর্তন করা যায়। শিক্ষক নিজে সু-অভ্যাস পালন করে ছাত্রকে তা শেখাবেন। এ সম্পর্কে পূতচরিত্র মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের নির্দেশ উল্লেখযোগ্য। ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও চরিত্রগঠন শিক্ষকদের হাতে। তাদের নিয়মিত ব্যায়াম, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করানো সবই অভিভাবক ও শিক্ষকদের কর্তব্য।

জাতিগঠনের দায়িত্বও শিক্ষকের হাতে। তাই কঠোর নিয়মপালন করিয়ে শিক্ষার্থীদের বিচারশক্তিহীন না করে তাদের সু-অভ্যাস গঠনে সহায়তা করে জীবনের নিত্য নতুন ঘাত-প্রতিঘাতের জন্য প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয়।

অভ্যাস গঠন

শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাসের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ অভ্যাসের ওপর শিক্ষার্থীর ভাবী জীবন অনেকখানি নির্ভর করে। কিভাবে ভালো অভ্যাস গঠিত হয় সে সম্পর্কে চিন্তার অবকাশ আছে। এই অভ্যাস নানা-প্রকারের হতে পারে। পাঠের অভ্যাস. চিন্তনের অভ্যাস, কর্মের অভ্যাস এমনি আরও কত রকমের অভ্যাস যথাযথভাবে গঠিত হলে তা সুফল দেয়। শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত অভ্যাস গঠন করার দায়িত্ব মূলতঃ শিক্ষকের। এই কারণে শিক্ষকের মূল কাজ হবে নতুন শিক্ষাপরিকল্পনার

উদ্ভাবন করে অভ্যাস গঠনের সুযোগ করে দেওয়া। সাধারণ স্বাস্থ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে সামাজিক আচরণের অভ্যাস সবকিছুই শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার কাজে অভ্যাস যে সহায়তা করে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ শিক্ষার সঙ্গে অভ্যাস বিশেষভাবে জড়িত। এই অভ্যাস-গঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব কম নয়। প্রথমেই প্রশ্ন আসে যে, কি ধরনের অভ্যাস গঠনে শিক্ষক সহায়তা করবেন। যে কোনো ধরনের অভ্যাস গঠন করতে হলে শিক্ষকের প্রাথমিক কর্তব্য হবে একটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে সেদিকে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করা। কয়েকটি অভ্যাস হয়তো এই উদ্দেশ্যকে আয়ত্তে আনতে সহায়তা করবে। তাই কখনও পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে, কখনও অনুশীলনের বা প্রক্ষোভগত অভ্যাসের ফলে এই লক্ষ্যগুলির দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। মানসিক অভ্যাস গঠন করতে হলে অবশ্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফলপ্রসূ অভিজ্ঞতার সন্ধান দিতে হবে। কখনও পুরস্কার, কখনও প্রেরণা অনেক সময় সু-অভ্যাস গঠনে সহায়তা করে। আজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে অনীহা দেখা দিয়েছে তার মূল কারণ হলো প্রেরণার অভাব ও সামগ্রিক ঔদাসীন্য। অলস জীবনযাপন করা প্রায় এখন অভ্যাসেই দাঁড়িয়েছে। তাই কোনো কিছুর মূল্যবোধ শিক্ষার্থীদের মধ্যে না জাগাতে পারলে এই অভ্যাস গঠন সহজ ও সার্থক হয় না অর্থাৎ কেবল যান্ত্রিক উপায়ে অভ্যাস-গঠনের প্রচেষ্টা না করে শিক্ষার্থীর আবেগ ও অনুভূতির ক্ষেত্রে উদ্দীপনা জাগাতে পারলে শিক্ষকের অভ্যাস গঠনের কাজ অনেক সহজ হয়।

১৯। শিক্ষার সূত্র ও শিক্ষা-বিজ্ঞান

শিক্ষার সূত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে শিক্ষার্থীর মনের গতি-প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে সেগুলি প্রণীত হয়েছে। তাই এই সূত্রগুলির প্রয়োগ শ্রেণী-পাঠনের ক্ষেত্রে ও বিদ্যালয়-জীবনে কতখানি প্রতিফলিত হতে পারে তা চিন্তনীয়। যতই শিক্ষানীতি ও শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিকে কেন্দ্র করে তাদের প্রয়োগের পথ প্রসারিত হবে ততই শিক্ষাবিজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

এখন দেখা যাক শিক্ষার এই সূত্রগুলির প্রয়োগ বাস্তব ক্ষেত্রে কতখানি সম্ভবপর। অনেক সময় আমরা বিশ্বাস করি যে শিক্ষা একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কষ্ট না করলে শিক্ষা লাভ করা যায় না। কথাটার মধ্যে সত্য থাকলেও আমাদের ভুললে চলবে না যে আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা আরো সার্থক

হয়ে ওঠে। তাই একই বিষয়বস্তুকে আনন্দময় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সরস করে তোলা যায়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে মৌলিক প্রবৃত্তি ও আগ্রহ আছে তাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার আয়োজনকে সার্থক করা যায়। যেমন ইতিহাস পাঠনের ক্ষেত্রে সংলাপ ও নাটকীয় বস্তুর অবতারণা করা, আবার কখনো বা পুরনো নথিপত্রের সাহায্য নিয়ে অতীতকে বোঝার চেষ্টা করা। এমনি আরও অনেক নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করা যায়—যার ফলে শিক্ষা সরস ও আনন্দের হয়ে উঠবে। শিক্ষার্থীর কৌতূহল প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে ফেলে-আসা দিনগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরাবার এই যে আয়োজন তা ইতিহাস পাঠনকে সঞ্জীবিত করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পাঠনের সাফল্যের মূলে আছে শিক্ষায় ফলাফল সূত্রের প্রয়োগ। কারণ ইতিহাসের তথ্য ও ঘটনার মধ্যে যে সত্য লুকিয়ে আছে তাকে আবিষ্কার করা শিক্ষার্থীর কাছে আনন্দের। শিক্ষক যে কোনো বিষয়ের উপস্থাপনকে এইভাবে ফলপ্রসূ করে তুলতে পারেন তাহলে শিক্ষার পথে যে যাত্রা তা আনন্দের হয়ে উঠবে আর শিক্ষাও সার্থক হবে। এমনি আরো অনেকভাবে শিক্ষক এই ফলাফলের সূত্রকে কাজে লাগাতে পারেন। কখনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরে, কখনো বা শিক্ষার্থীকে বাস্তবের মুখোমুখি করে আবার কোথাও তাদের মধ্যে যে সৃজনশীলতা আছে তাকে জাগিয়ে শিক্ষক সমগ্র শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেন। এই প্রসঙ্গে শিক্ষায় শ্রাব্য-চাক্ষুষ সহায়তার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

যে কোনো শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে হলে অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। পুনরাবৃত্তির দ্বারা এই অনুশীলনের কাজ সহজ হয়, ক্রমশঃই কাজের জড়তা ও সংকোচ কেটে গিয়ে শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। এইজন্য শ্রেণীতে কেবলমাত্র পাঠনের আশ্রয় না নিয়ে নানাভাবে শিক্ষার্থীকে কাজের মাধ্যমে শেখাতে পারলে তাদের ভুল-ভ্রান্তি কমে আসে। একে একে নৈপুণ্য দেখা দেয়। একই বিষয়বস্তুর বারংবার আলোচনার ফলেও অনুশীলন ফলপ্রসূ হয়। প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে শ্রেণীর কাজ ও গৃহকর্মের মাধ্যমে অনুশীলন করতে প্রবৃত্ত হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষককে কার্যক্রম প্রণয়ন করতে হবে। বিশেষ করে গণিত ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অনুশীলনের বিশেষ প্রয়োজন তা না হলে অনভ্যাসের ফলে ও চর্চার অভাবে ধারণার স্পষ্টতা হারিয়ে যায় ও নানারকম ভুলভ্রান্তি দেখা যায়। নানাভাবে এই অনুশীলনের কাজে শিক্ষার্থীদের প্রবৃত্ত করা যায়। কখনো কার্যসমস্যা পদ্ধতির মাধ্যমে, কখনো বা দলগত আলোচনা ও

প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে, কখনো বা গৃহকর্মের (Home Assignment) ভিত্তিতে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করে।

শেখার পেছনে একটা মানসিক প্রস্তুতির বিশেষ প্রয়োজন আছে। আগ্রহ ও ঔৎসুক্য এবং মনের তাগিদ না থাকলে শিখতে দেরী হয়। ফলে শিক্ষার আয়োজন আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়। তাই মানসিক প্রস্তুতির পথে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে দেবার জন্যে শিক্ষকের চেষ্টা করতে হবে। এই প্রস্তুতি আনতে হলে চাই শিক্ষায় আনন্দ সঞ্চার যাতে শিক্ষার্থীরা আনন্দ ও উৎসাহ নিয়ে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখতে পারে তার জন্যে শিক্ষককে নানা সুযোগ দিতে হবে। মোটকথা, বিদ্যালয়ের পরিবেশকে যতই অনুকূল করা যাবে, যতই শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় হবে শিক্ষার প্রতি ততই শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ জন্মাবে।

তৃতীয় অধ্যায়

পাঠক্রম

১। পাঠক্রমের স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা

জ্ঞান অপরিসীম ও জীবন সীমায়িত। আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানীদের মতানুসারে পাঠক্রমের সংজ্ঞা ব্যাপক। প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠক্রম বিদ্যালয় জীবনের সমস্ত জীবনের ধারাবাহিক ও ক্রমান্বয়ী পরিচয়পঞ্জী।

মুদালিয়ার কমিশনের ভাষায়—"The whole life of the school becomes the curriculum which can touch the life of the students of all points and help in the evaluation of balanced personality."

পাঠক্রমকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছনোর পরিকল্পনা।

পাঠক্রমের প্রয়োজন ত্রিমুখী। শিক্ষার্থীর জন্যে যেমন পাঠক্রমের প্রয়োজন আছে, তেমনি সমাজের পক্ষে বা শিক্ষকের শিক্ষণকে নির্দিষ্ট ধারায় রূপ দেবার জন্যে পাঠক্রমের প্রয়োজন আছে।

শিক্ষার লক্ষ্যের প্রবর্তনের সংগে সংগে পাঠক্রমের স্বরূপেরও বিবর্তন ঘটে। তাই শিক্ষাধারার ইতিহাসের দিকে তাকালে মনে হয় যে প্রতিটি দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা এই পাঠক্রম যুগের ও দেশের প্রয়োজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এইভাবে পাঠক্রমের বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করলে মনে হয় যে বিষয়কেন্দ্রিকতার যুগ থেকে বিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক যুগে আমরা পেঁছে গেছি।

গতানুগতিক পাঠক্রমের ত্রুটী নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। যেমন, শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ, ও সামর্থ্য অনেকক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়েছে বর্তমান পাঠক্রমের মধ্যে। আবার অনাবশ্যক বিষয় ও তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত হওয়ার ফলে পাঠক্রম ত্রুটীমুক্ত হতে পারে না। তাই পাঠক্রমের পরিকল্পনা যাতে সীমিত হয়ে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রেখে বাস্তব ও সামাজিক লক্ষ্যের সংগে শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক লক্ষ্যের সামঞ্জস্যকে পাঠক্রমের মধ্যে প্রতিফলিত করার প্রয়োজন আছে।

পাঠক্রম রচনার মৌলিক নীতি

যে কোনো পাঠক্রম রচনার সুষ্ঠু পরিকল্পনার পেছনে থাকে কয়েকটি মূলনীতি।

(ক) ব্যক্তি প্রাসঙ্গিকতার নীতি—শিশুর প্রয়োজন ও আগ্রহের ওপরেই শিক্ষা নির্ভরশীল। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে ও আগ্রহেই শিক্ষাদানের আরম্ভ। তাই পাঠক্রম নির্ণয়কালে ব্যক্তি-প্রাসঙ্গিকতার নীতিকে (Individual relevance) সাধ্যমতো স্থান দিতে হবে। পাঠক্রম প্রণয়ন কালে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তা. শক্তি, রুচি. বুদ্ধি ও প্রবণতাকে কেন্দ্র করে পাঠক্রমের বৈচিত্র্য সাধন করতে হবে।

(খ) সমাজ-প্রাসঙ্গিকতার নীতি—সমাজজীবনের সঙ্গে সংহতি রেখে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করতে হলে এই নীতিকে পাঠক্রমের মধ্যে প্রতিফলিত করার সার্থকতা আছে। কিভাবে শিক্ষার্থী সমাজ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সমাজের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে তার প্রস্তুতির দায়িত্ব কিছুটা পাঠক্রমের। কেবল বর্তমান জীবনই নয়, ভবিষ্যৎ জীবনের দিকেও লক্ষ্য রেখে এই পাঠক্রম প্রণয়ন করার প্রয়োজন।

তাই প্রগতিবাদী শিক্ষাবিদ্‌গণ আদর্শ পাঠক্রম প্রণয়নে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদাও সমাজ-জীবনের প্রত্যাশাকে অস্বীকার করেন নি।

২। পাঠক্রমের প্রকারভেদ

পাঠক্রম নানাপ্রকারের হতে পারে। দেখা যায় যে পাঠক্রমের বিবর্তন নির্ভর করেছে শিক্ষার লক্ষ্যের ওপর। কখন কোন্‌ দিকে শিক্ষাবিদ্‌দের দৃষ্টি পড়েছে, কোন্‌ দিক প্রাধান্য লাভ করেছে তার ওপর ভিত্তি করে নানারকম পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে। যেমন—

(ক) বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রম।

(খ) কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম।

(গ) অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠক্রম।

(ঘ) অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রম।

এই পাঠক্রম এক এক সময় এক এক নীতিকে সামনে রেখে গড়ে উঠেছে। কখনো শিশুর চাহিদাকে ভিত্তি করে, আবার কখনো সমাজের চাহিদাকে কেন্দ্র

করে পাঠক্রম রূপ নিয়েছে। তবে বিভিন্ন ধরনের পাঠক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আদর্শ জীবনকেন্দ্রিকতা প্রত্যেকেরই লক্ষ্য হলেও তাদের মধ্যে অপূর্ণতা রয়ে গেছে, রয়ে গেছে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্যের অভাব। তাই কোনোটিই ত্রুটিমুক্ত নয়। শিক্ষার আদর্শগত লক্ষ্য যাই হোক না কেন ব্যক্তিজীবনে সংগতি আনা ও সমাজ-পরিবেশের সঙ্গে সংগতি রাখা—এই দুই এরই শিক্ষার বাস্তব লক্ষ্য হিসাবে উপযোগিতা আছে। সেখানে অর্থনৈতিক জীবনের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে, তা নাহলে ভারসাম্য হারিয়ে যাবে। কেবল আদর্শায়িত বা আদর্শকেন্দ্রিক শিক্ষার আয়োজন আজকের দিনে যথেষ্ট না তাই বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপযোগিতাকে অস্বীকার করা কঠিন। তবে শিক্ষিত যুবকের কাছ থেকে গোষ্ঠী, সমাজ ও দেশেরও যে কিছু প্রত্যাশা আছে তা অস্বীকার করা যায় না। এই প্রত্যাশার পূরণ করতে গেলে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে শৈশব থেকেই অনুরূপ মূল্যবোধ, কর্মকৌশল, দৃষ্টিভঙ্গি ও তথ্যজ্ঞানের দিকে উদ্দিষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা আছে। এইজন্য চাই সুসামঞ্জস পাঠক্রমের প্রবর্তন। এখন প্রশ্ন হল কাকে আমরা সুসমঞ্জস পাঠক্রম বলব? পাঠক্রম নির্ণয়ের মূল নীতি কি কি হবে? এবং কিভাবে এই পাঠক্রমকে সীমিত করব? দেখা যায় যে পাঠক্রম নিরূপণের সময় আমরা ভুলে যাই যে এটি শিক্ষার্থীর বিকাশের একটি মাধ্যম। কাজেই শিক্ষার্থীকে প্রাধান্য দিয়ে, তার প্রয়োজনে ও শক্তিসামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে, বিদ্যালয়ের সময়তালিকার কথা মনে রেখে, সামগ্রিক শিক্ষা-পরিবেশের পাঠক্রম নির্ণয় না করলে তার ভারসাম্য হারিয়ে যাবে। দেখা যাবে যে গন্ধমাদন পর্বতের মত শিক্ষার্থীর কাছে দুর্বহ হয়ে উঠেছে। সীমিত জীবনে সবকিছুকে বিচ্ছিন্নভাবে পরিবেশন করা সম্ভবপর নয়। তাই সংস্কৃত প্রবচনটি প্রণিধানযোগ্য—"সারং ততো গ্রাহ্যমপাস্যফল্গুঃ।

হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ॥"

অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকে সার সংগ্রহ করে তাকে সুসংহত ও সুবিন্যস্তভাবে বাস্তবাভিমুখী করে তুলতে হবে। তবেই সে পাঠক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে এবং শিক্ষার্থীর কাছে তা সহজবোধ্য হবে। এই সামঞ্জস্য-সাধন ও সংহতিকরণের কাজকে পূর্ণাঙ্গ করতে হলে চাই বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি। সেখানে থাকবে না কোনো পক্ষপাতিত্ব, কোনো বিভ্রম, কোনো অপূর্ণতা। এইখানেই শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রয়োগের সার্থকতা আছে।

যে কয়টি নীতি পাঠক্রম-রচনাকে প্রভাবিত করে তার মধ্যে আছে—

(ক) শিশুর চাহিদা-ভিত্তিক নীতি ;

(খ) সামাজিক চাহিদা-ভিত্তিক নীতি ;

(গ) সমন্বয়-ভিত্তিক নীতি ;

(ঘ) রচনাত্মক নীতি ;

(ঙ) কর্মকেন্দ্রিক নীতি ;

(চ) অগ্রমুখীতা ;

(ছ) পরিবর্তনশীলতার নীতি।

মাধ্যমিক কমিশনের রিপোর্টে পাঠক্রম সম্পর্কে যে প্রস্তাবিত নীতির উল্লেখ আছে তাতে মনে হয় যে, পাঠক্রমকে সংকীর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে চলবে না, তাকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রমের যে ধারণা বদ্ধমূল তাকে ত্যাগ করতে হবে। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন কর্ম-সূচীর সমষ্টিকে রূপায়িত করলে তা সার্থক পাঠক্রম হিসাবে পরিগণিত হতে পারে ; অবশ্য তার মধ্যে থাকবে বিভিন্ন বিষয়ের সংযোজন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সামগ্রিক উপস্থাপন। পাঠক্রমের ভিতর কোনো কৃত্রিম বিভাগ না রেখে বিষয়-বস্তুগুলির সার্থক সমন্বয় করলে তা জীবনকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষা-বিজ্ঞানের লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর গোষ্ঠীজীবন সমাজের প্রয়োজনকে কেন্দ্রে রেখে তার সুসংহত বিন্যাস সাধন করা। তা নাহলে শিক্ষার্থীর জন্য পাঠক্রম না হয়ে, পাঠক্রমের জন্য যেন শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি আনতেই হবে—এইরূপ ধারণা জন্মাবে। আজ ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন পাঠক্রমের সংস্কার সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তাতে মনে হয় যে পরিবর্তনশীল সমাজে পাঠক্রমের নিত্য পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। কয়েকটি মূল নীতিকে ও মৌলিক চাহিদাকে সামনে রেখে যুগের দাবীকে অস্বীকার না করে পাঠক্রমের রচনা হলে বোধ হয় তা বিজ্ঞান-সম্মত হবে। দেহ, মন, ব্যক্তিত্ব সবকিছুরই বিকাশ সাধন করতে গেলে নির্মম-ভাবে অতিরিক্ত অবান্তর বিষয়বস্তুকে বর্জন করতে হবে। আর তা করতে হলে চাই বিষয়-সমন্বয়ন বা অবিভাজ্যতার নীতি। ইংরাজীতে একে বলা যায় integrated approach. এই নীতি অনুযায়ী বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে কোনো সীমারেখা না রেখে প্রতিটি বিষয় থেকে বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে জীবনের প্রস্তুতির কাজে লাগানোই হবে পাঠক্রমের উদ্দেশ্য। তার ফলে একটি বিষয়ের সংগে অপর বিষয়ের যোগসূত্র আবিষ্কার করা কঠিন হবে না। বরঞ্চ প্রতিটি

বিষয় নতুন অর্থ খুঁজে পাবে ও তা শিক্ষার্থীর কাছে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠবে। অবশ্য এমন অনেক বিষয় আছে যাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক নয়। সে সব ক্ষেত্রে তাদের জীবনভিত্তিক করে বাস্তব দৃষ্টি-কোণ থেকে উপস্থাপিত করলে বোধ হয় তা ফলপ্রসূ হবে।

বর্তমানে পাঠক্রমের যে সব ত্রুটি ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে কয়েকটির কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর আগ্রহ-সামর্থ্য-ভিত্তিক নয়। তাছাড়া তারা অনাবশ্যক তথ্যে ভারাক্রান্ত ও পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রিত, শিক্ষার্থীর প্রয়োজন সেখানে উপেক্ষিত হয়েছে। সেখানে সক্রিয়তার কোনো স্থান নেই, আর গোষ্ঠী ও সমাজজীবনের প্রয়োজনের দিকে কোনো দৃষ্টি নেই। এইজন্য উপযোগিতার দিক থেকে এই সব পাঠক্রম খুবই সীমিত।

কয়েকটি দিক থেকে পাঠক্রমের বিচার করলে বোধ হয় তা উপযোগী কিনা বোঝা যায়। একে একে তাদের পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যেমন—

(ক) শিক্ষার্থী ও পাঠক্রম ;

(খ) শিক্ষক ও পাঠক্রম ;

(গ) শিক্ষা-পরিবেশ ও পাঠক্রম ,

(ঘ) সময়তালিকা ও পাঠক্রম ,

(ঙ) গোষ্ঠীজীবন ও পাঠক্রম।

শিক্ষক ও পাঠক্রম—দেখা যায়, যে পাঠক্রম অনুসরণ করা হয় তা শিক্ষকের রুচি অনুযায়ী নয়, বরঞ্চ তাকে কিছুটা পরিমার্জিত করলে তা অনেক চিত্তা-কর্ষক হতে পারত। এই অবস্থায় শিক্ষককে সেই স্বাধীনতা দিতে হবে। তাঁরই নেতৃত্বে পাঠক্রমের মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে তার পুনর্বিন্যাস বাঞ্ছনীয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষককে পাঠক্রমের ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যথাযথ পরিবেশনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

শিক্ষা-পরিবেশ ও পাঠক্রম—পাঠক্রমকে কার্যকরী করে তুলতে হবে। কর্ম কেন্দ্রিকতা, শ্রাব্য-চাক্ষুষ সহায়তা, আলোচনা-চক্রের প্রবর্তন ইত্যাদি নানা উপায়ে পাঠক্রমের সার্থকতাকে বাড়িয়ে তোলা যায়। চার্ট, ছবি ও মডেলের সাহায্যে শিক্ষণীয় বিষয়কে সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক করা যায়। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বিষয়-জ্ঞান আহরণ করা অনেক ক্ষেত্রে সহজ হয়ে ওঠে ;

বিশেষতঃ প্রকৃতিবিজ্ঞান, প্রাথমিক ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীকে প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি পরিচয় করিয়ে দিলে তা অনেক উপভোগ্য হয়।

সময়তালিকা ও পাঠক্রম—যে কোনো পাঠ্যতালিকাকে সংকীর্ণ অর্থে অনুসরণ করলে তার সার্থকতা হারিয়ে যায়। তাছাড়া তার ফলে অনেক সময়ের অপচয় হয়। তার চেয়ে অভিজ্ঞতার পরিবেশনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিষয়কে পরিক্রমা করা বোধ হয় বাঞ্ছনীয়, তাতে সীমিত সময়ের মধ্যে পাঠক্রম অনুযায়ী বিষয়বস্তু পরিবেশন করা সহজ হয়। অনেক শিক্ষককে সময়ের ভিত্তিতে পাঠ্যতালিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে শোনা যায়। কিন্তু এই অভিযোগ কতখানি যুক্তিপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। পুনর্বিন্যাস ও অবিভাজনের ভিত্তিতে পাঠক্রম অনুসরণ করলে বোধ হয় এই সমস্যা কমে আসে।

গোষ্ঠীজীবন ও পাঠক্রম—গোষ্ঠীজীবনের যে সব প্রত্যাশা পূরণ করবার দায়িত্ব শিক্ষার আছে তা পালন করতে গেলে এক একটি বিষয়ের পাঠক্রমকে কাজে লাগানো যেতে পারে। যেমন ইতিহাসকে সমাজচেতনার কাজে, বিজ্ঞানকে যুক্তিবাদী মানসিকতা প্রস্তুতির কাজে বা সাহিত্যকে কমনীয় বৃত্তি উন্মেষের কাজে লাগালে পাঠক্রমের উপযোগিতা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। তাই এই সব বিষয়ে শিক্ষকের ভূমিকা আছে।

শিক্ষার্থী ও পাঠক্রম—শিক্ষার্থীর জীবনের বিভিন্ন স্তরে যে সব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে তাদের প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে পাঠক্রম রচিত হওয়া উচিত। অনেক সময় তাদের অভিজ্ঞতার সীমার বাইরে যে সব বিষয় তাদেরও পাঠ্যসূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীর কাছে তা দুর্বহ হয়ে ওঠে। এইজন্য শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও আবেগগত প্রয়োজনের দিকে সজাগ ও সপ্রতিভ দৃষ্টি রাখতেই হবে।

৩। পাঠক্রম নির্ণয়ের মূলনীতি

যে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থায় কি কি অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীকে পরিবেশন করা উচিত তা চিন্তা করা প্রয়োজন। আর তা নির্ধারণ করতে হলে চাই শিক্ষার্থীর শক্তি, সামর্থ্য, বয়স, চাহিদা, প্রয়োজন সবকিছুর দিকে লক্ষ্য রাখা। এছাড়া জীবনের কোন্ কোন্ স্তরে কি ধরনের অভিজ্ঞতা দিলে তাদের ক্রমপরিণতির পথ প্রশস্ত হয় তাও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করার সার্থকতা

আছে। একথা মনে রাখতে হবে যে শিক্ষার্থীর জন্য পাঠক্রম, পাঠক্রমের জন্য শিক্ষার্থী নয়। অনেক সময় বিপুল উৎসাহ নিয়ে পাঠক্রম প্রণয়ন করা হয় কিন্তু তখন বিস্মৃতি ঘটে পাঠক্রমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে। যাদের জন্য পাঠক্রমের পরিকল্পনা তাদের কথাই অনেক ক্ষেত্রে মনে থাকে না। ফলে পাঠক্রমের উপযোগিতা কমে যায়। একটা সময় ছিল যখন গতানুগতিক ভাবে পাঠক্রম নির্ণয় করা হ'ত। কিন্তু সে পাঠক্রম অসম্পূর্ণ ও অসার্থক হত। একটা জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনেকক্ষেত্রে প্রতিফলিত হ'ত।

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী পাঠক্রম প্রণয়নের ব্যাপারে বিবর্তন ঘটায়। যেমন, প্রকৃতিবাদ, মানবিকতাবাদ, প্রয়োগবাদ ইত্যাদি। এর ফলে পাঠক্রমের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা দিলেও তার পূর্ণতা আসেনি। কারণ জীবনের সার্থকতা আনতে গেলে বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে। শুধু অভিজ্ঞতাই নয় দৃষ্টিভঙ্গী, ভাবাদর্শ নৈপুণ্য, সৃজনশীলতা সব কিছুরই সমন্বয়ে একটা জীবন পূর্ণতা লাভ করে।

সাম্প্রতিককালে জ্ঞানের পরিধি এত বিস্তীর্ণ হয়েছে যে তাকে সংকীর্ণ পরিসরে ধরে রাখাই সমস্যা। বিশেষ করে যারা শিশু ও কিশোর তাদের কাছে এই বিপুল জ্ঞানসমুদ্রের সন্ধান দেওয়া সহজ কথা নয়। দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তথ্যের চাপে শিক্ষার্থীর মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। বিষয়-বস্তুর থেকে সে যেন কোনো স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। না আসে তার মৌলিক চিন্তা, না আসে বিষয়বস্তুর সম্যক উপলব্ধি। খণ্ডছিন্নভাবে পাঠ্য-বস্তুকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরলে তা থেকে আর কি করা যায়? যতক্ষণ পর্যন্ত পাঠ্যবস্তুর সীমা ছাড়িয়ে শিক্ষার্থী একটা সামগ্রিক স্বচ্ছ দৃষ্টি গড়ে তুলতে না পারে ততক্ষণ পাঠ্যসূচী প্রবর্তন সংস্থা নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছে কিভাবে পাঠক্রমকে যুগোপযোগী ও জাতীয় কল্যাণে নিয়োজিত করা যায়। তার জন্যে কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে উঠেছে। দেখা গেছে যে আঞ্চলিক সমস্যা ভিন্ন ভিন্ন বলে প্রতিটি প্রদেশের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন পাঠক্রম প্রণীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে কয়েকটি মূল নীতিকে কেন্দ্র করে এই সব পাঠ্যসূচী পরিকল্পিত হলে ভাল।

যে ভাবে জ্ঞানের পরিধি বেড়ে চলেছে (Knowledge Explosion) তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আঞ্চলিক প্রয়োজন মিটিয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা একটি জটিল সমস্যা। মনে হয় আজ পাঠক্রম অনুসরণ

করার ব্যাপারে শিক্ষকদের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকার প্রয়োজন। স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী পাঠ্যবিষয় বিশিষ্ট ধারায় পরিবেশিত হলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়। পাঠ্যসূচীকে সামনে রেখে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বিন্যাস করা সহজ নয়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাপক বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হলে একটা সুসংহত পরিকল্পনার প্রয়োজন। গতানুগতিকভাবে পাঠ্যসূচী অনুসরণ করলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা শেষ করা কঠিন। তাই এ ব্যাপারে শিক্ষককে অগ্রণী হতে হবে, নেতৃত্ব নিতে হবে যাতে তাঁরা উপস্থাপন পদ্ধতিকে অবস্থা অনুযায়ী নির্ধারিত করতে পারেন।

সাম্প্রতিক দৃষ্টিতে পাঠক্রমের সার্থকতা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের সূচনা হয়েছে। এক এক শ্রেণীতে এক একরকম পাঠক্রম অনুসরণ করাটা গতানুগতিক ব'লে তারা মনে করেন। তাঁদের মতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর শক্তি, সামর্থ্য, যোগ্যতা ও আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া বিদ্যালয়ের কর্তব্য। একই পাঠক্রমকে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থী ভিন্ন ভিন্ন সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে পারে। তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন শক্তি সামর্থ্যের জন্যে নানাভাবে তারা একই পাঠক্রম থেকে লাভবান হতে পারে। এই জন্যে ডাল্টন প্ল্যানের উদ্ভব হয়েছিল আজও শ্রেণী পাঠনের একটি গতানুগতিক ধারা রয়ে গেছে। ফলে ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে কোনো দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না। এজন্যে বহু প্রতিভার অপচয় হচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীর জন্যে ভিন্ন ভিন্ন পাঠক্রম একই শ্রেণীতে প্রবর্তন করা সহজ নয়। তাই মনে হয় কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডী বেঁধে না দিয়ে একটা মূল লক্ষ্য স্থির করে পাঠক্রম অনুসরণ করার ভার শিক্ষকের হাতেই ন্যস্ত হওয়া উচিত। তা না হলে শিক্ষার সত্যিকারের সুফল দেখা যাবে না। বছরের শেষে শিক্ষক কোনোমতে পাঠ্যসূচীর শেষ পর্যায়ে এসে সমাপ্তির সঙ্কেত দিলেও সত্যিকারের কতটা উপলব্ধি ঘটল সে সম্পর্কে জানবার তাঁর সাহস বা ইচ্ছা থাকেনা। কারণ সে বিষয়ে খোঁজ নিতে পারেনি বা তাদের সম্যক প্রতীতির অভাব রয়ে গেছে। এই-জন্যে চাই একটা সংহত পাঠ্যসূচীর প্রবর্তন, যাকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সার্মথ্য অনুযায়ী লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন। সকল শিক্ষার্থীর জন্যেই একই লক্ষ্য ও একই সময়সীমা নির্ধারণ করলে বাস্তবক্ষেত্রে অসুবিধা ঘটে। শিক্ষার লক্ষ্য যদি শিক্ষার্থী জীবনের উন্মোচন হয় তবে কেবল পাঠ্যসূচীর বোঝা চাপিয়ে তাকে ভারাক্রান্ত করার কোনো সার্থকতা নেই। তার চেয়ে যে যার যতটুকু শক্তি নিয়ে জন্মিয়েছে তাকে পূর্ণ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার

সার্থকতা আছে। এই ধরনের ব্যবস্থা চালু করতে হলে চাই প্রতিটি বিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য, চাই শিক্ষকদের প্রস্তুতি ও দায়িত্ববোধ। তা না হলে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপর্যয় আসবে। পাশ্চাত্যের বিদ্যালয়ে যে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ আছে তা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। এক বিদ্যালয়ের সংগে আরেক বিদ্যালয়ের মানের পার্থক্য কিছু থাকে, কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টিতে শিক্ষায় এই স্বাধীনতার সার্থকতা আছে।

৪। পাঠক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রমের উপযোগিতা জানতে হলে শিক্ষার লক্ষ্যকে মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। কোন্ বিষয়বস্তু শেখালে শিক্ষার কোন লক্ষ্যে পেঁছানো সহজ হয় তা বিচার করলে এই উপযোগিতা বোঝা যায়। এই প্রসংগে কয়েকটি প্রশ্ন স্বভাবতঃই এসে পড়ে। যেমন—

(ক) কি শেখাবো

(খ) কেন শেখাবো

(গ) কোথায় শেখাবো

(ঘ) কখন শেখাবো

(ঙ) কিভাবে শেখাবো

দেখা যায়, বিভিন্ন মতবাদ পাঠক্রম নির্ণয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে। এই মতবাদগুলির মধ্যে ভাববাদ, বাস্তববাদ, প্রকৃতিবাদ, মানবতাবাদ ও প্রয়োগবাদ উল্লেখযোগ্য। যে কোনো পাঠক্রমকে সার্থক করে তুলতে হলে বিভিন্ন মতবাদের প্রভাবকে উপেক্ষা না করে একটা সামগ্রিক সমন্বয়ের ভিত্তিতে তাকে পরিবেশন করার পরিকল্পনা নিতে হবে। এই মতবাদগুলির মধ্যে কখনো বাস্তববাদ, কখনো বা ভাববাদ, আবার কখনো প্রকৃতিবাদ প্রাধান্য লাভ করেছে। যুগমানস অনুযায়ী দেশকালপাত্রভেদে পাঠক্রমের বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষাবিজ্ঞানে পাঠক্রমের ধারণার অনেক পরিবর্তন হয়েছে সত্য। এই পরিবর্তন কি শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে, কি পাঠক্রমের ক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক। কারণ পাঠক্রম কেবল কতকগুলি শিক্ষণীয় বিষয়ের সমাবেশই নয়, পাঠক্রম বলতে বোঝায় একটি সামগ্রিক অভিজ্ঞতা পরিবেশনের আয়োজন। এই অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকবে বৈচিত্র্য ও শিক্ষার উপাদান। আর তা অনুসরণ করে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার

লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে। কাজেই বোঝা যায় যে পাঠক্রমের মধ্যে আছে একটি গতিধর্মিতা। এই গতিধর্মিতা না থাকলে পাঠক্রম সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তাৎপর্য যায় হারিয়ে।

সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আদর্শ ও শিক্ষার লক্ষ্যের পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে পাঠক্রম নানা ধারায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়। বিভিন্ন প্রকারের পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়। যেমন—

(ক) গতানুগতিক বা বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রম,

(খ) কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম.

(গ) অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রম.

(ঘ) অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রম,

(ঙ) জীবন-কেন্দ্রিক পাঠক্রম,

পাঠক্রমকে শিক্ষার্থীর বিকাশের পথে উপযোগী করে তুলতে হলে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টির অবকাশ আছে। পাঠক্রমকে নিয়ে যেসব গবেষণা হয়েছে তার ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা আজ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয়েছি, আর তা হ'ল বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট সীমারেখা না টেনে তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র আবিষ্কার করার চেষ্টা। জীবনের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা পরিবেশনের অন্যতম মাধ্যম এই পাঠক্রম। এই অভিজ্ঞতার বিন্যাস ও সমন্বয় পাঠক্রমের মধ্যে কিভাবে প্রতিফলিত করলে তা বিজ্ঞানসম্মত হবে এটাই বিবেচ্য। একদিকে আছে বিষয়বস্তুর প্রতি সুবিচারের প্রশ্ন, আর একদিকে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের পথে তা কতখানি সহায়ক এই প্রশ্ন—এই দুই-এর মধ্যে সার্থক সামঞ্জস্য না আনতে পারলে বিষয়বস্তু কেবল বোঝাই হয়ে দাঁড়ায়। এর পরে যে প্রশ্ন অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে তা হল কি পরিমাণ তথ্য পরিবেশন করলে তা সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী আয়ত্ত করতে পারে ও তার জীবনের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে। অর্থাৎ বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে যাতে কোনো একটি বিষয়ের পাঠক্রম একপেশে হয়ে না যায়, যাতে অভিজ্ঞতা ও কার্যকারিতার দিক থেকে তার উপযোগিতা থাকে।

বিষয়বস্তু বিন্যাসের যে সব নীতি বিজ্ঞানসম্মত তার মধ্যে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনকে ভিত্তি করে সমন্বয়ভিত্তিক পাঠক্রম উদ্ভাবন করাই বোধ হয় সমীচীন হবে। আজ অবিভাজ্যতার নীতিকে অনেকেই আদর্শ নীতি বলে গ্রহণ করছেন কারণ এর ফলে বিষয়বস্তুই বড় হয়ে দাঁড়ায় না, বড় হয় শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ।

৫। পাঠক্রম ও শিক্ষাবিজ্ঞান

পাঠক্রম শিক্ষার একটি বিশিষ্ট উপাদান। কারণ পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পরিবেশন করা হয়। যে কোনো শিক্ষা-ব্যবস্থায় তাই পাঠক্রমের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। পাঠক্রমের সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্কের কথা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য শিক্ষার লক্ষ্য অনুযায়ী পাঠক্রমের রূপ ও বিন্যাস নির্ধারিত হয়। তবে শিক্ষার্থী-জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে পাঠক্রমের সংগতি থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তা নাহলে বিষয়বস্তুর বোঝা প্রকৃত শিক্ষার পথে অন্তরায় হয়। শিক্ষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মনে হয় যে পাঠক্রমের সঙ্গে শিক্ষার অন্যান্য উপাদানের যোগ আছে। তাই পাঠক্রমকে প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। পাঠক্রমকে যে যে পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে তার সার্থকতা নিরূপণ করা উচিত সেগুলি হল---

(ক) পাঠক্রম ও শিক্ষার্থী,

(খ) পাঠক্রম ও শিক্ষক,

(গ) পাঠক্রম ও গোষ্ঠীজীবন,

(ঘ) পাঠক্রম ও পরিবেশ.

(ঙ) পাঠক্রম ও পদ্ধতি,

(চ) পাঠক্রম ও মূল্যায়ন।

পাঠক্রমকে স্বতন্ত্রভাবে না দেখে বিশেষ বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে তার বিচার-বিশ্লেষণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন প্রথমেই চিন্তা করা দরকার পাঠক্রমের লক্ষ্য কি ও কিভাবে সেই লক্ষ্যের দিকে পেঁছানো যায়। তার পরের প্রশ্ন হল পাঠক্রম অনুযায়ী তথ্য পরিবেশনে শিক্ষকের দায়িত্ব। একে একে পাঠক্রম অনুযায়ী মূল্যায়নের প্রশ্ন। অর্থাৎ পাঠক্রম অনুযায়ী যে তথ্য পরিবেশন করা হয় তার ফলশ্রুতি কি—এবিষয়ে মূল্যায়নের সার্থকতা আছে। সব থেকে বড় সমস্যা হল পাঠক্রমকে ঘিরে যে সব সমস্যার কথা শোনা যায় তার মধ্যে সময়-তালিকার সমস্যা প্রধান। অর্থাৎ সীমিত সময়ে পাঠ্যবিষয় সম্পূর্ণ করা সম্ভব কি না—এবিষয়ে অনেক মতভেদ দেখা যায়। অনেক শিক্ষকের ধারণা যে গতানুগতিক রীতিতে পাঠক্রমের অনুবর্তন করলেই প্রকৃত শিক্ষা হয় না। জীবনের সঙ্গে সংগতি রেখে যুগ ও গোষ্ঠী-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রম রচিত হলে তা সুসামঞ্জস

হয়। একদিকে শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার্থী ও সমাজের প্রত্যাশা, শিক্ষকের শক্তি ও বিদ্যালয়ের সীমিত সময় প্রতিটি দিকে দৃষ্টি রেখে পাঠক্রমকে সংহত ও সুসামঞ্জস করে তোলাই শিক্ষাবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। মোট কথা, যাতে একটি ভারসাম্য বজায় থাকে তার জন্যে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি নিয়ে পাঠক্রমের বিবর্তন করা বাঞ্ছনীয়; তবেই তা কার্যকরী, সার্থক ও উপযোগী হবে। শিক্ষাবিজ্ঞানের কাজ হল এই ভারসাম্যকে আবিষ্কার করা। কিভাবে সীমিত সময়ের মধ্যে শিক্ষক যুগোপযোগী বাস্তবাভিমুখী জ্ঞান বা তথ্য নির্দিষ্ট বিদ্যালয় শ্রেণীর পরিস্থিতিতে আদর্শ পাঠক্রম প্রণয়ন করবেন তার সন্ধান মেলে শিক্ষাবিজ্ঞানের মূল সূত্র থেকে। তাই পাঠক্রম ও শিক্ষাবিজ্ঞানের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

আলোচনা

পাঠক্রমের সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ থাকলেও আজ একথা স্বীকৃত হয়েছে যে পাঠক্রম কেবল কয়েকটি বিষয়বস্তুর সমন্বয় নয়, পাঠক্রম বলতে বোঝায় জীবনের প্রস্তুতির জন্য সামগ্রিক অভিজ্ঞতার সংহত ও সার্থক বিন্যাস। শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রমের বিশেষ তাৎপর্য আছে। কারণ শিক্ষার এই উপাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানসঞ্চার করা সম্ভব হয়। বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে যে তত্ত্ব ও তথ্য, মনীষীদের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে আছে, শিক্ষার্থীদের কাছে সার্থকভাবে তাকে তুলে ধরার উপযোগিতা আছে বৈকি! অবশ্য তথ্যের বোঝা চাপিয়ে দিলেই পাঠক্রমের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল তা নয়, তার যথাযথ বিন্যাস ও বিশ্লেষণের অবকাশ আছে। তথ্য পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের সন্ধান দেওয়াও পাঠক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য।

কি কি বিষয়বস্তু পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে তা নির্ধারণ করতে হলে শিক্ষার লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ পাঠক্রম প্রণয়ণের নীতিকে প্রভাবিত করেছে। এক এক সময়ে এক একটি দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর বিন্যাস করা হয়েছে। এইজন্য পাঠক্রমের বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যুগের উপযোগী শিক্ষা দিতে গেলে পাঠক্রমের পরিবর্তন আনার প্রয়োজন আছে, আর তা না হলে গতানুগতিকতা ও ত্রুটি পাঠক্রমের মধ্যে দেখা দেবে।

পাঠক্রমের প্রকারভেদ স্বাভাবিক। গতানুগতিক পাঠক্রম ছাড়া নানা ধরনের

পাঠক্রম প্রণীত হয়। যেমন (ক) কর্মকেন্দ্রিক, (খ) অভিজ্ঞতাভিত্তিক, (গ) অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রম। এছাড়া জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রমের উপযোগিতা সম্পর্কেও চিন্তার অবসর আছে। এইরূপ পাঠক্রম প্রণয়ন করতে হলে কয়েকটি মূল নীতির প্রয়োজন। সেগুলি হল শিশুর চাহিদা, সমাজের চাহিদাকে কেন্দ্র করে পাঠক্রম প্রণয়নের নীতি। তাছাড়া সমন্বয়ভিত্তিক পাঠক্রমের মধ্যে একদিকে শিশুর চাহিদা, অপরদিকে সমাজের চাহিদা—এই দুই-এর সমন্বয়সাধন করা হয়। আরও কয়েকটি নীতি এই ধরনের পাঠক্রম-প্রণয়নে অনুসরণ করা হয়। যেমন সংরক্ষণের নীতি, রচনাত্মক নীতি, কর্মকেন্দ্রিক নীতি, পরিবর্তনশীলতার নীতি এবং অবিভাজ্যতার নীতি। এই ভিন্ন ভিন্ন নীতির সমন্বয়ে সুসংহত ও সুসামঞ্জস পাঠক্রমের প্রণয়ন সম্ভবপর হয়।

যে কোনো পাঠক্রম প্রণয়ন করতে হলে শিক্ষার্থী-জীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সঙ্গে সংগতি রেখে বিষয়বস্তুর যোজনা করা প্রয়োজন। কারণ শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তি, শক্তি-সামর্থ্য, রুচি ও প্রবণতা, আগ্রহ ও ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনের দিকে সচেতন না থাকলে পাঠক্রমের সার্থক রূপায়ণ সম্ভবপর হয় না। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত যে পাঠক্রম প্রণীত হবে তা প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রমের সঙ্গে সংগতি রেখে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে।—

১। ভাষাশিক্ষা (Language)

২। সমাজবিদ্যা (Social studies)

৩। সাধারণ বিজ্ঞান (General Science)

৪। অংক (Mathematics)

৫। চারুকলা ও সংগীত (Art and music)

৬। হস্তশিল্প (Craft)

৭। দৈহিক শিক্ষা (Physical education)

বিদ্যালয়ের স্তর ও পর্যায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই পাঠক্রম-বিষয় নির্ণীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে হাতের কাজকে পাঠক্রমে বিশেষ স্থান দিতে হবে। আবার উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও সমাজশিক্ষা পাঠক্রমের মধ্যে প্রাধান্য পাবে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরে যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় বা আবশ্যিক কয়েকটি বিষয় ছাড়া বিশেষ কয়েকটি বিষয়ও এই পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন ঃ—

১। কেন্দ্রীয় বিষয় বা আবশ্যিক বিষয় (Core subject) ঃ—

ভাষা ঃ—(১) মাতৃভাষা, (২) ইংরাজী অথবা যে কোনো ভারতীয় ভাষা বা বিদেশী ভাষা বা সংস্কৃত ভাষা, (৩) সমাজবিদ্যা, (৪) সাধারণ বিজ্ঞান, (৫) যে কোনো এক ধরনের হস্তশিল্প, (৬) গণিত।

২। বিশেষ বিষয়সমূহ ঃ—

(ক) মানবীয় বিজ্ঞান (Humanities)

১। সংস্কৃত
২। ইতিহাস
৩। ভূগোল
৪। অর্থবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিদ্যা
৫। মনোবিদ্যা ও তর্কবিদ্যা
৬। অংক
৭। সংগীত

(খ) বিজ্ঞান-বিভাগ (Science)

১। পদার্থবিদ্যা
২। রসায়নবিদ্যা
৩। জীববিদ্যা
৪। অংক
৫। ভূগোল
৬। দেহবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান

(গ) কারিগরি বিভাগ (Technical)

১। ফলিত গণিত
২। অংকন
৩। ফলিত বিজ্ঞান (পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যা)
৪। মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং
৫। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

(ঘ) বাণিজ্য বিভাগ (Commerce)

১। বাণিজ্যিক তত্ত্ব
২। বুক কিপিং
৩। বাণিজ্যিক ভূগোল ও অর্থনীতি
৪। সর্টহ্যান্ড এবং টাইপ রাইটিং

(ঙ) কৃষি-বিভাগ (Agriculture)

১। সাধারণ কৃষিতত্ত্ব
২। পশুপালন
৩। উদ্যানবিদ্যা
৪। কৃষিমূলক রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যা

(চ) চারুকলা বিভাগ (Fine Arts)

১। চারুকলার বিকাশের ইতিহাস
২। নক্সা ও অংকন
৩। মূর্তি নির্মাণ
৪। চিত্রাংকন
৫। সংগীত
৬। নৃত্য

(ছ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (Home Science)

১। গৃহস্থালীর অর্থনীতি
২। পুষ্টি ও রন্ধন
৩। মাতৃসেবা ও শিশুপালনবিষয়ক বিষয়
৪। গৃহস্থালী পরিচালনা ও সেবা

সাম্প্রতিক কালে পাঠক্রম নিয়ে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তার মূল কারণ হল সামগ্রিক দৃষ্টির অভাব। শিক্ষার্থীর শক্তি-সামর্থ্যের কথা ও সীমিত সময়ের কথা ভুলে গিয়ে পাঠক্রমকে লক্ষ্যহীন ভাবে প্রসারিত করা হচ্ছে। ফলে পাঠক্রম রচনার উদ্দেশ্য হারিয়ে যাচ্ছে। বিষয়ের পর বিষয়ের বোঝা জমে উঠে শিক্ষার্থীর কাছে দুর্বহ হয়ে উঠছে। যাঁরা পাঠক্রম রচনা করেছেন তাঁরা কেবল বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও বিস্তার পাঠক্রমের মধ্যে প্রতিফলিত দেখার জন্য বাস্তব দৃষ্টি হারিয়ে ফেলছেন। একদিকে যেমন বিষয়জ্ঞান পরিবেশনের দায়িত্ব অন্যদিকে শিক্ষার্থীর পক্ষে তা কতখানি গ্রহণযোগ্য সে কথাও চিন্তা করতে হবে। অনেক সময় এমন অনেক জিনিস শিক্ষার্থীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় যে, সে সেই বয়সে তার থেকে রসাহরণ করতে পারে না, কেবল যান্ত্রিক উপায়ে তা মনে রাখতে চায়। ফলে মনের পরিণতি আসে না, চিত্তের বিকাশ ঘটে না। এছাড়া বিদ্যালয়ের সময়তালিকার মধ্যে প্রতিটি বিষয় শেখাবার জন্য সময় সীমিত। একথা ভুললে চলবে না বিষয়বস্তুর পরিবেশনের গতানুগতিক পদ্ধতি সামগ্রিক পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতি রাখতে পারছে না। তাই বিষয়বস্তুকে পুনর্বিন্যস্ত করে সক্রিয় পদ্ধতি অবলম্বন করে আলোচনা বা অন্য কোনো উদ্ভাবিত উপায়ে বিষয়বস্তু পরিবেশন করলে তা হয়তো বিকাশে সহায়ক হবে। আহার্যের পরিমাণ বাড়ালেই তা দেহের পরিপুষ্টি আনে না। কি ধরনের আহার্য এবং কিভাবে তা প্রস্তুত হয়েছে তার ওপরও নির্ভর করে দেহের পরিপুষ্টি। যার জন্যে এই আহার্য তার পরিপাক শক্তির ওপরও পরিপুষ্টি অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। পাঠক্রমের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বর্তমানে শিক্ষার ক্ষেত্রে নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষার যে হিড়িক উঠেছে তার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। কোনো একটি বিশিষ্ট পাঠক্রম অনুসরণ করে, বিশিষ্ট ধারা বেয়ে তাদের যদি পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া না যায়, যদি নিরন্তর তারা দোলায় দুলতে থাকে তবে তাদের পরিণাম কি হবে বলা কঠিন নয়। বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে সুসংহত, সুবিন্যস্ত ও সুসামঞ্জস পাঠক্রম রচনাই বর্তমান সংকট থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। তার জন্যে চাই প্রত্যয়, অন্তর্দৃষ্টি ও নিষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষণপ্রণালী

১। শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাবিজ্ঞান

শিখন-পদ্ধতির বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, এই পদ্ধতি একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। শেখা ও শেখানো দু'এর মধ্যে সম্পর্ককে অস্বীকার করা যায় না। শেখার মধ্যে যে মানসিক প্রক্রিয়া নিহিত আছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অভিজ্ঞতা ও অনুষঙ্গ মানুষকে শিখতে সহায়তা করে। তাই যে কোনো শিখন-পদ্ধতি বুঝতে হলে তার পেছনে যে শিক্ষাবিজ্ঞানের নীতি রয়েছে তাকে অস্বীকার করা যায় না। যেমন, কিণ্ডারগার্টেন ও মণ্টেসরি পদ্ধতি বা হার্বার্টের শিক্ষাপদ্ধতি—এইসব শিক্ষা-পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছিল শিশুর প্রয়োজন বা মানসিক চাহিদার কথা চিন্তা করে। তাছাড়া জীবনের এক একটি স্তরের যে সব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেগুলি মনে রেখে শিক্ষণের সূত্রগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। মণ্টেসরি দেখেছেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশু কৌতূহলী ও তার ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা পরিচালিত। তাই তার শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে অভিজ্ঞতার পরিবেশন করাই সার্থক। শিশুরা খেলাধুলো ভালোবাসে, স্বভাবতঃই চঞ্চল তারা। কিন্তু তারা অন্তরে শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশ পছন্দ করে। তাই মণ্টেসরি পদ্ধতির মধ্যে কয়েকটি অনুশীলন, ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে শিক্ষা ও নীরবতা পালনের দিকে উদ্দিষ্ট। তেমনি হার্বার্টের শিক্ষাপদ্ধতিও শিক্ষার্থীকে জানা থেকে অজানার দিকে ধাপে ধাপে নিয়ে যাবার আয়োজন করেছে। ইংরাজীতে তাদের বলে Herbertian steps. অবশ্য হার্বার্টের এই পদ্ধতি তর্কবিদ্যাসম্মতও বটে। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে নতুন অভিজ্ঞতা লাভের দিকে পদক্ষেপ, জানা থেকে অজানার দিকে অভিযান কিভাবে সুসম্পন্ন হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে হার্বার্টের শিক্ষণের সোপানগুলি রচিত হয়েছে। কেবল যুক্তি ও বিচারের ভিত্তিতেই এই পদ্ধতি কার্যকরী নয়, এর মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিও খুঁজে পাওয়া যায়।

পঠনপাঠনকে সার্থক করে তুলতে হলে তাকে বিজ্ঞান-সম্মত করে তোলার প্রয়োজন। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে হার্বার্টের পাঠ-পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। এই পরিকল্পনার মধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় লক্ষ্য করা যায় তার বিবরণ দেওয়া হল—(ক) পাঠের উদ্দেশ্যের বিবৃতি, (খ) শিক্ষার্থীদের পূর্ব জ্ঞানের বিবরণ, (গ) পাঠের উপকরণ, (ঘ) আয়োজন ও পাঠ-ঘোষণা, (ঙ) উপস্থাপন, (চ) পুনরালোচনা, (ছ) অভিযোজন, (জ) বাড়ীর কাজ এবং (ঝ) পাঠদান-সংক্রান্ত সমস্যা।

কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হার্বার্টের এই পাঠ-পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রেণী-পাঠন করতে গেলে অনেক সময় কিছু কিছু সমস্যা এসে পড়ে। যেমন ছকে বাঁধা রীতি অনুযায়ী পাঠ-দানের কাজে এগিয়ে যেতে যেতে পদ্ধতির দিকেই বিশেষ দৃষ্টি পড়ে যায় শিক্ষার্থীর প্রত্যাশার দিকে বা শিক্ষণের লক্ষ্যের দিকে ততখানি দৃষ্টি থাকে না। কার পরে কোন পর্যায়, কোন্ ধাপ তা মানতে মানতে শিক্ষকের স্বাধীনতা যায় হারিয়ে। শিক্ষা যে মূলতঃ প্রেরণা (Teaching is mainly an inspiration) এই কথা ভুলে গিয়ে পদ্ধতির দাসত্ব করলেই সত্যিকারের শিক্ষণ হয় না। তাই শিক্ষণপ্রণালীর থেকে তার বাইরের কাঠামোকে যান্ত্রিকভাবে না নিয়ে, মূল বক্তব্য বা শিক্ষানীতিকে বেছে নিতে হবে। কারণ আজ শিক্ষণের আর একটি দিকের কথা ভাবতে হবে, তা হল তার creative দিক। এই creative teaching-কে উৎসাহিত করতে হলে শিক্ষকদের মধ্যে নতুন ধারায় পরীক্ষানিরীক্ষার (action-research) সুযোগ দিতে হবে। এক একটি শ্রেণী-পরিবেশে এক এক রকম শিক্ষা-পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী হতে পারে, এই কথা চিন্তা করে শিক্ষককে খোলা মন নিয়ে এগোতে হবে। শ্রেণীকক্ষই হবে তার গবেষণাগার। আর এই গবেষণার লক্ষ্য হবে শিক্ষা ও শিক্ষণ বিষয়ে নতুন তথ্যের উদ্ভাবন। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির অন্তর্নিহিত তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি পদ্ধতির মূলে আছে এক একটি অনুমান। তবে শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি মূল সূত্র সমস্ত শিক্ষণ-প্রণালীর মধ্যে প্রতিফলিত দেখা যায়। সেটি হলো শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতিকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর উপস্থাপন তখনই সার্থক হয় যখন তা শিক্ষার্থীর আগ্রহ সঞ্চার করে। এই আগ্রহ, প্রেষণা ও মানসিক প্রস্তুতি না থাকলে কোনো বিষয় বা পদ্ধতি সার্থক হয় না। কি ক্রিয়াকেন্দ্রিক শিক্ষা, কি অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষণ, যে কোনো শিক্ষা ও শিক্ষণের তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় তার অন্তর্নিহিত

মনস্তাত্ত্বিক সত্যকে আবিষ্কার করলে। শিক্ষার যে তিনটি দিকের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে উদ্দীপনের কাজেই প্রধান কাজ। কিভাবে শিক্ষার্থীর মনকে উদ্দীপিত করা যায় তা জানতে পারলে শিক্ষণের অনেকখানি সম্পূর্ণতা আসে। তারপর আসে সন্দীপন ও প্রদীপনের পালা। এই নিয়ে অনেক পদ্ধতি ও প্রণালীর উদ্ভাবন হয়েছে। আজ আরও দু'একটি দিকে গবেষণা শুরু হয়েছে। কিভাবে শিক্ষার্থীর শেখা সহজ ও সুগম হবে তার জন্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছে। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল programmed learning. এখানে শেখাকে একটি আচরণ বলে মনে করা হয়েছে। কোন্ উত্তেজক শিক্ষার্থীর মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার ওপর ভিত্তি করে কয়েকটি উদ্দীপক রচনার চেষ্টা হয়েছে। Programmed learning-এর মধ্যে দেখা যায় যে শিক্ষার্থী ঠিকভাবে শিখলে সঙ্গে সঙ্গে সে তা জানতে পারে এবং না শিখলে তাও সে বুঝতে পারে। এইভাবে, এই ব্যবস্থার মধ্যে তাকে feedback দেওয়ার জন্য উত্তরসংকেত দেওয়া থাকে। ফলে শিক্ষার্থী তা দেখে বুঝতে পারে সে ঠিক শিখছে কি না। তাকে শিক্ষকের ওপর নির্ভর করতে হয় না, একে একে সে শিক্ষার পথে অগ্রসর হয়। Programmed learning-এর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আছে, যেমন Linear, Branch, Adjunct ইত্যাদি। বিষয়বস্তু ও শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি অনুসারে কোন্ প্রকারের programme উপযোগী হবে তা নির্ধারিত হয়। কাজেই দেখা যায় এই নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনের ফলে প্রতিটি শিক্ষার্থীই ধাপে ধাপে তার নিজস্ব শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী শিখতে পারে। আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতির মধ্যে micro-teaching বা অণু-শিক্ষণ পদ্ধতি অন্যতম। এই অণু-শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষককে শিক্ষণ-কাজে ভুলত্রুটি সংশোধন করতে সহায়তা করে। শুধু তাই নয় শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় যে সব নৈপুণ্যের উপাদানের প্রয়োজন হয়, প্রতিটিকে বিশ্লেষণ করে শিক্ষক আত্মসমীক্ষার দ্বারা শিক্ষণ কাজের উন্নতিসাধন করতে পারেন। তাই অণু-শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষণকে একটি আচরণ হিসাবে গণ্য করে তার যথাযথ বিশ্লেষণে এগিয়ে গেছে। আর তার ফলে শিক্ষকও শিক্ষণের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বা পর্যায়ে কোথায় কি ভুলত্রুটি বা অপূর্ণতা ঘটছে তা জানতে পেয়ে উপকৃত হন। তথাকথিত সামগ্রিক শিক্ষার ওপর বেশী জোর না দিয়ে শিক্ষকের মূলগত পারদর্শিতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে যার ফলে শিক্ষকের শিক্ষাপ্রদানের গুণগত উৎকর্ষকেই সর্বাপেক্ষা বেশী ঈপ্সিত বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এখানেই

অণু-শিক্ষণের সূত্রপাত। অণু-শিক্ষণ শিক্ষণরত শিক্ষকের এই সহজ, স্বাভাবিক ও অভিপ্রেত সচেতনতা এনে দেয় যাতে তিনি তাঁর শ্রেণীকক্ষে অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষাপ্রদানে ঈপ্সিত উন্নতিসাধন করতে পারেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার্য, অণু-শিক্ষণ কখনোই শিক্ষা-প্রদানে একটি বিকল্প পদ্ধতি কিংবা মৌলিকতাসর্বস্ব শুধু একটি অভিনব পদ্ধতিরই দাবী করে না। এর ভূমিকা হল শিক্ষাকালে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ব্যবধান কমিয়ে আনা, অর্থাৎ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভেতরে এমন এক ধরনের নিবিড় সামীপ্য গড়ে তোলা যায় ফলে শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাপ্রদান উভয় দিকেই অন্তরঙ্গতা ও গভীরতার বিষয়টি সবচেয়ে বেশী অনুভূত হয়।

সাম্প্রতিককালে শিক্ষাপ্রদানের ক্ষেত্রে একথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে শেখানোর কাজটি অত্যন্ত জটিল। বহুমুখী ও বিভিন্ন নৈপুণ্যের আয়ত্তীকরণ শিক্ষকের প্রকাশ ও পর্যালোচনার ক্ষমতার ওপর মৌলিকভাবে নির্ভরশীল। এই নৈপুণ্যগুলোকে কয়েকটি উপ-নৈপুণ্যে (sub-skill) বিশ্লিষ্ট করে নিলে এবং সে-অনুযায়ী উপ-নৈপুণ্যের অন্তর্গত উপাদানমূলক নৈপুণ্যের (component skills) প্রকৃতি, পরিচয়, সংজ্ঞায়ন, বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সর্বাত্মক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধ্যান করলে শেখানোর কাজটি সবচেয়ে সফলভাবে সাধিত হতে পারে। এ' ধরনের বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীতে (analytic approach) শিক্ষার্থী-শিক্ষক অন্ততঃ তিনটি বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন :

এক। তিনি পরিষ্কার জানেন শেখানোর জন্য তিনি কেন প্রশ্নাবলী করেছেন।

দুই। শেখানোর উপযোগী যে কোনো একটি শিক্ষণীয় একক (teaching point/concept) তিনি পূর্বাহ্ণে নির্বাচিত করতে পারেন।

তিন। নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে তাঁর নির্বাচিত এককের প্রারম্ভিকাকে (starting) বিশেষায়ণ (specification) করতে পারেন।

উল্লিখিত শেখানোর এই বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির জনক হিসাবেই অণু-শিক্ষণের আবির্ভাব।

অণু-শিক্ষণের উদ্দেশ্য হল কেমন করে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় (controlled condition) শিক্ষণ অনুশীলন করা যায়। এই শিক্ষণ এমন একটি পদ্ধতি যা নিয়ন্ত্রিত অনুশীলনে (controlled practice) বিশেষ একটি শিক্ষণ

আচরণকেই (teaching behaviour) বিশেষ শিক্ষণ-নৈপুণ্যের প্রকৃতি, পরিচয়, বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের আয়ত্তীকরণে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সহায়তা করে। অণু-শিক্ষণের বৈশিষ্ট্য এই যে, এই শিক্ষণ সংজ্ঞায়নিক (definable), পর্যবেক্ষণযোগ্য (observable) ও পরিমাপযোগ্য (measurable)। এখানে শিক্ষণ-পদ্ধতি পরিবর্তনপন্থী (modifiable) ও নিয়ন্ত্রিত (controlled)। এখানে শিক্ষণকে সাধারণ সামগ্রিকতা থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়, যাতে শিক্ষণে নিয়ন্ত্রিত অনুশীলন সম্ভবপর হয়। স্বভাবতঃই এই বিশেষীকরণে শ্রেণী, পাঠ-দৈর্ঘ্য, শিক্ষণকাল, শিক্ষণ-সমস্যাবলী ইত্যাদি সবকিছুকেই অত্যন্ত সীমিত করে দেওয়া হয়।

অণু-শিক্ষণের প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

অণু-শিক্ষণের প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলে তার প্রক্রিয়াগত ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির পাঁচটি স্তর নিম্নরূপ ঃ

এক। পাঠ-প্রদান (teach)

দুই। ঋদ্ধায়ন (feedback) / আলোচনী (critique) অভিমত (view) / নির্ণায়ন (assessment) / মূল্যায়ন (evaluation)

তিন। পুনর্পরিকল্পনা (re-plan)

চার। পুনর্পাঠপ্রদান (re-teach)

পাঁচ। পুনঃঋদ্ধায়ন (re-feedback) / পুনরালোচনা (re-critique) / পুনরভিমত (re-view) / পুনর্নির্ণয়ন (re-assessment) / পুনর্মূল্যায়ন (re-evaluation).

উপরোক্ত পাঁচটি স্তর থেকে পাঠ-পরিকল্পনা (lesson plan) বাদ দেওয়া হয়েছে, কেন না, এটি ধরেই নেওয়া হয়েছে যে প্রত্যেক অণু-শিক্ষক যে কোনো অণু-শ্রেণীতে যে কোনো অণু-পাঠ প্রদানের পূর্বাহ্নে অণু-পাঠ পরিকল্পনা অবশ্যই করবেন।

শিক্ষণ-নৈপুণ্য নির্বাচন ঃ (Selection of teaching skills)

প্রথম পর্যায়ে সীমিত সময় ও অপ্রতুল সম্পদ নিয়েও অণু-শিক্ষণ শুরু করা যেতে পারে। কিন্তু সীমাবদ্ধ সময় ও অপ্রতুল সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠদানের সকল নৈপুণ্য অভ্যাস করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অপরপক্ষে, যে সব শিক্ষার্থী-শিক্ষক পূর্ব থেকেই কিছু নৈপুণ্য অর্জন করেছেন তাঁদের জন্য পুনরায় সকল নৈপুণ্যের অভ্যাস করার প্রয়োজন নেই। শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের

মধ্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যে নৈপুণ্যের অভাব পরিলক্ষিত হয় অথচ পাঠদানের জন্য বিশেষ কার্যকরী, সেই প্রকার নৈপুণ্য সময়-সংগতির প্রতি লক্ষ্য রেখে স্থির করা প্রয়োজন।

নৈপুণ্য নির্ণয়ের অপর একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। মহাবিদ্যালয়ের সহযোগী অণু-শিক্ষকগণ যদি প্রত্যেকেই শিক্ষার্থী-শিক্ষকের যে সকল শিক্ষণ-নৈপুণ্য থাকা প্রয়োজন সেগুলি অগ্রগণ্যতা (priority) অনুযায়ী তালিকাবদ্ধ করেন তাহলে উপযুক্ত নৈপুণ্য নির্ণয় করতে পারলে সীমাবদ্ধ সময় ও সম্পদের অভাবের মধ্যেও শিক্ষার্থী-শিক্ষকগণ অনেক বেশী নৈপুণ্য আয়ত্ত করতে সক্ষম হন। বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ্‌গণ যে সকল নৈপুণ্য নির্ণয় করেছেন সেগুলির মধ্যে—

১। পুনরভিজ্ঞান (Reinforcement),

২। অনুসন্ধানী প্রশ্নকরণ (Probing questioning),

৩। নীরবতা ও নির্বাক সংকেত (Silence and non-verbal cues),

এই তিনটি একক নৈপুণ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকটি নৈপুণ্য অনেকগুলি উপাদান (components) সহযোগে গঠিত। উপাদানগুলির বিশেষ পরিচয় কিংবা চুম্বক শব্দাবলীর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

নৈপুণ্য-পুনরভিজ্ঞান (Reinforcement)

চুম্বক শব্দাবলীর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা :

ধনাত্মক সবাক পুনরভিজ্ঞান :	হ্যাঁ / বেশ / সুন্দর / চমৎকার / সাবাস ইত্যাদি শব্দাবলীর মাধ্যমে নৈপুণ্যের এই উপাদানটি প্রযুক্ত হয়।
পুনরুক্তি ও পুনর্বিন্যাস :	অণু-শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরের অংশবিশেষের পুনরুক্তি, বিন্যাস, আংশিক সমৃদ্ধকরণ।
অতিরিক্ত সবাক সংকেত :	অণু-শিক্ষার্থীকে উৎসাহ এবং যথার্থ উত্তরদানে সূত্রধারক-শব্দাবলীর (prompts) উল্লেখ করা যেমন, হুঁ-হুঁ / হ্যাঁ হ্যাঁ, আহ / আহা / বলে যাও/থামলে কেন / এই তো হচ্ছে / একটু ভেবে বলো ইত্যাদি।

ধনাত্মক নির্বাক সংকেত	মাথা দুলিয়ে সম্মতি প্রকাশ, মৃদু হাসা, অণু-ছাত্রের পিঠে হাত বুলানো, তার প্রতি সম্মতি-সূচক ও উৎসাহ-ব্যঞ্জক দৃষ্টিপাত ইত্যাদি।
ঋণাত্মক সবাক পুনরভিজ্ঞান ঃ	অণু-ছাত্রকে ভুল উত্তরদানের জন্য সরাসরি তিরস্কার করা, ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করা ইত্যাদি।
ঋণাত্মক নির্বাক পুনরভিজ্ঞান ঃ	অণু-ছাত্রকে ভুল উত্তরদানের জন্য ভ্রূকুটি, অপলক বিস্ময়সূচক দৃষ্টি, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ইত্যাদি।
পুনরভিজ্ঞানের ত্রুটিযুক্ত প্রয়োগ ঃ	অণু-ছাত্রের উত্তরদানকালীন অনাবশ্যক-ভাবে পুনরভিজ্ঞানের প্রদান।
পুনরভিজ্ঞানের অনুপযুক্ত প্রয়োগ ঃ	একই পুনরভিজ্ঞানের খেয়াল খুশিমতো প্রয়োগ। অণু-ছাত্রের উত্তরের উৎকর্ষ-অপকর্ষে সচেতন না হয়ে পুনরভি-জ্ঞানের প্রয়োগ।

নৈপুণ্য-অনুসন্ধানী প্রশ্নকরণ (Probing questioning)

অনুসন্ধানী প্রশ্নকরণ নৈপুণ্যের উপাদানসমূহের বিশ্লেষণ ঃ

সাংকেতিক প্রশ্নকরণ Prompting questioning	অণু-শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ঈপ্সিত উত্তরলাভের জন্য সংকেতসমৃদ্ধ প্রশ্ন করা।
অতিরিক্ত তথ্যান্বেষণ Seeking further information	'কেমন করে', 'কেন' ইত্যাদি তথ্যান্বেষক প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে অণু-শিক্ষার্থীর শুদ্ধ কিংবা আংশিক শুদ্ধ উত্তরের ঋদ্ধিসাধন।
পুনরালোকায়ণ Refocussing	সাদৃশ্য কিংবা বৈসাদৃশ্যমূলক আণুষঙ্গিক কিংবা অন্য বিষয় / ঘটনা / তথ্যের অবতারণা।
পুনর্নির্দেশায়ন Redirection	অণু-শিক্ষার্থীর কাছ থেকে সঠিক উত্তর লাভের জন্য অন্য সহপাঠী অণু-শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করা।

বিশ্লেষণাত্মক সচেতনার বর্ধন (Increasing Critical Awareness)	অণু-শিক্ষার্থীর পুরোপুরি সঠিক উত্তরকে ভিত্তি করে 'কেন' কিংবা 'কেমন করে জাতীয় প্রশ্নের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার অবকাশ সৃষ্টি করা।

নৈপুণ্য-নীরবতা ও নির্বাক সংকেত (Silence & non-verbal cues)

"নীরবতা ও নির্বাক সংকেত" নৈপুণ্যের বিশ্লেষণ ঃ

(অ) নীরবতা (silence) ঃ ভাবনার উদ্দীপনা আনয়নের জন্য পাঠদান কালে উদ্দেশ্যমূলক বিরতি।

(আ) নির্বাক সংকেত (non-verbal cues) ঃ

(i) মুখমণ্ডলের মাধ্যমে সংকেত ঃ (Facial cues)	যেমন মৃদুহাসি, ভ্রুকুটি ইত্যাদি।
(ii) মাথার মাধ্যমে সংকেত ঃ (Head movement)	মাথা দোলানো, মাথা হেলানো ইত্যাদি।
(iii) দেহের মাধ্যমে সংকেত ঃ (Body movement)	শ্রেণীকক্ষে হাঁটা, বৃত্তাকারে ঘোরা ইত্যাদি।
(iv) হাতের মাধ্যমে সংকেত ঃ (Hand movement)	অঙ্গুলি সংকেত, দূরত্বের / নৈকট্যের সংকেত ইত্যাদি।

ভারতবর্ষে অণু-শিক্ষণ প্রবর্তনের পর শিক্ষাবিদগণের গবেষণালব্ধ যে তিনটি একক নৈপুণ্যের কিছু আভাস দেওয়া হল সেগুলির মধ্যে পুনরভিজ্ঞান (reinforcement) অন্যতম। অণু-শিক্ষণের প্রথম পর্যায়ে এক একটি নৈপুণ্যকে সহজভাবে আয়ত্ত করবার উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনা রচনার সার্থকতা আছে। সীমিত পরিবেশে অণু-শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগকে কার্যকরী করতে হলে চাই শিক্ষকের আত্মসমীক্ষা ও সপ্রতিভ দৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, অণু-শিক্ষণ পদ্ধতি মূলতঃ শিক্ষকদের সমীক্ষার কাজে বিশেষ উপযোগী। তাই একে শ্রেণী-পাঠনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পদ্ধতি না বলে শিক্ষকের পাঠনের ক্ষেত্রে নৈপুণ্য অর্জনের পরিপূরক একটি প্রণালী বলা চলে।

২। শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষক ঃ

আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিপুল পরিবর্তন এসেছে শিক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রেও তার ঢেউ এসে লেগেছে। কোন্ শিক্ষাপদ্ধতি কতখানি উপযোগী ও মনোবিজ্ঞান-সম্মত তা বিচারবিশ্লেষণের দিন এসেছে। শিক্ষাবিজ্ঞানের দায়িত্ব হল শিক্ষা-পদ্ধতির বিচারবিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। দেখা যায় শিক্ষা-পদ্ধতি একটি সহায়ক মাত্র। তাই সহায়ক হিসাবেই এর উপযোগিতা আছে। যে সব পদ্ধতি বা শিখন-প্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—কিণ্ডারগার্টেন, মন্তেসরী পদ্ধতি। এ'ছাড়া ডাল্টন পরিকল্পনা, প্রাজেক্ট পদ্ধতি, উইনেট্‌কা পরিকল্পনা, ডেক্রলী পদ্ধতি, বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। শিখনের ক্ষেত্রে এদের উপযোগিতা আছে সত্য কিন্তু এই সব পদ্ধতি অবলম্বন করলেই যে শিক্ষণ সম্পূর্ণ সার্থক হবে এমন কোনো অর্থ নেই। যে সব শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র গড়ে উঠেছে তার মধ্যে শিক্ষণকে নৈপুণ্যের দিক থেকেই বিচার করা হয় এবং সেই সব নৈপুণ্য কিভাবে অর্জিত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাম্প্রতিক কালে শিক্ষকের এই নৈপুণ্য কিভাবে অর্জিত হতে পারে ও কি কি নৈপুণ্যের অভাব ঘটেছে সে বিষয়ে চেতনা জাগাবার জন্য অণু-শিক্ষণ পদ্ধতির উদ্ভাবনা করা হয়েছে। ইংরাজীতে একে বলা হয় micro-teaching. অবশ্য এই অনু-শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষকদের শিখন-নৈপুণ্য সম্পর্কে সচেতন করে দেবার জন্য, সরাসরি শ্রেণীপাঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য নয়। অনেক সময় একটি সমস্যা শিক্ষককে বিভ্রান্ত করে, সে সমস্যাটি হল পদ্ধতি নির্বাচনের সমস্যা। কোন্ পদ্ধতি কোথায় উপযোগী হবে তার নির্ধারণ করতে গেলে কয়েকটি বিষয়ের বিচার করে দেখতে হবে।

(ক) শিক্ষার্থীদের মানসিক শক্তি ;

(খ) শিক্ষাগত পরিবেশ, শ্রেণীর আয়তন ইত্যাদি ;

(গ) বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য ;

(ঘ) বিষয়বস্তু উপস্থাপনের উদ্দেশ্য ;

(ঙ) শিখনের সরঞ্জাম।

মোট কথা, সব দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষাপ্রণালী বা শিক্ষাপদ্ধতিকে নির্বাচিত করতে হবে। সহজ কথায় বলা যেতে পারে যে, শিক্ষণের জন্যই শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষাপদ্ধতির জন্য শিক্ষণ নয়।

শেখা ও শেখানো

আমরা কি ভাবে শিখি, শেখার মধ্যে কি কি মানসিক প্রক্রিয়া নিহিত আছে তা বিস্তারিত ভাবে না জানলে শেখানো কার্যকরী হয় না। শিক্ষকের কাজ হল শেখার কাজে সহায়তা করা। যেমন—

(ক) শিক্ষার্থীরা নতুন বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পারে।

(খ) বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে যে কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে।

(গ) যে কোনো সমস্যার অভিমুখী হয়ে তার সমাধান খুঁজতে পারে।

এইভাবে শিক্ষার্থীর মনের প্রস্তুতি আনতে না পারলে শেখানোর কাজও অসম্পূর্ণ থাকে। তাই এ'বিষয়ে আলোচনার অবকাশ আছে।

শেখানোর নানা দিক আছে। শিখতে গেলে প্রথমে চাই আমাদের মানসিক প্রস্তুতি, চাই আগ্রহ। আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা অনীহা দেখা দিয়েছে। কোনো কিছুই যেন তাদের আকর্ষণ করে না। তাই এবিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীর মনকে উদ্দীপিত করতে না পারলে শেখা ও শেখানো দুটি কাজই অসম্পূর্ণ থাকবে।

এর পরের পর্যায়ে আসে সন্দীপন অর্থাৎ একটি বিষয়ের ওপর নানাভাবে আলোকপাত করতে শেখা। আর তা করতে হলে চাই নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষে সহায়তা করা। একই বিষয়কে নানাভাবে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শেখা ও শেখানোর মধ্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে। কারণ তার ফলে বিষয়-বস্তু সরস ও উপভোগ্য হয়। শিখনের কাজে শিক্ষকের এটাই হচ্ছে বড় সম্পদ।

হিলগার্ডের (Hilgard) মতে শিখননীতির দুটি ভাগ আছে। একটি হল অনুসঙ্গ পদ্ধতির মাধ্যমে, অপরটি সামগ্রিকতাকে ভিত্তি করে। প্রত্যেকেরই বিশেষ সার্থকতা আছে। তাই পরিস্থিতি অনুসারে এদের প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। অনেক সময় উভয় নীতিরই সমন্বয় সাধন করলে সুফল ফলে। দেখা যায় শিক্ষার উন্নত স্তরে যে মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে তা মূলতঃ অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে (insightful learning) সাধিত হয়।

শিক্ষায় সমগ্রতাবাদের মূল কথা হল প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তু আমাদের সামনে এক সামগ্রিক রূপ নিয়ে আসে। তাই সম্পূর্ণ বিষয়কে একসঙ্গে দেখলে তার সামগ্রিক রূপ আমাদের সামনে ধরা পড়ে। ইংরাজীতে একে বলা হয় field theory অর্থাৎ কোনো বস্তুর প্রত্যক্ষণ তার পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই সমগ্রতাবাদ প্রয়োগ করতে গিয়ে তাঁরা শিখন পরিস্থিতিকে একটি ঘেরা মাঠের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই মাঠের বিভিন্ন অংশগুলি— (ক) বিভিন্ন উদ্দীপকের অবস্থিতি ; (খ) ঐ সব উদ্দীপকের অর্থপূর্ণ সমন্বয় (Meaningpul organisation of those stimuli), (গ) শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া যা শিখন পরিস্থিতি এবং শিক্ষার্থী উভয়ের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে, (ঘ) শিক্ষার্থীর পরিবর্তনশীল প্রকৃতি।

এই অংশগুলি পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল এবং শিখনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। তাই শিক্ষকের কর্তব্য হবে সমগ্র পরিস্থিতির ভারসাম্য বজায় রেখে শিখনের দ্বারা শিক্ষার্থীর আচরণে পরিবর্তন আনা। এই মতবাদ অনুযায়ী পরিবেশে পরিবর্তনশীল এবং ক্রিয়াশীল পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে শিক্ষার্থীর আচরণে সংগঠন বা পুনঃসংগঠন সাধিত হয়, আর তাই হল শিখন। কারণ আচরণের এই পরিবর্তন শিখনেরই ফলশ্রুতি। তাই দেখা যায় শিখন প্রক্রিয়া এগিয়ে চলে একটি নির্দিষ্ট পথ বেয়ে। সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রে যে কয়েকটি অংশ বা দিক তুলে ধরা হল তাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার চক্রাকারে শিখনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। সমগ্রতাবাদে উদ্দীপক এবং অন্যান্য অংশের মধ্যে সমন্বয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই মতবাদ ও গেস্টাল্ট মতবাদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। কারণ শিখন-প্রক্রিয়া পরিস্থিতির বিশেষ অংশের ওপর নির্ভর করে না, তার সমগ্র পরিস্থিতির প্রতি প্রতিক্রিয়ার দ্বারা নির্ণীত হয়—এই তথ্য উভয় মতবাদই তুলে ধরেছে।

গেস্টাল্ট মতবাদের তাৎপর্য শিক্ষাক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। কারণ এই মতবাদ অনুযায়ী শিখনের জন্য পরিস্থিতির সর্বাঙ্গীণ সম্পর্ক পর্যবেক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বাস্তবক্ষেত্রেও দেখা যায় যে শিখন একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। যে কোনো সমস্যামূলক পরিস্থিতির সামগ্রিক উপলব্ধি না হলে শিখন সম্পূর্ণ হয় না। অবশ্য এই উপলব্ধি এবং অন্তর্দৃষ্টি আকস্মিকভাবেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত হয়। অন্তর্দৃষ্টি শিখনের মূল কথা এবং অন্তর্দৃষ্টির জন্য সামান্যীকরণ ও পৃথকীকরণ এই দুই প্রক্রিয়ারই প্রয়োজন। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তাকে কাজে লাগাতে হলে পৃথকীকরণ এবং সামান্যীকরণ দুই-এরই প্রয়োজন আছে। শিক্ষার্থী সমস্যা সমাধানের জন্য পরিস্থিতির সম্পূর্ণ অংশকে বিশ্লেষণ করে তার থেকে সমধর্মী গুণকে গ্রহণ করে এবং ফলে তার সমাধানের ইঙ্গিত খুঁজে পায়। এই অন্তর্দৃষ্টির

প্রকাশ ও বিকাশই গেস্টাল্ট মতবাদের মূল কথা। গেস্টাল্ট মনোবিদ্‌গণের মতে শিক্ষণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছেঃ (১) পরিবর্তিত প্রত্যক্ষণ; (২) উন্নততর প্রতিক্রিয়া সম্পাদন; (৩) উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়া এই দুই-এর পৃথকীকরণ; (৪) উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সমন্বয়; (৫) একটি সামগ্রিক বোধ। দেখা যায় ধাপে ধাপে শিক্ষার্থী সামগ্রিক বোধের দিকে এগিয়ে যায় এবং ফলে তার শিখন সম্পূর্ণ হয়।

শিক্ষাবিজ্ঞান শিখনের এই মতবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। আজ বিদ্যালয়ের শিখনের ক্ষেত্রেও এই মতবাদ প্রত্যক্ষভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে। কারণ পাঠদানের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে সমস্যা বা বিষয়বস্তুকে সামগ্রিক এবং অর্থপূর্ণভাবে তুলে ধরে শিখনের কাজকে সহজ ও সম্পূর্ণ করতে পারেন। এমন অভিজ্ঞতা তাঁদের এই মতবাদের প্রতি আস্থা জন্মিয়ে দিয়েছে। ফলে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের মতে সমগ্র থেকে অংশের দিকে এবং মূর্ত থেকে বিমূর্তের দিকে এগিয়ে গেলে শেখা ও শেখানো সহজ হয়। তাই শিক্ষকের কাজ হবে সমস্যা-মূলক পরিস্থিতির অংশগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষের জন্য অনুকূল শিক্ষাপরিবেশ রচনা করা।

সমগ্রতাবাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে সক্রিয়তা ও আগ্রহ সঞ্চার করা। এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষার্থী নিজেও শিখন পরিস্থিতির একটি সক্রিয় অংশ বা অঙ্গ। তাই শিক্ষার্থীর দৃষ্টিকে সমস্যার দিকে ফেরানো এবং সপ্রতিভ করা শিক্ষকের কাজ। যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমস্যা বা বিষয়বস্তু আয়ত্তে না আসছে ততক্ষণ শিক্ষক বিষয়বস্তুকে নানাভাবে জীবনের পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করে উপস্থাপিত করবেন। বিকাশের প্রক্রিয়া হিসাবে শিখনকে দেখলে সামান্যীকরণ ও পৃথকীকরণের শিক্ষাগত তাৎপর্য ধরা পড়বে। শুধু তাই নয় শিখন সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শিখনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করেছে। বিশেষ করে অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের (insightful learning) তাৎপর্যকে তুলে ধরে শিখনের প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করাই এদের উদ্দেশ্য। কিন্তু দেখা যায় যে, এই অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্কে ধারণা এদের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। মনে হয় যে, থর্নডাইকের (Thorndike) শিক্ষানীতি যে trial and error পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছে তার সঙ্গে

মূলগত পার্থক্য insightful learning-এর নেই। কারণ প্রয়াসের মাধ্যমে ভুল করতে করতে যখন শিক্ষার্থী সমস্যার সমাধান খুঁজতে থাকে তখনই হঠাৎ এই অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ ঘটে। কাজেই অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ ভুল ও প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিমাত্র। শিখনের ক্ষেত্রে তাই উভয়েরই সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়।

এছাড়া লিউইন (Lewin) ও টলম্যান (Tolman) শিখন সম্পর্কে যে তত্ত্ব ও মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন শিক্ষাক্ষেত্রে তারও উপযোগিতা আছে। লিউইনের মতো টলম্যানও বলেছেন যে, মানুষের আচরণ উদ্দেশ্যাভিমুখী। সে যা করে তার মূলে থাকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য। অবশ্য টলম্যান চিহ্নের (sign) ওপর জোর দিয়ে বলেছেন যে কোনো উদ্দীপক ব্যক্তির প্রত্যক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত হয়। আর কোনো উদ্দীপক বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছুতে সহায়তা করবে কিনা তা বিবেচনা করেই মানুষ প্রত্যক্ষণের কাজ শুরু করে। কাজেই তাঁর মতে শিক্ষণ হল উদ্দীপকের চিহ্ন নির্ণয় করা। এই তত্ত্ব অনুযায়ী উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথেই শিখন শুরু হয়। শিক্ষার্থী উদ্দীপকের চিহ্ন এবং লক্ষ্য এই দুটি অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তার আচরণকে লক্ষ্যে পৌঁছুনোর প্রত্যাশা নিয়ে নির্ধারিত করে। টলম্যানের এই তত্ত্ব শিক্ষার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ শ্রেণীপাঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষককে প্রথমতঃ শিখনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং শিক্ষার্থীরা যাতে সেই উদ্দেশ্যকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে সেদিকে শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে। এই কারণে শিখন পরিস্থিতির উদ্দীপক সামগ্রী এমনভাবে উপস্থাপনা করা প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীরা সহজে উদ্দেশ্যকে প্রত্যক্ষ করে তার সঙ্গে উদ্দীপক-পরিস্থিতির সমন্বয় সাধন করতে পারে।

শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনার অবসর থাকলেও শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সব তত্ত্বের বিশেষ তাৎপর্য আছে তার মধ্যেই বাস্তব কারণে আলোচনাকে সীমিত রাখা হয়েছে। এই তত্ত্বগুলির মূল বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেলেও তাদের মধ্যে কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দেখা যায় মানুষ নানাভাবে শেখে। কোন শিখন-পদ্ধতি কোন ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী হবে তা নির্ভর করে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি, পরিস্থিতি এবং মানসিক অবস্থার ওপর। শিক্ষার্থী নানাভাবে শেখে—কখনও অনুবর্তন বা অনুশীলনের দ্বারা, কখনও বা অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা। তাই কোন পদ্ধতি শিক্ষার কোন পরিস্থিতিতে কার্যকরী হবে তা নির্ভর করবে সামগ্রিক মূল্যায়নের ওপর। আর এই

মূল্যায়নের দায়িত্ব হল শিক্ষকের। অনেক সময় দেখা যায় যে একটি পদ্ধতির পরিবর্তে কয়েকটি পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করলে লক্ষ্যের দিকে এগোনো সহজ নয়। সেই সব ক্ষেত্রে পদ্ধতিকে বড় করে না দেখে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে শিক্ষককে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছুতে হবে।

৩। শিখনের তত্ত্বাবলী

শিখনের তত্ত্বাবলী বিশ্লেষণ করার আগে সেগুলি সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা তুলে ধবার সার্থকতা আছে। একথা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, শিখন প্রক্রিয়া একটি জটিল প্রক্রিয়া। শিখন বলতে আমরা বুঝি আচরণ-পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার প্রকৃতি কি সে সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ আছে। দেখা যায় যে, ব্যক্তিসত্তা পরিবেশের সংগে সংগতি রাখার জন্য তার আচরণের পরিবর্তন আনে। এই আচরণ বলতে সামগ্রিক আচরণকে বোঝায়। তার মধ্যে আছে চিন্তন, অনুভবন ও ক্রিয়া। আচরণের প্রকাশের পেছনে চিন্তন, অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। কখনও কখনও পরিবেশের প্রভাব আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। আবার কখনও ব্যক্তিজীবনের অতীত অভিজ্ঞতা ও তাগিদ তার আচরণের পরিবর্তন আনে। তাই শিখন প্রক্রিয়া কখনও আত্মসক্রিয়তার ওপর নির্ভর করে আবার কখনও পরিবেশের দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তিজীবনে পরিবেশের সংগে অভিযোজনের তাগিদ শিখন-প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করে। অপরদিকে অন্তর্জগতের তাগিদ ও প্রেষণার (motivation) সঞ্চার করে। এই প্রেষণার সঞ্চারের ভিন্ন ভিন্ন উপায় সম্পর্কে গবেষণা চলেছে। কোন্ উদ্দীপক কোন্ পরিস্থিতিতে প্রেষণা সঞ্চারে বিশেষ কার্যকরী হবে সে সম্পর্কে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে।

শিখন একটি প্রক্রিয়া, তাই এর মধ্যে একটি বিকাশের ধারা লক্ষ্য করা যায়। এই বিকাশের ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা কখনও জ্ঞান, কখনও দক্ষতা, কখনও বা আচণের পরিবর্তন অর্জন করি। তাই লক্ষ্যের দিকে শিখন-প্রক্রিয়াকে উদ্দিষ্ট করতে হবে। এখানেই শিক্ষকের ভূমিকা। কখনও অনুশীলনের দ্বারা, আবার কখনও শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদার ভিত্তিতে তাদের মধ্যে প্রেষণা সঞ্চার করে শিখন-প্রক্রিয়াকে পরিণতির পথে নিয়ে যাওয়া যায়। মোট কথা, সব আচরণের

পরিবর্তনই শিখন নয়। ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য যে মানসিকতার ও আচরণের প্রয়োজন সেটাই শিখনের উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে পরিণমন (maturation)-এর কথা উল্লেখ করা যায়। কারণ পরিণমনের ফলেও আচরণের পরিবর্তন আসে। কিন্তু সেখানে কোনো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না যেহেতু পরিণমন স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু শিখন একটি সক্রিয় পদ্ধতি, তা চেষ্টাপ্রসূত ও অনুশীলন-সাপেক্ষ। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিখন-প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে (ক) ব্যক্তির আত্ম-সক্রিয়তা, (খ) উদ্দীপক ও প্রেষণার পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল, (গ) আচরণের পরিবর্তন, (ঘ) ক্রমপরিবর্তনশীলতা, এবং (ঙ) প্রশিক্ষণ বা অনুরূপ কোনো কৃত্রিম আয়োজন।

শিখনের প্রকারভেদ

শিখন-প্রক্রিয়া সামগ্রিক হলেও শিখনের ক্ষেত্রকে কয়েকটি শ্রেণী বা পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যেমন, (এক) ইন্দ্রিয় ও চালক-যন্ত্রের সমন্বয়মূলক দক্ষতা (Sensorimator skills), (দুই) প্রত্যক্ষণ ও চালক-যন্ত্রের সমন্বয়মূলক দক্ষতা (Perceptual motor skill), (তিন) প্রত্যক্ষমূলক শিখন (Perceptual Learning), (চার) সংযোগমূলক শিখন (Associational Learning), (পাঁচ) ধারণামূলক শিখন (Conceptual Learning), (ছয়) আদর্শের শিখন (Learning of Ideals), (সাত) সমস্যা সমাধানের শিখন (Problems solving Learning) বিভিন্ন প্রকার শিখনের বিশ্লেষণের ফলে একটা সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছাতে পারি তা হল যে শিখন সরল যান্ত্রিক দক্ষতা অর্জন থেকে শুরু করে জটিল সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত। শিখনের জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। আর সেই স্তর অনুযায়ী মানুষ জীবনের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি থেকে শিক্ষার উপাদান সংগ্রহ করে। কতকগুলি পর্যায়ে শিখন যান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করে আবার কয়েকটি পর্যায়ে উন্নততর মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটে। প্রত্যক্ষণমূলক শিখন থেকে শুরু করে আদর্শের শিখন পর্যন্ত বিশেষ বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

শিখনের ক্ষেত্রে যে সব তত্ত্ব নির্ধারিত হয়েছে তাদের মধ্যে সংযোগমূলক তত্ত্ব ও সংযোজনবাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হবস্ (Hobbes), লক

(Locke), হিউম (Hume), হার্টলে (Hartely) প্রভৃতি মনোবিদ্‌রা শিখনকে কেবলমাত্র ধারণার সংযোগের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এই ধরনের সংযোগের তত্ত্বকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—(১) সংযোজনবাদ (Connectionism) ও (২) অনুবর্তন (Conditioning)। সংযোজনবাদ শিখনের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের সঙ্গে একটি প্রতিক্রিয়ার বন্ধন বা সংযোজনকে প্রাধান্য দেয়। অর্থাৎ এই মতবাদ অনুযায়ী উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপনই হল শিখন। ব্যাপক অর্থে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে আচরণধারার নিয়ন্ত্রণ করাই শিখনের কাজ। শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই মতবাদের বিশেষ তাৎপর্য আছে, কারণ শিক্ষায় কি ধরনের উদ্দীপক সৃষ্টি করা যায় এবং তার প্রতিক্রিয়া কি কি রূপ ধারণ করে তা জানলে শিক্ষকের শ্রেণীপাঠন সমৃদ্ধ হতে পারে। থর্নডাইক এই উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার বন্ধনকে স্নায়বিক বোধশক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। তাঁর শিখন সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে তিনটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। একটি হল, শিখনের পদ্ধতি জটিল। ফলে শিখন প্রক্রিয়ার মধ্যে চিন্তন, যুক্তি, অনুকরণ কোনো কিছুই অপরিহার্য নয়; বরং প্রত্যক্ষভাবে কোনো সমস্যার সমাধান ও খোঁজা স্বাভাবিক হয়। থর্নডাইকের মতে সমস্যার সমাধানের পথে অপ্রয়োজনীয় প্রচেষ্টাগুলি ধীরে ধীরে বর্জিত হয় এবং প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টাগুলি গৃহীত হতে থাকে। এইভাবে আত্মপ্রচেষ্টায় ভুল পথগুলি ত্যাগ করে সঠিক পথ নির্বাচনের মাধ্যমে যে শিখন হয় তাকে থর্নডাইক একটি বিশিষ্ট নাম দিয়েছেন। ইংরাজীতে তাকে বলা হয় Trial and error Learning. শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিখনের এই নীতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষককে সচেতন থাকতে হবে তারপর এই প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু নির্বাচনের দায়িত্ব শিক্ষককে নিতে হবে। শিখনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া সংযোগের সমন্বয় হয়। নির্বাচিত বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করে এই সংযোগের সম্ভাবনাকে প্রসারিত করাই শিক্ষকের অন্যতম কর্তব্য। এ' ছাড়া শিখনকে সার্থক করতে হলে পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্তমান-সমস্যা সমাধানের দিকে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াও শিক্ষকের দায়িত্ব।

শিখনের সূত্রাবলী (Laws of Learing)

শিখনের ক্ষেত্রে থর্নডাইক যে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তার থেকে তিনি কয়েকটি সিদ্ধান্তে এসে পেঁাছেছেন এবং সেই সিদ্ধান্তগুলিকে কয়েকটি সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। ঐগুলিকে বলা হয় শিখনের সূত্র। প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতিতে শেখার (Learning by trial and error) কারণগুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি আটটি সূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে তিনটি মূল সূত্র। (১) ফললাভের সূত্র (Laws of Effect , (২) অনুশীলনের সূত্র (Laws of Exercise), (৩) প্রস্তুতির সূত্র (Laws of Readiness).

(১) ফললাভের সূত্র

শিখন নির্ভর করে কি ধরনের ফল লাভ হয় তার ওপর। উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়াব পরিবর্তনীয় সংযোগের মাধ্যমে যদি সুখকর বা তৃপ্তিদায়ক ফল পাওয়া যায় তবে ঐ সম্পর্ক দৃঢ়বন্ধ হয়। আর যদি ঐ সংযোগের মাধ্যমে বিরক্তিকর ফল পাওয়া যায় তবে ঐ সম্পর্কের বন্ধন শিথিল হয়। পরিবর্তনীয় সংযোগ বলতে থর্নডাইক যে সংযোগের কথা বলেছেন, শিখনেব দ্বারা তার সংস্কার করা যায়। অবশ্য তৃপ্তিদায়ক বা বিরক্তিকর অবস্থা আংশিক ভাবে প্রাণীর প্রচেষ্টার ওপর নির্ভরশীল।

(২) অনুশীলনের সূত্র

থর্নডাইকের মতে ফলই একমাত্র শিখনের শর্ত নয়। অবশ্য ফলের ওপর শিখন যেমন নির্ভরশীল, তেমনি নির্ভরশীল প্রচেষ্টার ওপর। শিখনকে দৃঢ় করতে হলে অনুশীলনের সহায়তা নিতে হবে। বারংবার চর্চার ফলে সংযোগের শক্তি বাড়ে, আবার তেমনি অনুশীলন বা চর্চার অভাবে এই সংযোগ বা বন্ধন ক্রমেই শিথিল হয়ে আসে। এই অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে অভ্যাসের ও অনভ্যাসের সূত্র প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু কেবল অনুশীলনের ওপরই এই বন্ধনের দৃঢ়তা বা শৈথিল্য নির্ভর করে না, অনুশীলনের চেয়ে ফলের ওপর বন্ধন বেশী নির্ভরশীল। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই অনুশীলনের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ জন্মাতে হবে ও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা যাতে তৃপ্তিদায়ক হয় সেই চেষ্টা করতে হবে।

(৩) **প্রস্তুতির সূত্র**

থর্নডাইক এর পর প্রস্তুতির সূত্রের কথা বলেছেন। তাঁর মতে শিখনের জন্য ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন প্রস্তুতির প্রয়োজন। তাঁর মতে কোনো উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সার্থক সম্বন্ধ স্থাপন করতে হলে দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে ব্যক্তির উন্মুখতার প্রয়োজন। ইংরাজীতে থর্নডাইক একে বলেছেন Law of Readiness. এই প্রসঙ্গে ঐ কথা মনে রাখার প্রয়োজন যে, উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় স্নায়ুতন্তু তার মাধ্যম রূপে কাজ করে। তাই এই স্নায়ুতন্তুর উত্তেজনা বহন করবার প্রস্তুতির ওপর শিখন নির্ভরশীল।

এই তিনটি মূল সূত্র ছাড়া আরও কয়েকটি গৌণ সূত্রের কথা বলা হয়েছে। অবশ্য এরা এই মূল সূত্রগুলিরই অংশ বা ভিন্ন ভিন্ন দিক।

যখন মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণী কোনো নতুন পরিস্থিতির বা সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন সে তার সমাধানের জন্য সব রকম উপায় উদ্ভাবন করে। কি উপায়ে বা কোন প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সমস্যার সমাধান হবে তা অজানা থাকায় তার আচরণের মধ্যে বহুমুখী প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়। মানুষের মধ্যে এই বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার শক্তি নিহিত আছে। থর্নডাইক শিখনের এই রীতিকে বলেছেন বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Laws of multiple response). অবশ্য এর সঙ্গে প্রচেষ্টা-ভুল (Trial and error) পদ্ধতির বিশেষ পার্থক্য নেই।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা যথেষ্ট। শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে নানা পথে সমাধানের লক্ষ্যের দিকে এগোবে এটাই শিক্ষাবিজ্ঞান-সম্মত। কারণ তা না হলে শিখনের পরিণতি আসে না। তাই শিক্ষকের কাজ হল সরাসরি সমাধান সম্পর্কে নির্দেশ না দিয়ে শিক্ষার্থীদের সমাধানের ভিন্ন পথ সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া।

এমনি আর একটি গৌণ শিখন-সূত্রের কথা থর্নডাইক উল্লেখ করেছেন। তিনি তার নাম দিয়েছেন, মানসিক অবস্থার সূত্র (Laws of mental set, attitude or disposition). অর্থাৎ মানুষের শিখন কেবল দৈহিক প্রস্তুতির ওপর নির্ভর করে না. মানসিক প্রস্তুতি শিখনের প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এই সূত্রটি গৌণ বলে অভিহিত হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে এর বিশেষ তাৎপর্য

আছে। কারণ আজ প্রেষণা নিয়ে যে গবেষণা চলেছে তার মূলে আছে এই সত্য। কিভাবে মানসিক প্রস্তুতি আনা যায়, কি উপায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণা বা উদ্দীপনা সঞ্চার করা যায় তা নিয়ে আলোচনা ও গবেষণার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকার ফলে সকলেই একই ভাবে অনুপ্রেরিত হয় না। এক এক রকম উদ্দীপক যেমন একই শিক্ষার্থীর মধ্যে এক এক রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তেমনি একই উদ্দীপক ভিন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। শিক্ষকদের মধ্যে এই সম্পর্কে যথেষ্ট পরীক্ষানিরীক্ষার (action-research) অবকাশ আছে।

থর্নডাইকের আর একটি গৌণ সূত্র, আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Laws of partial activity) বলে অভিহিত। এই সূত্রের মূল কথা হল সামগ্রিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রাণীদের প্রতিক্রিয়া নির্ধারিত হয় না। ভিন্ন ভিন্ন অংশ পৃথকভাবে প্রত্যক্ষ করে এবং অংশবিশেষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রাণীরা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এর ফলে শিখনের জন্য শক্তির অপচয় কমে আসে। কারণ সবসময় অর্জিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা প্রয়োগের ফলে সম্পূর্ণ অবস্থার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয় না।

আর যে দুটি গৌণ সূত্রের কথা থর্নডাইক উল্লেখ করেছেন তারা যথাক্রমে আত্মীকরণ বা উপমানের সূত্র (Laws of assimilation or analogy) এবং অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র (Laws of associatve shifting). আত্মীকরণ বা উপমানের সূত্রে এই কথাই বলা হয়েছে যে, যখন আমাদের একটি পরিস্থিতিতে অভিযোজন করার মতো প্রতিক্রিয়া জানা থাকে না তখন সেই অবস্থার সঙ্গে সাদৃশ্য বা আংশিক মিল খুঁজে বার করে আমরা প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ নির্ধারণ করি। সদৃশ অবস্থায় যেরূপ প্রতিক্রিয়া করেছিলাম, অনুরূপ প্রতিক্রিয়া বর্তমান পরিস্থিতিতেও করে থাকি। এইরূপ আচরণ বা প্রবণতা মানুষের মধ্যে বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায়, আর তার ওপর ভিত্তি করে এই সূত্রের প্রবর্তন। শিক্ষাক্ষেত্রে এই শিখন সূত্রের পর্যাপ্ত প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যখন কোনো নতুন পাঠ্যবিষয় বা কোনো গণিত বা বিজ্ঞানের সমস্যা শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত হয় তখন তাদের পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে অনুরূপ অবস্থায় কি প্রতিক্রিয়া করেছিল তা খুঁজে বার করতে বলা হয়। এইভাবে তারা জানা থেকে অজানার দিকে এগিয়ে যায়, অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন শিখনের পথ প্রস্তুত করে।

গোণ সূত্রগুলির মধ্যে অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্রটি সর্বশেষ হলেও তাৎপর্যের দিক থেকে তার মূল্য কম নয়। শিখনের সময় উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সংযোগ স্থাপিত হয় তার একটি বিশেষ প্রকৃতি বা স্বরূপ লক্ষ্য করা যায়। একটি উদ্দীপকের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে যুক্ত কোনো প্রতিক্রিয়াকে অন্য উদ্দীপকের সঙ্গেও সংযোজিত করা যেতে পারে। এই প্রতিক্রিয়াকে মনস্তাত্ত্বিকগণ অনুবর্তন বলেছেন, এই অনুবর্তনের ফলেই মানুষ এক পরিস্থিতিতে যে সব অভ্যাস, অনুরাগ বা মানসিকতা অর্জন করে তা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে শেখে। তাই মানুষের এই মানসিক শক্তির প্রতি সচেতন হয়ে থর্নডাইক সঞ্চালনের সূত্রটির প্রতিষ্ঠা করেছেন।

থর্নডাইকের শিখন-সূত্রাবলী ও শিক্ষাবিজ্ঞান

শিক্ষার ক্ষেত্রে থর্নডাইকের শিখন-তত্ত্ব ও শিখন-সূত্রাবলীর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই সূত্রাবলীর বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনাও তুলে ধরা হয়েছে। অনেক মনোবিজ্ঞানীদের মতে থর্নডাইকের শিখন-সূত্র পূর্ণাঙ্গ নয়, বরঞ্চ আংশিক সত্যকে তুলে ধরার ফলে সূত্রগুলি ত্রুটিপূর্ণ রয়ে গেছে। কোথাও কোথাও কৃত্রিমতা, কোথাও বা অসম্পূর্ণতা এই সূত্রগুলিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে নি। যেমন তাঁর সংযোজনবাদের মূলে আছে একটি আংশিক সত্য। কারণ উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার বন্ধন বলতে তিনি কেবল স্নায়বিক বন্ধনের কথাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ'বিষয়ে মতভেদ আছে। ল্যাসলে (Lashley) বা মনোবিদ্ গেট্স্ (Gates) সংযোজনবাদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন, উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক নিছক শরীর-বৃত্তীয় সম্পর্ক নয়। তাছাড়া থর্নডাইকের ফললাভের সূত্রের বিরুদ্ধেও অনেক সমালোচনা হয়েছে। অনেকের মতে শিখন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সার্থক সংযোগের ফলশ্রুতি। কিন্তু সব সময় শিখন ফলের ওপর নির্ভরশীল নয়। যেমন মনোবিদ টলম্যান (Tolman) লক্ষ্য করলেন যে বাইরে খাবার না দিলেও পাজ্ল বক্সের (puzzle box) মধ্যে ইঁদুরের শিখন হয়। তাঁর মতে পুরস্কার ছাড়াই আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে সুপ্ত শিখন সম্ভব। মোট কথা কেবলমাত্র ফললাভের দ্বারাই শিখনের পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ শিখন একটি সামগ্রিক জটিল প্রক্রিয়া এবং তা নির্ভর করে

চেতন ও অবচেতন মনের অবস্থার ওপর। এই সব সমালোচনা সত্ত্বেও থর্নডাইকের ফললাভের সূত্রের তাৎপর্যকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা যায় না। কারণ বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করা যায় যে তৃপ্তি, সাফল্য, পুরস্কার ইত্যাদি ফল শিখনকে সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলে। কি পাঠ্যবস্তু কি তার উপস্থাপন ; যদি শিক্ষাথীরা তৃপ্তি পায়, যদি শিখনের ফলে আনন্দের সন্ধান মেলে তবে তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাই শিখবে। এই ফলাফলের সূত্রটির প্রয়োগ করলে আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠন অনেক পরিমাণে সমৃদ্ধ হতে পারে। পাঠ্যবিষয়গুলি যদি শিক্ষাথীদের কাছে উপভোগ্য হয় এবং যদি সেগুলি কাঠিন্যের ক্রমানুসারে বিন্যস্ত হয়, বিষয়বস্তুর উপস্থাপন ও শিক্ষকের শিক্ষণ-পদ্ধতিকেও থর্নডাইকের শিখন-সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সার্থক করে তোলা যায়। যেমন শিক্ষাথীদের মধ্যে অনুশীলনের পদ্ধতি জাগিয়ে দেওয়া এবং বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের গুণে তাদের মধ্যে কৌতূহল ও আগ্রহ সঞ্চার করা বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতির মাধ্যমে সম্ভবপর। সহজ সমস্যা দিয়ে শুরু করে ধীরে ধীরে কঠিন সমস্যা উপস্থাপন করলে বা বিষয়বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার উৎসাহ দিলে শিখন পূর্ণাঙ্গ হয়। তাদের শিখনের সাফল্যকে প্রশংসা, পুরস্কার ও অনুরূপ কোনো অভিজ্ঞান দিয়ে উৎসাহিত করলে শিক্ষাথীদের মধ্যে সাফল্যের স্পৃহা বেড়ে যায়। এইভাবে থর্নডাইকের ফললাভের সূত্রকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে শ্রেণীপাঠনকে সার্থক করে তোলা যায়।

অনুশীলন সূত্রের মূল কথা হল অনুশীলন বা অভ্যাস শিখনকে পরিণতি দেয়—তাকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলে। কারণ অনুশীলনের ফলে শিখন বা নতুন প্রতিক্রিয়া মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়। অবশ্য যান্ত্রিক ভাবে অনুশীলনের বিশেষ কোনো সার্থকতা নেই তাই নতুন আচরণের অনুশীলন প্রয়োগের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানকে ভিন্ন ভিন্ন জীবন পরিবেশের প্রয়োগের ভেতর দিয়ে শিক্ষাথীদের মধ্যে অনুশীলন বা চর্চা করার আগ্রহ সঞ্চার করতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রয়োগমূলক কাজের মধ্য দিয়ে চর্চার সুযোগ করে দিলে শিখন সার্থক ও ফলপ্রসূ হয়।

প্রস্তুতির সূত্রের প্রসঙ্গে এই কথা বলা যায় যে, শিক্ষাথীদের মধ্যে যে ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করা যায় সেই অনুযায়ী তাদের দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি আসে। তবে সেই স্বাভাবিক পরিণমনের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে উপযুক্ত শিক্ষা-পরিবেশ ও আয়োজনের মাধ্যমে এই প্রস্তুতিকে ত্বরান্বিত

করা বোধ হয় বাঞ্ছনীয় হবে। শিক্ষকের কাজ হবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর শক্তি, সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুযায়ী জীবনের প্রস্তুতির পথে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

৪। শিখন ও শিখনের তাৎপর্য

শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা ব্যাপকতর। কিভাবে শিখন-প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করা যায়, কিভাবে শিখনের (ব্যক্তিগত) শর্তাবলীর প্রয়োগসাধন করা যায়, তার জন্যে বিচারবিশ্লেষণের প্রয়োজন। শিখনের যে বিভিন্ন প্রকার আছে সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অনেকগুলি মানসিক প্রক্রিয়ার ফলে শিখন সম্ভবপর হয়। মানুষের শিখনের অনেকটা স্থান জুড়ে আছে বিভিন্ন বস্তুর ধারণা বা অভিজ্ঞতার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের শক্তি অর্জন। এই সংযোগ সাধন যতই সহজ হবে ততই শিখনের কাজ ত্বরান্বিত হবে। অভিজ্ঞতার মধ্যে সার্থক সংযোগ স্থাপন করতে পারলে শিখনের কাজ পরিণতি লাভ করে। এর পরে আর এক প্রকার শিখন আমাদের শ্রেণীপাঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। একে বলা হয় ধারণামূলক শিখন বা conceptual learning. সামগ্রিক ধারণার বিকাশ সাধনের ফলে বিষয়বস্তুকে উপলব্ধি করা সহজ হয়। শিক্ষকের দায়িত্ব হবে এই রকম সামগ্রিক ধারণার বিকাশ সাধন করা। এর ফলে যে কোনো পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী সার্থকভাবে অভিযোজন করতে শিখবে।

সংযোগমূলক শিখন ও ধারণামূলক শিখন ছাড়াও আদর্শের শিখন (learning of ideals) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ শিখনের দ্বারা আচরণের পরিবর্তন করতে হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আদর্শ গড়ে তুলতে হবে। আদর্শের শিখন মানুষের শিখনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপযোগী আদর্শ গড়ে তুলতে হলে শিক্ষককে সেই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যেতে হবে।

এর পরে আসে সমস্যা সমাধানের শিখনের প্রশ্ন। পরিবর্তনশীল পরিবেশে বিভিন্ন সমস্যা এসে পড়ে। আর সেই সব সমস্যার সমাধান খুঁজতে খুঁজতে আমরা জীবনের পথে এগিয়ে যাই। এই ভাবে আমাদের আচরণ-ধারায় পরিবর্তন আসে এবং তার ফলে শিখনের পথ প্রশস্ত হয়। বাধা অতিক্রম করে সমস্যার সমাধান খুঁজতে খুঁজতে যে অভিজ্ঞতা জন্মায় আর তার ফলে যে শিখন

ঘটে তাকে বলা হয় সমস্যা সমাধানের শিখন বা problem solving learning.

শিখনের যে সব তত্ত্ব একে একে সংযোজিত হয়েছে তার মধ্যে সংযোগমূলক তত্ত্বের বিশেষ তাৎপর্য আছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের প্রয়োগ যতই ব্যাপক হবে ততই শিক্ষার্থীর মনের প্রস্তুতি আসবে। থর্নডাইকের শিখনের যে সব সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তার শিক্ষাগত তাৎপর্য থাকলেও এই সূত্রগুলির সমালোচনার অবকাশ আছে। যে তিনটি সূত্র থর্নডাইক আবিষ্কার করেছিলেন তাদের মধ্যে আছে (ক) ফল লাভের সূত্র, (খ) অনুশীলনের সূত্র ও (গ) প্রস্তুতির সূত্র। সাধারণভাবে এই সূত্রগুলির উপযোগিতা থাকলেও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সেগুলি অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিযুক্ত। প্রাণী নিজে কাজ করে যে নতুন অভিজ্ঞতা আহরণ করে তাই শিক্ষার পক্ষে সহায়ক হয়। পুরস্কার অথবা ফল দরকার হয়। কারণ, তা নাহলে শিক্ষার্থীর কাজে উৎসাহ আসে না। কিন্তু প্রকৃত শিখন ঘটে তখনই যখন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সার্থক সংযোগ ঘটে। থর্নডাইক সংযোজনবাদের মূলে এক স্নায়বিক উপাদান ঘটিত ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। কারণ তাঁর মতে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার বন্ধন বলতে স্নায়বিক বন্ধনই বোঝায়। এই সংযোগের ফলে শিখন সম্পন্ন হয়। কিন্তু ল্যাসলে প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন যে এই ধরনের সংযোগ শিখনের সহায়ক হয় না। কারণ উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সম্পর্ক তা কেবল দেহভিত্তিক নয়। ফললাভের সূত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে অনেকে বলেন যে, থর্নডাইকের যে সূত্র তা অত্যন্ত স্থূল তত্ত্বকে তুলে ধরেছে। তাই তার দ্বারা জটিল শিখন-প্রক্রিয়ার পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। থর্নডাইকের শিক্ষাতত্ত্বের আধুনিক সমালোচকদের মধ্যে টলম্যানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে পুরস্কার ছাড়াই আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে সুপ্ত শিখন সম্ভব। এই আচরণের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা সম্ভব না হতে পারে কিন্তু একটি শিখনের প্রস্তুতি এনে তার একটি সোপান রচনা করে সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। এঁদের অনেকের মতে থর্নডাইকের ফলাফলের সূত্রের বিশেষ কোনো সার্থকতা নেই, কারণ আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর এই সূত্রকে সমর্থন করে না। দেখা যায় আমরা এমন অনেক জিনিসও শিখি যা আমাদের কাছে মোটেই আনন্দদায়ক নয় বা যা কোনো পুরস্কার বহন করে আনে না।

থর্নডাইকের আর একটি শিখন-তত্ত্ব অনুশীলনের সূত্রকে জন্ম দিয়েছে।

কিন্তু শিখন সম্পর্কে এই ধারণা মূলতঃ যান্ত্রিক। কারণ শিখনের জন্য যে মনোযোগ, আগ্রহ বা চাহিদার প্রয়োজন আছে তা থর্নডাইক স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন নি।

প্রস্তুতির সূত্রের মধ্যে কিছুটা সত্য থাকলেও তার সামগ্রিক মূল্য বা তাৎপর্য বেশী নেই। যে দৈহিক প্রস্তুতির কথা তিনি বলেছেন তার ওপর শিখন নির্ভর করে বটে কিন্তু তার চেয়ে আরও বেশী নির্ভর করে মানসিক প্রস্তুতির ওপর। এই সব সমালোচনার ফলে শিখনের সূত্রগুলির পরিমার্জন ও পরিবর্তন ঘটেছে। এই রূপান্তরের ফলে নানা নতুন চিন্তার সংযোজন ঘটায় থর্নডাইক যে সমগ্রতাবাদের প্রতিষ্ঠা করলেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইনি বললেন যে, কোনো উদ্দীপক তার পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। একে একে থর্নডাইকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পরে তিনি শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণার গুরুত্বের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন।

থর্নডাইক শিখনের যে সূত্রগুলি আবিষ্কার করেছিলেন তার যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে সত্য কিন্তু আজও তাদের কয়েকটি সূত্রের বিশেষ উপযোগিতা রয়ে গেছে। বিশেষ করে তাঁর ফললাভ ও অনুশীলনের সূত্র শ্রেণীর শিখনক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন। তাই শ্রেণীপাঠনে এই তত্ত্বগুলির উপযোগিতা ও যাথার্থ্য বিশ্লেষণ করা অসম্ভব নয়। এখানে কিভাবে শিখনের মূল তত্ত্বগুলির বাস্তবে রূপ দেওয়া যায় তার বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে।

মানুষের শিখন-প্রক্রিয়া এত জটিল যে প্রাণীজগতের ওপর পরীক্ষানিরীক্ষা করে যে শিখনতত্ত্বের আবিষ্কার হয়েছে তা মানুষের শিখনের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। দেখা যায় যে, কোনো একটি বিশেষ শিখনতত্ত্ব অনুসরণ না করে পরিস্থিতি অনুযায়ী এদের যথাযথ প্রয়োগ ও সমন্বয় করলে সুফল পাওয়া যায়। শিখনকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এর পরিণতি ঘটে। পর্যায়গুলি যথাক্রমে (ক) অভিমুখিতা (orientation), (খ) অভিজ্ঞতার অনুসন্ধান (exploration), (গ) সম্প্রসারণ (elaboration), (ঘ) পরিস্ফুটন (articulation), (ঙ) সরলীকরণ (simplification), (চ) স্বয়ংক্রিয় করণ (automatization) ও (ছ) পুনঃসংস্থাপন (re-orientation).

দেখা যায় প্রতিটি কাজের একটি উদ্দেশ্য আছে এবং সেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের

দিকে এগিয়ে যেতে গেলে বাধা অতিক্রম করতে হবে। এর জন্য চাই সমস্যাগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও অভিমুখিতা। শিক্ষার অনেক ক্ষেত্রে এই অভিমুখিতার অভাব ঘটে, তাই শিক্ষার কাজ সুষ্ঠু পরিণতি নেয় না। শিখনের এই প্রথম পর্যায় গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ওপর নির্ভর করে পরের পর্যায়গুলির পরিণতি। যে সব মনোবিজ্ঞানী শিখন-প্রক্রিয়ার ওপর গবেষণা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ওয়াসবার্ণ (Washburn), মেগ্রোথ (Megroth) ও ব্লেয়ার (Blair).

সার্থক শিখনের জন্য কতকগুলি শর্ত বা কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন। তাদের মধ্যে আছে (ক) সামগ্রিক ও আংশিক পদ্ধতি, (খ) সবিরাম ও অবিরাম পদ্ধতি, (গ) সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পদ্ধতি। প্রতিটি পদ্ধতির ক্ষেত্র-বিশেষে উপযোগিতা আছে। কিন্তু কোনো পদ্ধতিই এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। যখন কোনো বিষয়বস্তুর সামগ্রিক পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শিখন হয় তখন তাকে বলা হয় সামগ্রিক পদ্ধতি ; আর যখন তা ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিয়ে শেখানো হয় তখন বলা হয় আংশিক পদ্ধতি। অনেকের মতে সামগ্রিক পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাব সহজে পরিস্ফুট হয়। অবশ্য যারা স্বল্পবুদ্ধি তাদের ক্ষেত্রে সামগ্রিক পদ্ধতির থেকে আংশিক পদ্ধতি অধিক উপযোগী।

শিখনের সবিরাম ও অবিরাম পদ্ধতির প্রয়োগ করে দেখা গেছে অবিরাম পদ্ধতির (massed learning) চেয়ে সবিরাম পদ্ধতি (spaced learning) শিখনের সহায়ক। তাই সবিরাম পদ্ধতিতে শেখা সহজ হয় ; কারণ সেখানে মনোযোগ ধরে রাখার সমস্যা নেই, যে যার মনোযোগের পরিসর অনুযায়ী শিখতে পারে।

প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে শিখনের দুইটি ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে সক্রিয় শিখন শিখনের হারকে বাড়িয়ে তোলে। তাই শ্রেণীপাঠনের ক্ষেত্রে সক্রিয় পদ্ধতিকে কার্যকরী করার প্রচেষ্টা বিশেষ প্রয়োজন। এই পদ্ধতির উপযোগিতা যথেষ্ট বলেই শিক্ষার্থীদের নিজেদের এই পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন আছে। এর ফলে তারা নিজেদের ত্রুটি নিজেরাই বুঝতে পারে। পাঠ্যবিষয়ের কোথায় কঠিন, কোথায় বেশী মনোযোগ দেওয়া দরকার সে সম্পর্কেও ধারণা হয়। তাছাড়া শিখনের এই পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে তাদের যে অভিজ্ঞতা হয়, পরবর্তীকালে তা তাদের কাজে লাগে। মোট কথা, সক্রিয় শিখনের ফলে

শিক্ষার্থী সপ্রতিভ থাকে, ফলে শিক্ষাও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। তাই শিক্ষকদের এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে।

শিক্ষাবিজ্ঞানকে সার্থক করে তুলতে হলে শিক্ষকদের যথাযোগ্য নির্দেশনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। নির্দেশনার সময় শিক্ষক যে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেবেন তার মধ্যে নিম্নলিখিত পর্যায়ে অগ্রসর হলে ভালো হয়।—

ক) যথাযথ বিশ্লেষণের পর তার সর্বশেষ আচরণমূল্যে নির্ধারণ।

(খ) পরবর্তী পর্যায়ে বিষয়বস্তুর সামগ্রিক বা আংশিক পদ্ধতিতে উপস্থাপন।

(গ) তৃতীয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীর পাঠ্যবিষয়মুখী প্রতিক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ।

(ঘ) উপযুক্ত অনুশীলন নির্বাচন।

(ঙ) শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি ও ফল সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।

(চ) শিক্ষার্থীদের নিজেদের কাজের মূল্যায়ন সম্পর্কে সহায়তা করা।

৫। শিক্ষণপ্রণালী ও শিক্ষাবিজ্ঞান

কোনো বিষয়কে জানলেই তা ঠিকভাবে শেখানো যায় না। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের ওপরও অনেককিছু নির্ভর করে। তাছাড়া শিখন-প্রক্রিয়া জটিল। এক প্রাণ থেকে আর এক প্রাণে যে কোনো অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত করতে গেলে দুটি প্রাণের মধ্যে নৈকট্যবোধের প্রয়োজন আছে। তাই কিভাবে শিখনকে সার্থক করা যায় তা বুঝতে হলে কেবল শিক্ষার্থী বা শিক্ষকের মানসিকতাকে জানলেই চলবে না, পারস্পরিক ভাববিনিময়ের মাধ্যমে কিভাবে শিক্ষার সঞ্চার ঘটানো যায় তা নিরূপণ করতে হবে। তার জন্য শিক্ষাবিজ্ঞানের মূল নীতি অনুসরণ করার সার্থকতা আছে। শিক্ষাপদ্ধতির প্রকারভেদ থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপদ্ধতিকে তাই শিক্ষাবিজ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না।

যে-সব শিক্ষণপ্রণালীর প্রবর্তন হয়েছে তাদের মধ্যে আছে মনস্তত্ত্বভিত্তিক পদ্ধতি ও অন্যান্য পদ্ধতি। অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যে তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতির কথাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেখা গেছে যে, মনোবিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতির বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকারিতা বেশী। কারণ শিক্ষার্থীর মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই সব শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে

তর্কবিদ্যাসম্মতপদ্ধতি একেবারে গ্রহণযোগ্য নয় একথা বলা যায় না। প্রাথমিক পর্যায়ে মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ব্যবহার করলেও পরে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতির সার্থকতা আছে। বিশেষ করে বয়স্কদের জন্য যে কোনো শিক্ষণপদ্ধতি যুক্তিভিত্তিক হলে তা উপযোগী হয়ে ওঠে।

বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে যে পদ্ধতিগুলির উদ্ভব হয়েছে তার প্রত্যেকটি আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত। তাদের মধ্যে আছে মণ্টেসরি ও কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি, আছে ডল্টন পরিকল্পনা ও প্রোজেক্ট পদ্ধতি। এছাড়া ব্যাটাভিয়া পরিকল্পনা, উইনেট্কা পরিকল্পনা, বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যায়। একে একে এই পদ্ধতিগুলির তাৎপর্য আলোচনা করার সার্থকতা আছে।

শিক্ষায় শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্তু এই দুইটি উপাদানকে ঘিরে শিক্ষণের আয়োজন। কারণ কোনো জিনিস শেখাতে গেলে যেমন বিষয়বস্তুকে জানতে হবে তেমনি শিক্ষার্থীকেও জানা দরকার। তার রুচি, সামর্থ্য ও প্রবণতা, আগ্রহ ও অভিনিবেশ জানা না থাকলে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানদান কার্যকরী হয় না। আর শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি রেখে যদি শ্রেণীর পঠন-পাঠন, শিখন-শিক্ষণ ও আলোচনা চলতে থাকে তবে তা প্রতিটি শিক্ষার্থীর বিকাশের পথে সহায়ক হয়। যুক্তিসিদ্ধ (logical) পদ্ধতির সাহায্যে বিষয়বস্তুর বিন্যাস এবং উপস্থাপনের রীতি নির্ধারণ করা সহজ হয়। কিন্তু মূলতঃ শিক্ষার্থীর, বিশেষ করে শিশুর, অন্তরের বৃত্তি ও চাহিদা জানা না থাকলে কেবল যুক্তিনির্ভর প্রণালীর প্রয়োগ সব সময় কার্যকরী হয় না। তাই প্রাথমিক স্তরে মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগ বিশেষ কার্যকরী। যুক্তিনির্ভর পদ্ধতি শিক্ষার্থীজীবনের পরবর্তী স্তরে কাজে লাগে। তার মধ্যে আছে অবরোহী ও আরোহী পদ্ধতি, আছে বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষাত্মক পদ্ধতি।

আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতি (Inductive or Deductive Method) :

অবরোহী পদ্ধতিতে সাধারণ সূত্র থেকে বিশেষ উদাহরণের দিকে যাওয়া হয় অর্থাৎ সাধারণ সত্যকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার যে পদ্ধতি তাকে বলা হয় অবরোহী পদ্ধতি। আর আরোহী পদ্ধতি এর ঠিক বিপরীত। কারণ বেশ কয়েকটি বিশেষ বিশেষ উদাহরণ থেকে সাধারণ গুণটি বেছে নিয়ে

একটি সত্যে এসে পোঁছানো হল আরোহী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। এই দুটি পদ্ধতি যুক্তিনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ পদ্ধতিও যুক্তিনির্ভর পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে কোনো একটি বস্তুর উপাদান বিশ্লেষণ করে প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই বিশ্লেষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে একটি বস্তুর সমগ্র রূপটিকে একসঙ্গে নিয়ে তারপর তার ভিন্ন ভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়।

আধুনিক শিক্ষায় যুক্তিনির্ভর পদ্ধতির প্রয়োগ থাকলেও শিক্ষাবিজ্ঞানের অধিকাংশ মূলনীতি মনোবিজ্ঞান-সম্মত। কারণ বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় হয়তো যুক্তিনির্ভর পদ্ধতির প্রয়োগের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেই বিষয়বস্তু শিক্ষার্থী-মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, কতখানি সে শিশুমনের চাহিদা মেটাতে পারবে তা বিচার করে মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার্থী-মনের গতিপ্রকৃতিকে জেনে শিক্ষার পথ নির্ধারণ করাই হবে মনোবিজ্ঞানসম্মত প্রণালী। আর এই পথ ধরেই যুক্তিসিদ্ধ পথে পোঁছানো যায়! সহজ থেকে কঠিনে, জানা থেকে অজানায় অগ্রসর হতে গেলে এই দুই পদ্ধতিরই সমন্বয়ের সার্থকতা আছে।

৬। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি

ডাল্টন পদ্ধতি—গতানুগতিক শ্রেণী পাঠনের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ জমে উঠেছিল তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে কয়েকটি পদ্ধতির জন্ম হয়েছে। তার মধ্যে ডাল্টন পদ্ধতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ডাল্টন নামক শহরে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এই পদ্ধতির প্রথম প্রবর্তন হয়। শ্রেণীর সংকীর্ণ পরিবেশে শিক্ষার্থীকে আবদ্ধ না রেখে তাকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী অভিজ্ঞতা দেবার চেষ্টা ডাল্টন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। জন এ্যাডাম তাই এই পদ্ধতিকে শ্রেণী পাঠনার মৃত্যু-ঘণ্টা (Death-knell) বলেছেন। মিস হেলেন পার্থার্স্ট এই অভিনব পদ্ধতির মূলসূত্র রচনা করেন। প্রথমেই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত পার্থক্য তাঁর কাছে প্রকট হয়; তাই সেই সমস্যা তাঁকে চিন্তিত করে তোলে। এই চিন্তা ক্রমশঃ একটি পরিকল্পনায় রূপ নেয় আর সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হয়। এখানে শিক্ষক কেবল পরামর্শদাতা, তাই শিক্ষার্থীদের

স্বাধীনতা অব্যাহত। ফলে শিক্ষকের দায়িত্বও অনেক। প্রতিটি বিষয় পাঠনের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়-কক্ষ নির্ধারিত হবে এবং যে যার প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট শ্রেণীতে গিয়ে শিক্ষকের নির্দেশ ও সাহায্য নেবে—এই হল ডাল্টন পদ্ধতির কার্যধারা। তাহলেও দেখা যায় যে, স্বাধীনতাই এই পরিকল্পনার মূলনীতি। একজন শিক্ষার্থী যখন কাজ করতে শুরু করে, তখন তাকে বাধা দেবার কোনো যুক্তি নেই। সে আপন মনে প্রাণের তাগিদে কাজে অগ্রসর হয়। এই অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

সহযোগিতা এই পদ্ধতির অন্যতম নীতি। কারণ পরিকল্পনানুযায়ী শিক্ষার্থীরা একটি সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়। সামাজিক চেতনা ও নাগরিকতা যখন শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য, তখন দলবদ্ধভাবে কাজ করাব অভ্যাস বিশেষ সহায়ক। বিষয় শিক্ষার জন্য কোনো শ্রেণী নির্দিষ্ট থাকে না। শিক্ষার উপকরণ শিক্ষক ও শ্রেণী-পরিবেশ শিখবার ও শিক্ষণের সময় নির্দিষ্ট হয়। বিদ্যালয়ে কোনো সময়-পত্রিকাও থাকে না, কারণ এই পরিকল্পনায় সময়-পত্রিকার উপযোগিতা নিতান্ত অল্প। যে কোনো শ্রেণীতে গিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছা শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করতে পারে। তারপর সে যে অভিজ্ঞতা আহরণ করে, শিক্ষায় অগ্রগতি লাভ করে, তার একটি সারমর্ম তাতে লিখে ফেলতে হয় ও পাঠোন্নতির রেখাচিত্র প্রস্তুত করতে হয়। ডাল্টন পদ্ধতিতে অন্য কোনো পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই।

এই পদ্ধতিতে সুবিধা-অসুবিধা দুইই আছে। সুবিধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(১) শিক্ষক শিক্ষার্থীকে যথাসম্ভব নিজের চেষ্টায় শিখবার প্রেরণা দেন।

(২) শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ শক্তি ও জ্ঞানের উপযোগী অভিজ্ঞতা আহরণে ব্রতী হতে পারে।

(৩) বিষয়-কক্ষের প্রবর্তন শিক্ষা-পরিবেশককে সহজ করে।

(৪) শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ এতে সহজ হয়।

(৫) তাদের আত্মনির্ভরশীলতা, সহযোগিতার মনোভাব ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়।

(৬) ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া অনেক সহজ হয়।

এইসব সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও ডাল্টন পরিকল্পনা নিম্নস্তরের শিক্ষার্থীদের

বিশেষ উপযোগী নয়। কারণ, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর আত্মনির্ভরশীলতা কম থাকে ও পদে পদে তাদের শিক্ষকের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এছাড়া এই ব্যবস্থায় শিক্ষক কেবল পর্যবেক্ষক। সাধারণতঃ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের ফলে যে শিক্ষার সঞ্চার হয় এই ব্যবস্থায় তা সম্ভবপর হয় না।

ডাল্টন পরিকল্পনায় পুস্তকই শিক্ষার মূল উপকরণ। সেখানে উপযুক্ত প্রদীপনের বিশেষ কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। কারণ, শিক্ষকের বর্ণনা ও ব্যাখ্যার কোন স্থান না থাকায় সমস্যার সমাধান হয় না।

মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও পাঠোন্নতির সঠিক চিত্র সারমর্মের মাধ্যমে পাওয়া কঠিন। এক্ষেত্রে কেবল শিক্ষার্থীর উপরেই নির্ভর করতে হয়। কোনো সময়-পত্রিকার ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে।

মোটকথা, ডাল্টন পদ্ধতি মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্যে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু যাদের বুদ্ধি, আত্মপ্রত্যয় ও অধ্যবসায় কম, তাদের পক্ষে এই পদ্ধতির উপযোগিতা নেই বললেই চলে।

এই সব সুবিধা-অসুবিধার কথা বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে, ভারতীয় শিক্ষা-পরিবেশে এই পরিকল্পনাকে অনুপূরক হিসেবে ব্যবহার করলে ভালো হয়। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের সময়কে দুই ভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগে শ্রেণী পাঠন ও দ্বিতীয় ভাগে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী অভিজ্ঞতা আহরণের ব্যবস্থা করলে ফল ভালো হতে পারে। এই সমন্বয়ের ফলে যে সামঞ্জস্য ও সার্থকতা আসবে তা হয়ত নতুন পদ্ধতির সংকেত দিতে পারে। বর্তমানকালে শিক্ষায় যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার মূলে আছে ব্যক্তিগত পার্থক্যের প্রতি ঔদাসীন্য। পরিবর্তিত ডাল্টন পদ্ধতি গতানুগতিক শ্রেণী-পাঠনকে বজায় রেখে ব্যক্তিগত পার্থক্য সম্পর্কেও সচেতন। এই পরিবর্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষক কেবল নিরপেক্ষ দর্শক নন, শিক্ষার্থীদের কাজ তত্ত্বাবধান করবার ভার তাঁরই উপর। সেখানে শিক্ষকের নির্দেশেরও অবকাশ আছে। এছাড়া সময়-পত্রিকাতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারপর শিক্ষার্থীদের পাঠোন্নতির পরিমাপের জন্য যে রেখাচিত্রের নির্দেশ আছে তাকেও কাজে লাগাবার নানা ব্যবস্থা এই পরিবর্তিত পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে। কারণ কোন শিক্ষার্থী কোন্ বিষয়ে

কতটুকু অগ্রগতি লাভ করেছে রেখাচিত্র পূরণ করতে গিয়ে শিক্ষকের সে বিষয়ে একটা ধারণা জন্মে। কতটুকু কে পিছিয়ে আছে, আর সংগে সংগে কোন্ ছাত্রকে কিভাবে সাহায্য করতে পারা যায় তার একটা পরিকল্পনা করে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়।

কার্যসমস্যা-পদ্ধতি

বহুদিন আগেই শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে। তার সংগে সংগে শিশুর অন্তবৃত্তি, প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি পড়েছে। শৈশব থেকেই সৃষ্টির নেশা মানুষের মধ্যে দেখা যায়। তাই প্রতিটি শিশুই হতে চায় কর্মী। প্রত্যেকের ইচ্ছা সে কিছু তৈরী করবে, কিছু সৃষ্টি করবে। নিরন্তর কাজের মধ্য দিয়ে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শিশু আহরণ করে, তার মূল্য অনেকখানি। কার্যসমস্যা-পদ্ধতিতে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। আমেরিকায় জন ডিউই ও তাঁর সহকর্মী ফিল প্যাট্রিক শিক্ষার এই নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। একটা বিপ্লবী দৃষ্টিভংগী নিয়ে শিশুর জীবনকে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে তোলাই এঁদের উদ্দেশ্য ছিল। বিভিন্ন দিকে শিশু-জীবনের যে চাহিদা থাকে সেদিকে তাকিয়ে কার্যসমস্যার রূপায়ণ করা হয়।

কোনো কার্যরূপ সমস্যাকে স্বাভাবিক অবস্থায় সমাধানের শিক্ষা যে পদ্ধতিতে দেওয়া হয় তাকে প্রোজেক্ট-মেথড বলে (A project is a problematic act carried to completion in its natural setting—Stevenson)। তাহলেই দেখা যায় যে, সমস্যার আকারে যে কোনো কার্য শিক্ষার্থীদের সামনে আনলে তার সমাধানের প্রচেষ্টা চলতে থাকে আর শিক্ষার্থীরা সমাধানের প্রয়াসে যাতে এগিয়ে যেতে পারে শিক্ষককে সেরকম প্রেরণা জোগাতে হবে।

ক্রমশ এগিয়ে যাওয়ার পাথেয় আহরণ করে শিক্ষার্থী অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে যাত্রা করে। শিক্ষার্থীদের যাত্রা যাতে সুগম হয় সেজন্যে শিক্ষককে অনেক ক্ষেত্রে নির্দেশও দিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসূচী অনুসারে কতকগুলো কার্যসমস্যার তালিকা তৈরী করা হয় এবং সেই সকল কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এক এক বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে।

প্রোজেক্ট দুই প্রকারের হতে পারে, যথা—বুদ্ধিমূলক ও কার্যমূলক।

বুদ্ধিমূলক কার্যসমস্যার সমাধানের কল্পিত কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারলেই সমস্যাটির সমাধান হল বলে ধরা হয়। কিন্তু কার্যমূলক সমস্যা সমাধানের জন্যে শিক্ষার্থীকে বাস্তবিক কাজ করতে হবে। শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষক ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীকে কতকগুলি কাজ করতে দেবেন। শিক্ষার্থী স্বচেষ্টায় তা করবার উপায় চিন্তা করবে এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে তা সম্পাদন করবে—যেমন দিক্ নির্ণয় করা, সময় নির্ণয় করা, বিদ্যালয় ও গ্রামের নকশা তৈরি করা ইত্যাদি। অনেক সময় বিদ্যালয়ের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে থেকেও ছোট ছোট কার্যসমস্যার সমাধান করা যায়। তাহলেও মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের সীমানার বাইরেও নিয়ে যেতে হবে।

চারটি স্তরে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। যথা—

(১) কাজের ইউনিট ঠিক করা,

(২) পরিকল্পনা করা,

(৩) কাজ সম্পাদন করা,

(৪) বিচার করা।

শিক্ষার্থীরাই কাজের ইউনিট স্থির করবে। তবে এই ব্যাপারে শিক্ষকদের সাহায্যেও প্রয়োজন আছে সাধারণত শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা কম ; তাই যথাযথ নির্দেশ বা ইঙ্গিত শিক্ষার্থীদের পক্ষে সহায়ক হয়।

কাজের পরিকল্পনাও করবে শিক্ষার্থীরা। কে কি কাজ করবে তা স্থির করবার জন্যে প্রথম দলগঠন করতে হবে। দলগঠনের পর বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে সকলে মিলে কাজ করতে করতে জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা তারা আহরণ করবে। পরিশেষে কার্যসমাপ্তির পর তা নিয়ে আলোচনা ও বিচারবিশ্লেষণ করা এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

প্রোজেক্ট পদ্ধতির উপকারিতা

কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আহরণ করে তার ফলে তাদের বাস্তববুদ্ধি জাগ্রত হয়, অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ করতে শেখে। এইভাবে শিক্ষার সঙ্গে বাস্তবজীবনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সৃষ্টির প্রেরণায় নিজেদের আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হয়। শ্রেণী-পাঠনের গতানুগতিকতা থেকে তাদের মুক্তি ঘটে। সত্যিকারের জীবনের খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা তাদের শিক্ষাকে পূর্ণ করে তোলে। মোট কথা,

শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে প্রোজেক্ট পদ্ধতি বিশেষ অনুকূল। এই পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ের ধারাবাহিক জ্ঞান দেওয়া সম্ভবপর হয় না বটে কিন্তু শ্রেণী পাঠনের অনুরূপভাবে কার্যসমস্যার পদ্ধতিকে প্রয়োগ করলে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অনেক ত্রুটি বিদায় নেবে। কেবল তাই নয়, শিক্ষার্থীদের সামাজিক চেতনা ও বাস্তববুদ্ধির উন্মেষ এই পদ্ধতির ফলে সহজ হয়। তাই অধ্যাপক কিলপ্যাট্রিক বলেছেন "Project is a whole-hearted purposeful activity in a social environment."

প্রোজেক্ট পদ্ধতির অসুবিধা

নানা দিক থেকে প্রোজেক্ট পদ্ধতির উপযোগিতা থাকলেও কয়েকটি অসুবিধাও এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সংশয় জাগায়। প্রথমতঃ প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজস্ব বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারে না, কারণ, কাজের ইউনিটগুলি এই বুদ্ধিসত্তার প্রয়োগের সম্পূর্ণ উপযোগী থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রোজেক্ট অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে শিক্ষার অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও শিক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রোজেক্ট পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেই হবে। কারণ, শিক্ষার মধ্যে যে জড়তা ও একঘেঁয়েমি এসে পড়ে এই পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে তা দূর হয়, নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষার্থীর জীবন উদ্ভাসিত হয়, কাজের প্রেরণা দেখা দেয়, বাস্তববুদ্ধি জাগ্রত হয়। তাই বর্তমানে এই পদ্ধতিকে যতখানি প্রয়োগ করা যায় ততই মঙ্গল।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা

শিশু স্বভাবতঃই কর্মচঞ্চল। তার প্রাণশক্তি অফুরন্ত, তাই কর্মের মাধ্যমে সে প্রকাশের পথ খোঁজে। তার জীবনের প্রস্তুতি নানাস্তরে শুরু হয়। চারদিকে যা কিছু দেখে তারই অনুকরণ সে করতে চায়। কখনো গড়ে, আবার কখনো ভাঙে। এই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে নতুন অভিজ্ঞতা পেতে চায়। শিশুর জীবনে কর্মই তার ধর্ম। যদি তাকে কর্মের পথে বাধা দেওয়া যায়, তাহলে তার প্রকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। প্রতিদিন চলার পথে ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়ে সে ক্রমপরিণতি লাভ করে। সজীব প্রাণ মেতে ওঠে নতুন নতুন কাজের নেশায়; পরিবেশের সঙ্গে নিত্য নতুন পরিচয়ের আশায়। শিশুর এই কর্মচঞ্চলতা তার

শিক্ষাক্ষেত্রেও দেখা যায়। সেখানে তাকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। কেবল পুঁথিগত জ্ঞান পরিবেশনে সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুকে কাজের মধ্যে দিয়ে জীবনের মুখোমুখী করাই অন্যতম উদ্দেশ্য। তার অন্তরের যে সব তাগিদ আছে সেগুলিকে কর্মের মাধ্যমে পরিতৃপ্ত করতে হবে। আজ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর মনোবৃত্তি অনুযায়ী কার্যধারার প্রবর্তন একান্ত বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠেছে।

কর্মের রূপ ও প্রকাশ সম্বন্ধে শিক্ষাবিদদের মধ্যে নানা মতভেদ থাকলেও তাঁরা একথা মনে করেন যে. শিক্ষার সঙ্গে কর্মের সংযোজন একান্ত আবশ্যিক। তাঁরা আরও মনে করেন যে, কর্মকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়,—একটি শিশুর স্বয়ং-কর্ম ও দ্বিতীয়টি শিক্ষক-নির্দিষ্ট কর্ম। এমন অনেক কাজ আছে যেগুলি শিশু স্বেচ্ছায় সম্পাদন করে, আবার অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকের নির্দেশ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিশু স্বেচ্ছায় যে কাজে লিপ্ত হয় তাকে অনির্দেশিত কাজ বলা চলে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা অব্যাহত থাকে। তাই সেখানে নির্দিষ্ট দিকে শিক্ষার অগ্রগতি কতখানি সম্ভবপর তা বিবেচ্য। এমন অনেক কাজ আছে যেখানে শিক্ষকের জ্ঞান ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়। এগুলিকে আমরা নির্দেশিত কাজ বলতে পারি। এই নির্দেশিত কাজের মধ্যেও শিক্ষার্থী ইচ্ছানুযায়ী অগ্রসর হইতে পারে। তাই সেক্ষেত্রেও তার স্বাধীনতা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় না বললেই চলে। কিন্তু যেখানে শিক্ষকের আদেশেই শিক্ষার্থীকে কাজ করতে হয় সেখানে তার অবস্থা হয় যন্ত্রচালিতের মতো। তার স্বাধীনতা হয় বিপন্ন। তাই আদিষ্ট কর্মের মধ্যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব কিছুটা খর্ব হতে পারে, তার সৃজন-প্রতিভা ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের প্রকাশ রুদ্ধ হতে পারে।

এইসব কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীর পক্ষে নির্দেশিত কাজ বিশেষ উপযোগী। অনির্দেশিত কাজ অনেক সময় শিক্ষার্থীর চাপল্য ও উচ্ছৃংখলতা ডেকে আনে, আবার আদিষ্ট কাজে তার অভিব্যক্তি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তাই এমন পরিবেশের প্রয়োজন যা তার স্বেচ্ছাচারিতাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করবে। এক দিকে অতিরিক্ত স্বাধীনতার ফলে তার অপব্যবহারের সম্ভাবনা, অন্যদিকে নিয়ম-শৃংখলার চাপে অবরুদ্ধ ব্যক্তিসত্তা,—এই দুই-এর মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করে কাজের প্রবর্তন করতে হলে নির্দেশিত কাজ বিদ্যালয়-জীবনে নানাভাবে প্রতিফলিত করতে হবে। এই কাজ শ্রেণীতে ও শ্রেণীর বাইরেও চলতে পারে।

শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে অনির্দেশিত কাজ কিভাবে করবে তা বিচারসাপেক্ষ। সাধারণতঃ শিক্ষার্থীর সংখ্যার চেয়ে কাজের ইউনিট বেশী থাকা দরকার। যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী তার রুচি ও শক্তি অনুযায়ী এক-একটি কাজ বেছে নিতে পারে সে রকম ব্যবস্থা রাখতে হবে। অবশ্য কাজ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নির্দেশ না থাকলেও শিক্ষক প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীকে অবহিত করবেন ও সামান্য নির্দেশ দেবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, গতানুগতিক শিক্ষায় অভ্যস্ত শিক্ষার্থী সাধারণতঃ শিক্ষকের উপরেই নির্ভরশীল। তাই অনির্দেশিত কাজে তাদের প্রথম প্রথম অসুবিধা হয়। কিন্তু একে একে তাদের অনভ্যাসজনিত অসুবিধা দূর হয় ও অনির্দেশিত কর্মে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সাধারণতঃ অনির্দেশিত স্বাধীন কাজের মধ্যে শিক্ষকের কিছুই করণীয় নেই—এরকম একটা ধারণা থাকে। কিন্তু শিক্ষার্থীকে কাজের উৎসের সন্ধান দেওয়া ও একে একে তাব বিচারবুদ্ধি জাগ্রত করার দায়িত্ব শিক্ষকেরই। মাটির কাজ, কাঠ, কার্ডবোর্ডের কাজ, অঙ্কন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকদের নির্দেশের অপেক্ষা রাখে। যখন এইসব কাজে তার নৈপুণ্য আসে তখন শিক্ষকের বিশেষ কোনো প্রয়োজন থাকে না। সেখানে তিনি পর্যবেক্ষক মাত্র। অনির্দেশিত কাজে যেমন কয়েকটি সুবিধা আছে তেমনি কয়েকটি সমস্যাও আছে। দেখা যায়, চঞ্চল শিশুর মন ক্রমশঃই এক কাজ থেকে অন্য কাজে ঘুরতে থাকে। ফলে, তার কোনো কাজই পূর্ণতা লাভ করে না। শিশুদের কর্মরাজ্য ও ভাবরাজ্য এই দুইএর গতি সব সময়ে এক নয়, কিন্তু মূলতঃ তারা গতিপ্রধান। কখনো কর্মকে ছাড়িয়ে ভাব ছুটতে থাকে, আবার কখনো কর্ম ভাবকে ছাড়িয়ে যায়। শিশুদের ভাব ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা খুবই কঠিন। তারা সমান্তরাল ও সমব্যাপ্ত। বয়সের অনুপাতে কর্মের একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ শিশুর অভিজ্ঞতা এই সীমারেখাকে অতিক্রম করতে পারে না। নির্দিষ্ট সীমারেখা না থাকলে কর্মধারার ইঙ্গিত পাওয়াও সম্ভব নয়। তাই এইসব ক্ষেত্রে শিক্ষকের নির্দেশ বাঞ্ছনীয়।

ইউনিট পদ্ধতি

শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রেরণা অনুযায়ী শিক্ষক প্রয়োজনস্থলে এক একটি ইউনিট নির্ধারিত করবেন আর শিক্ষার্থী শিক্ষকের নির্দেশকে নিজেদের পরিকল্পিত কাজ হিসেবে গ্রহণ করবে ও সেই ইঙ্গিতকে কাজে লাগাবার চেষ্টা

করবে। কাজটির বিভিন্ন দিকে পরিণতি দেবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তার সমালোচনারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এইভাবে কর্ম শিশু-জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে। একদিকে থাকে তার রুচি, অন্যদিকে বিচার-বিশ্লেষণ ও সমালোচনার ক্ষমতা।

জন ডিউই তাঁর The school and the Child নিবন্ধে বলেছেন, "শিশুরা একান্তভাবে দায়িত্ব নিয়ে কাজের ইউনিট স্থির করতে পারে না এবং শিক্ষকের পক্ষে শিশুদের উপর নির্ভর করে বসে থাকাও সমীচীন নয়।" তাই শ্রেণীতে কিছুদিন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিচিত হবার পর তাদের চাহিদাকে বুঝে কাজের বিষয় স্থির করা বোধ হয় শিক্ষার্থীর পক্ষে মঙ্গলজনক হবে।

ইউনিট নির্ধারণ ব্যাপারে শিক্ষক যদি সতর্কতা অবলম্বন করে তাঁর দেওয়া ইঙ্গিতকে শিশুদের মুখ দিয়ে প্রকাশ করতে চান তাহলে তাতে কাজ ভালো হতে পারে। কারণ, সেক্ষেত্রে তারা সেই ইউনিটকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করবে আর তা সম্পাদনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। মোট কথা, শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে থেকে কাজের প্রেরণা জাগলে তা সবদিক থেকেই শ্রেয় হয়ে ওঠে।

কর্ম এবং কার্যসমস্যার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। কর্ম বলতে সবরকম কর্মই বোঝায়—যেমন অনির্দেশিত ও নির্দেশিত, এমন কি আদিষ্ট কর্মও। কিন্তু কার্যসমস্যা বা প্রোজেক্ট, কর্মের অন্তর্ভুক্ত হলেও তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রোজেক্ট পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করতে গেলে একটি বিশেষ নীতি অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়। চারটি স্তরে প্রোজেক্টের রূপায়ণ ঘটে। যে কাজের মধ্যে এই চারটি ব্যবস্থার একটিরও অভাব থাকে, তাকে প্রোজেক্টের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। প্রোজেক্টের বেলায় আগ্রহের কেন্দ্র থেকে অতি সহজ-ভাবে অন্যান্য বিষয়ের উদ্ভব হয়, তার শিশুরা প্রয়োজনের খাতিরেই সমস্যা বিষয়ে জ্ঞানলাভের প্রয়াসী হয় কিন্তু কর্মের বেলায় শিশুর আগ্রহ ও প্রয়োজন উপেক্ষিত হতে পারে, কারণ সেখানে আমাদের দৃষ্টি থাকে পাঠ্যসূচীর দিকে। পাঠ্যসূচীকে কেন্দ্র করে কর্ম স্থির করা হয় এবং বিভিন্ন বিষয়গুলির সঙ্গে কর্মের কৃত্রিম যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। কর্মের কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হল—

(১) খেলনার দোকান ;

(২) ফেরী করা ;

(৩) বায়োস্কোপের ছবি দেখানো ;

(৪) পুতুল নাচ ;

(৫) বাড়ি তৈরী করা ;

(৬) গ্রাম ও শহর তৈরী করা ;

(৭) বাজার, পোস্টাফিস, রেলস্টেশন তৈরী করা।

এমনি অনেক খেলাই কর্মের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এমন কি শিল্প-কাজকেও নির্দেশিত কাজের পর্যায়ে ফেলা যায় তাহলেই দেখা যায় যে, ব্যাপক অর্থে অনির্দেশিত, নির্দেশিত এবং আদিষ্ট সবরকম কর্মেই শিক্ষকের আদেশ ও নির্দেশ কর্মের প্রতি অংশে জড়িত থাকে। কিন্তু প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই কাজের ইউনিট স্থির করা থেকে প্রতি স্তরের কাজ শিক্ষকের সহযোগিতায় সম্পন্ন করে।

কর্ম ও প্রোজেক্টের মধ্যে যে সব পার্থক্য আছে তা নিচে দেওয়া হল—

কর্ম	প্রোজেক্ট
(১) শিশুরা হাতে-কলমে কাজ করে, কিন্তু দায়িত্ব হল শিক্ষকের।	(১) শিশুরা নিজেরাই সব কাজ করে, দায়িত্ব তাদেরই।
(২) জ্ঞান মুখ্য, কর্ম গৌণ।	(২) কর্ম মুখ্য, কর্মকে কেন্দ্র করে জ্ঞান আহৃত হয়।
(৩) কর্মের অবতারণা পাঠ্য-সূচীর জন্যে।	(৩) কর্মের সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্যই কর্মের অবতারণা। পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিষয়সমূহ পরে আসে।
(৪) কর্মের প্রতিস্তরের সুষ্ঠু অনুসরণ আবশ্যিক নয়।	(৪) প্রত্যেকটি স্তরের কাজেই সুষ্ঠু অনুসরণ আবশ্যিক।
(৫) কতকগুলি বিচ্ছিন্ন কাজের দ্বারাও উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।	(৫) প্রোজেক্টের ইউনিট ক্ষুদ্র থাকে না এবং কাজের প্রতি অংশ সুসংবদ্ধ।
(৬) শিক্ষার গতি অন্তর্মুখী।	(৬) শিক্ষার গতি বহির্মুখী।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীর বয়স, বুদ্ধি ও শ্রেণীস্তর অনুযায়ী পদ্ধতির প্রয়োগ দরকার। এমন কোনো পদ্ধতি নেই যা সব শিক্ষার্থীর পক্ষেই উপযোগী। শ্রেণীভেদে ও বিষয়ভেদে পদ্ধতির বৈচিত্র্য আনতেই হবে।

পাঠদানের ইউনিট পদ্ধতি

হার্বার্টীয় পদ্ধতিতে পাঠের উদ্দেশ্য ও রচনা থেকে শুরু করে পাঠ পরিচালনার প্রত্যেকটি স্তরই স্বতন্ত্রভাবে পরিকল্পিত ও রচিত হয়। এই জাতীয় পাঠদানের ফলে শিক্ষার্থীর মনে বিষয়ের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যায়, জ্ঞেয় বস্তু শিক্ষার্থীর কাছে খণ্ডিত ও ছিন্ন মনে হয়। হার্বার্টীয় শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তে নতুন শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন হয়েছে। তাতে গতানুগতিক ধারার পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং পাঠদান কার্যকে নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে। হার্বার্টীয় পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি পাঠকে স্বতন্ত্রভাবে দেখা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সমগ্র পাঠ্যকেই পাঠের একক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তারপর সেই একক পাঠকে শিক্ষার্থী রুচি, সামর্থ্য, প্রয়োজনীয়তা ও পরিবেশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে এবং পরে পাঠের গভীরতা বা প্রসার নির্ণয় করা যেতে পারে।

ইউনিট পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা যায় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর উপর সামগ্রিক দৃষ্টির অনুশীলন এই পদ্ধতির মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনা করেছে। বিষয়বস্তুর উপর অখণ্ড অধিকার ও অবিচ্ছিন্ন ধারণা গড়ে উঠলে তবেই তা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত হয়,—গেস্টাল্ট-মতবাদের এই হল মর্মকথা। প্রত্যেকটি আচরণের সঙ্গে সঙ্গে পরিণতির একটি চিত্র মনের মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুললে পরিণতির পথে যাত্রা কার্যকরী হয়, আচরণও উদ্দেশ্যের অভিমুখী হয়। ইউনিট পদ্ধতিতে মূল উদ্দেশ্যটি স্থির করে নিয়ে প্রাসঙ্গিক সমুদয় অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার কথা বলা হয়েছে। গেস্টাল্ট-মত অনুযায়ী মনের মধ্যে সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠার পর শিক্ষার্থীর মনে প্রস্তুতি আসে এবং বিষয়টি আয়ত্তে আনবার জন্য প্রয়াস দেখা দেয়। অবশ্য এই আয়ত্তে আনবার চেষ্টা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। নিজস্ব রুচি, প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুশীলন দেখা দেয়। আর অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষায় অগ্রগতি ঘটে। ইউনিট পদ্ধতিতে গেস্টাল্ট-মতবাদ ও থর্নডাইকের শিক্ষানীতি বিশেষভাবে প্রতিফলিত। সুতরাং ইউনিট পদ্ধতির সার্থকতা সম্পর্কে আজ অনেকেই নিঃসন্দেহ। পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে পাঠ পরিচালনার পরিকল্পনা নতুন সন্দেহ নেই, কিন্তু পাঠ্যবিষয় অপেক্ষা অভিজ্ঞতার গুরুত্ব যে অধিক একথা স্বীকার করতেই হবে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী বিষয়বস্তুর উপর দখল আসে, সে

সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায় ও রসানুভূতির সঞ্চার হয়। অর্জিত জ্ঞানকে নতুন ক্ষেত্রে নতুন পরিবেশে প্রয়োগ করতে এই পদ্ধতি বিশেষ সহায়তা করে। ইউনিট পদ্ধতির সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে শিক্ষাবিদ্‌রা বলেন এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে এমন কতকগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত সার্থক কর্মধারার অনুশীলন করতে হয়, যার ফলে উদ্দেশ্যটি ভালোভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আচরণেরও পরিবর্তন ঘটে। সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা চারটি বিষয় লক্ষ্য করব ঃ

(১) শিক্ষাকার্যটি কেবলমাত্র পুঁথিগত নয় ;

(২) এই ক্রিয়া একটা বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক, পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এবং অর্থযুক্ত ;

(৩) শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যই এই পদ্ধতির প্রধান অংশ ;

(৪) শিক্ষার্থীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা অর্জনের দিকে এই পদ্ধতির লক্ষ্য আছে।

ইউনিট পদ্ধতি উদ্দেশ্যমুখী। প্রথমে সামগ্রিকভাবে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য স্থির করে নেওয়া ও তারপর সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়াই এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। হাওয়ার্ড উইলসন ইউনিট পদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনটি জিনিসের দিকে জোর দিতে বলেছেন ঃ (১) উদ্দেশ্য নির্ণয় ; (২) বিষয়বস্তু নির্বাচন ও (৩) আচরণ নিয়ন্ত্রণ।

ইউনিট পদ্ধতির সুবিধা

এই পদ্ধতিতে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সুবিধার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ পাঠদানের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এই পদ্ধতিতে বেশ সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট থাকে। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার্থীর যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা ও আচরণ এই উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করবার জন্যে নির্দিষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ ইউনিট পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার প্রাসঙ্গিক শিক্ষোপকরণ অধিকতর কার্যকরী হয়। চতুর্থতঃ পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে কতখানি শিক্ষালাভ হল ইউনিট পদ্ধতিতে তার মূল্যায়ন সম্ভবপর। পঞ্চমতঃ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দিকে ইউনিট পদ্ধতির লক্ষ্য থাকে ও যাতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ উদ্দীপিত হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হয়। এই নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হলে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। কারণ শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত

করবার যে গুরু দায়িত্ব শিক্ষকের উপর ন্যস্ত থাকে তা নির্বাহ করতে হলে উপযুক্ত শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষায় অনুবন্ধ প্রণালী (Correlation of Studies)

জ্ঞানের রাজ্য বিস্তীর্ণ। খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা নিয়ে মানুষ জীবনের পথে এগিয়ে যায়। শৈশব থেকে সুরু করে ইন্দ্রিয়ের পথ বেয়ে যে সব ভিন্ন ধরনের উদ্দীপনা একে একে মনে জমে ওঠে সেগুলি অভিজ্ঞতায় রূপ নেয়। এই অভিজ্ঞতাগুলি মনের স্বাভাবিক সংশ্লেষণের বশে ক্রমশঃ সংহত হয় ও একীভূত সত্তায় পরিণত হয়। এই অখণ্ড একীভূত সত্তাই হল জ্ঞান। হার্বার্টের মতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় থেকে উদ্ভূত ভাবের মধ্যে যখন একটা যোগসূত্র রচনা করবার অবস্থা আসবে, তখনই শিক্ষার পথে প্রস্তুতি আসবে। অনুবন্ধ প্রণালী বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে। পাঠ্য-বিষয়ের ভিন্নতা সত্ত্বেও একটি বিষয় যে আরেকটি বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে যুক্ত একথা অস্বীকার করা চলে না। বিষয়গুলি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত নয়; একটি আর একটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং বিষয়বস্তুকে স্বতন্ত্র ভাবে উপস্থাপিত না করে সমজাতীয় বিষয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলে পড়ার দিক থেকে অনেকখানি সুবিধা হয় ও অভিজ্ঞতা সুসংবদ্ধ হয়। আজ পাঠ্যবিষয়ের বোঝা অনেকখানি বেড়ে গেছে বলে অনেকের ধারণা। তাই এই পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তাও আজ বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ও অনুরূপ বিষয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে যদি তা এই প্রণালীর সাহায্যে সুসম্বন্ধভাবে উপস্থিত করা যায়, তবে শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়বস্তুর বোঝা অনেকটা হাল্কা হয়ে যাবে।

অনুবন্ধপ্রণালীর শ্রেণীবিভাগ

অনুবন্ধ প্রণালীর ব্যবহার মূলতঃ তিনটি পর্যায়ে নির্দিষ্ট হতে পারে :

(ক) একই বিষয়ের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অনুবন্ধ রচনা করা যায়;

(খ) বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে;

(গ) পাঠ্যগ্রন্থ ও জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে অনুবন্ধ অর্থাৎ বিদ্যালয় ও বহির্জগতের মধ্যে অনুবন্ধের প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, এই প্রণালীর প্রথম পর্যায়ের ব্যবহার পাঠ-

পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে নির্দিষ্ট করা হয়। পূর্ব পাঠের উপর ভিত্তি করে নতুন পাঠ দেওয়া হয়। অর্থাৎ একই বিষয়ের বিভিন্ন দিকের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে সেদিকে শিক্ষার্থীদের চেতনা আনতে হয়। যেমন, রাজনৈতিক ভূগোল পড়াতে গিয়ে প্রাকৃতিক ভূগোলের কিছু কিছু অংশ তুলে ধরলে তা কার্যকরী হতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুবন্ধ রচনার মধ্যে শিক্ষকের বুদ্ধিসত্তা ও কৌশলের বেশী প্রয়োজন। সেখানে কিভাবে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়, সে সম্পর্কে চিন্তাও পূর্ব পরিকল্পনার প্রয়োজন।

তৃতীয় শ্রেণীর অনুবন্ধের ক্ষেত্রে তৎপর হতে গেলে শিক্ষকের ব্যাপক অভিজ্ঞতা, মৌলিক চিন্তা ও কল্পনার প্রয়োজন। এই অনুবন্ধ প্রণালীর ক্ষেত্রে শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে জীবন থেকেই জ্ঞানের উদ্ভব। জীবন জুড়েই শিক্ষার বিস্তার। গ্রন্থজগৎ বিশ্বজগৎ-এর দ্বারস্থ। এই দুই-এর মধ্যে অনুবন্ধ রচনা করতে পারলেই আমাদের গ্রন্থজগৎ জীবন্ত হতে পারবে, নচেৎ নয়। মহাত্মা গান্ধী তাঁর বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনায় কারুশিল্পকে কেন্দ্র করে অন্যান্য বিষয়ে অনুবন্ধ প্রণালীর সাহায্যে অভিজ্ঞতা ও তথ্য পরিবেশন করবার পরিকল্পনা নিয়েছেন। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, এই কেন্দ্রবন্ধ প্রণালী দুই জাতের হতে পারে ঃ

(ক) কেন্দ্রীয় বিষয়টিকে স্বতন্ত্র বিষয়রূপে পড়া হবে ;

(খ) কেন্দ্রীয় বিষয়টি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে দেখা হবে না, কেবলমাত্র বিভিন্ন বিষয়ের সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে। এই প্রণালীকে অনেকে সংযোজন (Integration) প্রণালীও বলে থাকেন।

আমাদের বিদ্যালয়ে আজ সমাজবিদ্যা নামে যে নতুন বিষয় প্রবর্তন করা হয়েছে, একমাত্র সংযোজন প্রণালী অনুযায়ী তা পড়ানো সম্ভবপর। এই প্রণালীর প্রয়োগের ফলে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার করা সহজ হয়। তা ছাড়া প্রয়োগ ও অনুশীলনও এই প্রণালীতে কার্যকরী হয়।

আজকাল আরো যে কয়েকটি পদ্ধতির কথা শোনা যায় তাদের মধ্যে workshop method বা আলোচনা-মূলক পদ্ধতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন সাম্প্রতিক হলেও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষানীতি এই পদ্ধতির মূলে আছে। প্রত্যেক মানুষের অভিজ্ঞতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভাবের আদান-প্রদানের প্রতি মর্যাদা এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শিক্ষণকে শুধু শ্রেণী-পাঠনের মধ্যে আবদ্ধ রাখলেই চলবেনা। পদ্ধতিকে নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। এই পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের সামনে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা হয়। কখনো প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরাই জ্ঞানের পথে এগিয়ে যায়। নানা দলে বিভক্ত হয়ে এক-একটি সমস্যা নিয়ে তারা আলোচনা করে ও এইভাবে পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় সহজ হয়ে ওঠে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় হয় ও শ্রেণী কর্মমুখর হয়ে ওঠে। প্রত্যেকেই প্রাণের স্পন্দন অনুভব করে। সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থী অভিজ্ঞতার লেনদেন করতে থাকে। এই পদ্ধতিতে সাধারণ আলোচনা-সভা ও গোষ্ঠীগত আলোচনা দুই-ই স্থান পেয়েছে।

প্রত্যেকে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করায় যে কোনো বিষয়বস্তুর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভবপর হয়। ফলে, প্রত্যেকেই অনুভূতি ও জ্ঞানের স্পর্শে ধন্য হয়। অন্যের মতামত সম্পর্কে প্রত্যেকেই সহিষ্ণু হয়ে ওঠে। পরিণতিতে একটি সামাজিক চেতনার উন্মেষ সম্ভবপর হয়। কিন্তু এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হলে শিক্ষকের নৈপুণ্যের প্রয়োজন। অনেক সময় দেখা যায় যে বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিশেষ স্তরভেদ থাকলে আলোচনায় অনর্থক কালক্ষেপ ঘটে। এই সব ক্ষেত্রে শিক্ষকের সহায়তা ও নির্দেশের প্রয়োজন। এই আলোচনা-পদ্ধতিকে তাই দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে--একটি সাধারণ সভা (Plenary session) আর একটি Group discussion অর্থাৎ দলগত আলোচনা।

আজকের দিনে বৃটেন ও আমেরিকায় Programmed learning-এর বিশেষ প্রচলন দেখা দিয়েছে। যাতে শিক্ষকের সাহায্য না নিয়েও উপকরণের সাহায্যে শিক্ষার্থী নিজে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারে, তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

এর জন্যে নানা আধুনিক Teaching machine ও Programmed text-এর উদ্ভাবন হয়েছে। শিক্ষার প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট পথে অভিজ্ঞতাকে চালিত করাই এগুলির উদ্দেশ্য।

আলোচনা

আধুনিক শিখন-পদ্ধতিগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি

পদ্ধতির মূলে আছে একটি নীতি ও অনুমান। তাই কোনো কোনো পদ্ধতি মানুষের অন্তর্বৃত্তি ও প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টি দিয়েছে, আবার কোনো পদ্ধতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রেরণাকে ভিত্তি করে মনস্তত্ত্বনির্ভর হয়ে উঠেছে। কোথাও গতানুগতিক শ্রেণীপাঠনের পরিবর্তে ব্যক্তিগত পার্থক্য অনুযায়ী শিখন ও শিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে, কোথাও বা কর্ম ও কার্যসমস্যাকে কেন্দ্র করে পদ্ধতির জন্ম হয়েছে।

মোট কথা কি শ্রেণীশিক্ষা, কি ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষণ—উভয় ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতা, ও আগ্রহ ও মানসিকতাকে কেন্দ্র করে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। যেমন, শিশু-শিক্ষার জন্য মণ্টেসরি ও কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি, ব্যক্তিগত পার্থক্য অনুযায়ী প্রয়োজন মেটাবার জন্য ডল্টন পরিকল্পনা, আগ্রহ সঞ্চারের জন্য কর্মভিত্তিক বাস্তবাভিমুখী কার্য-সমস্যা পদ্ধতি ও প্রোজেক্ট পদ্ধতি; এছাড়া ব্যাটাভিয়া পরিকল্পনা, ডেক্রলী পদ্ধতি, উইনেট্কা পরিকল্পনা—এইসব পদ্ধতির মূলে আছে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রেষণা সঞ্চারের জন্যে ব্যক্তিসত্তার বিকাশের ব্যবস্থা। এই সব পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে কি সম্ভাবনা আছে, কোথায় দুর্বলতা আছে সেদিকে দৃষ্টি রেখে শেখানোর আয়োজন করা হয়েছে। তাই অনেক সময় শিক্ষার্থীদের নিজের নিজের শক্তি, রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী এগিয়ে যাবার উৎসাহ দেওয়া হয়। তাই মূলতঃ এরা মনস্তত্ত্বভিত্তিক। তুলনা করলে দেখা যায় যে উইনেট্কা পরিকল্পনা ও ডল্টন পরিকল্পনা উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত শিক্ষাদানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উভয় পরিকল্পনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রতি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ফলে শিশু বা শিক্ষার্থী নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ পায়। আবার ডেক্রলী পদ্ধতি শিক্ষার্থীর ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি বিশেষ সজাগ তাই প্রতিটি পদ্ধতি শিক্ষার্থীর চাহিদাকে ভিত্তি করে পরিকল্পিত হয়েছে। প্রোজেক্ট পদ্ধতি ও কার্যসমস্যা পদ্ধতির ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে কোনো সমস্যার সমাধানের পথে এগিয়ে দেওয়ার জন্য সমস্যা-ভিত্তিক শিক্ষার পরিস্থিতি রচনা করা হয়। এই দুটি পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে সক্রিয়তায় উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের জীবনের অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করতে সহায়তা করে। তাই এই দুটি পদ্ধতিকে জীবনকেন্দ্রিক পদ্ধতিও বলা চলে। গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, কারণ এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং শিক্ষাকে

স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার আয়োজন করা হয়। সক্রিয়তাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করে এবং জীবনের প্রস্তুতি আনে।

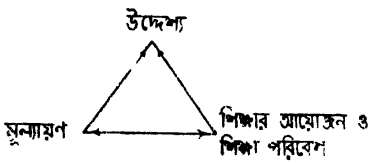
আগেই বলা হয়েছে যে, শিক্ষাবিজ্ঞানের মূল নীতিগুলিকে ভিত্তি করে শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভব হয়। আবার ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে শিক্ষাবিজ্ঞানও সমৃদ্ধ হয়। এইভাবে শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে, শিক্ষায় গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। শিক্ষা-পরিবেশের সংগেও শিক্ষাপদ্ধতির সম্পর্ক আছে, কারণ একই পদ্ধতি সকল পরিবেশে কার্যকরী হয় না। অনুরূপভাবে বলা যায় যে শিক্ষার্থীদের মানসিকতা, পটভূমিকা সব কিছুর ওপর শিক্ষাপদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে। শিক্ষকের কৌশল, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার ওপরও শিক্ষণ প্রণালীর কার্যকারিতা নির্ভরশীল। শিক্ষাবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে হলে চাই শিক্ষায় বিচিত্র পরিবেশ রচনা ও উপযুক্ত গবেষণা।

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষায় মূল্যায়ন

১। শিক্ষায় মূল্যায়ন ও তার তাৎপর্য

যে কোনো ক্ষেত্রে মূল্যায়নের বিশেষ তাৎপর্য আছে কারণ কোনো বিষয়ে আলোকপাত করতে গেলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়নের অবকাশ অনেক বেশী। শিক্ষক যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশন করছেন তা কতখানি কার্যকর হল জানতে হলে মূল্যায়নের প্রয়োজন। কেবল বীজ বপন করলেই চলবে না, কত বীজ বপন করে কত ফসল ফলানো যায় তা জানতে হলে পরিমাপের প্রয়োজন। আর সেই পরিমাপ নিয়ে জানা যায় কৃষিকার্যের কোনো ত্রুটি হয়েছে কি না। তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীদের তত্ত্ব, তথ্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিলেই হবে না; কিভাবে দিলে তা তাদের জীবনে সবচেয়ে ফলপ্রসূ হবে শিক্ষককে তাও জানতে হবে। আর তার জন্যে চাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন। অধ্যাপক ব্লুম এই মূল্যায়নের তিনটি দিককে তুলে ধরেছেন। আর একদিকে আছে শিক্ষার উদ্দেশ্য আর অন্যদিকে শিক্ষার আয়োজন ও পরিবেশ। কোন আয়োজন ও পরিবেশ রচনা করলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে তা জানতে হলে মূল্যায়নের সার্থকতা তো থাকবেই। তা না হলে শিক্ষা-প্রক্রিয়ার ও শিক্ষাপদ্ধতির ভুলত্রুটি ধরা পড়বে কি করে! মূল্যায়ন কেবল শিক্ষার্থীদের শক্তি ও ব্যক্তিগত পার্থক্যের ওপরই আলোকপাত করে না, শিক্ষকের শিখন পদ্ধতি ও শিক্ষার আয়োজনের ওপরও মূল্যায়ন যথেষ্ট আলোকপাত করে।



আধুনিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য কেবলমাত্র তথ্যগত জ্ঞান অর্জনই নয় তার লক্ষ্য হবে সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ। চিন্তন, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ছাড়াও

সামাজিক অভিযোজনের যে ক্ষমতা থাকলে মানুষ সমাজের যোগ্য সদস্য বলে বিবেচিত হতে পারে তার পরিপূর্ণ বিকাশও শিক্ষার লক্ষ্য। একদিকে আত্মিক ও সামাজিক বিকাশ, অন্যদিকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংগতি রেখে চলার ও সম্ভাবনাকে পরিণতি দেওয়ার শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই সব উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে দেওয়া যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয় তাহলে মূল্যায়নকেও সেই সব দিকে উদ্দিষ্ট হতে হবে। খন্ড খড বিভিন্ন অংশের পৃথক পৃথক পরিমাপই নয় একটা সামগ্রিক মূল্যায়নের আয়োজন না হলে শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই পরিমাপের থেকেও মূল্যায়নের তাৎপর্য অনেক বেশী। তবে মূল্যায়নের কাজের পরিমাপ কেবল সোপান মাত্র, কারণ পরিমাপই শেষ কথা নয়।

২। মূল্যায়নের সোপান

মূল্যায়নের কয়েকটি পর্যায় আছে। তাই সেই সোপানগুলি মূল্যায়নের কাজে লাগাতে হবে। যেমন—(ক) উদ্দেশ্য স্থাপন, (খ) আচরণগত পরিবর্তন ও তার বহিঃপ্রকাশ, (গ) এই পরিবর্তন আনার জন্য বিশেষ শিক্ষার আয়োজন (ঘ) এই পরিবতনের মূল্যায়নের জন্য অভীক্ষা প্রণয়ন বা অভীক্ষা সংগ্রহ, (ঙ) অভীক্ষা-লব্ধ ফলাফলের তাৎপর্য নির্ণয়।

দেখা যায় যে, এই মূল্যায়নকে বিজ্ঞানসম্মত করতে হলে সেখানে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাব একান্ত প্রয়োজন তা না হলে পরিমাপের কাজ নিখুঁত হয় না। শিক্ষাবিজ্ঞানকে কালোপযোগী করতে হলে প্রথম প্রয়োজন শিক্ষার ক্ষেত্রে তথ্য আহরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। একটি বিশেষ নৈর্ব্যক্তিক (objective , পদ্ধতি অবলম্বন না করলে নিছক তথ্য সংগৃহীত হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, এই তথ্যগুলির যথাযথ বিশ্লেষণের নৈপুণ্য না থাকলে কোনো সত্যে পৌছানো কঠিন। তাই বিচার-বিশ্লেষণ যতই নিখুঁত ও বিজ্ঞানসম্মত হবে ততই তার বৈজ্ঞানিক মূল্য বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এই তথ্যগুলির বিশ্লেষণই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, বিশ্লেষণের পর যে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে সেগুলির যথাযথ স্বরূপ নির্ধারণ করাও একটি কঠিন কাজ। কারণ এই সত্য নিরূপণ করতে গেলে চাই সার্থক মূল্যায়নের প্রয়োজন। মূল্যায়নের ধারণাকে স্পষ্ট করে তুলতে পারলে শিক্ষার ক্ষেত্রে তার যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হতে পারে।

আজ শিক্ষাক্ষেত্রে পরিমাপের পরিবর্তে মূল্যায়নের যে ধারণা গ্রহণ করা হয়েছে তাকে সার্থকভাবে রূপ দিতে হলে চাই মূল্যায়নের কাজে দক্ষ অনেক শিক্ষাব্রতী। এছাড়া নতুন নতুন অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে মূল্যায়নের পরিধির মধ্যে উদ্দেশ্য ও শিক্ষা-পরিবেশকে আনতে হবে।

ভিন্ন ভিন্ন উপায়ের মাধ্যমে মূল্যায়নের কাজ এগোতে থাকে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতির উপযোগিতা আছে। আগ্রহ, বিষয়ানুরাগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অভীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের প্রয়োগ চিরাচরিত। এর পরে আছে মানসিক শক্তি-সামর্থ্যের পরিমাপ। এর জন্যেও ভিন্ন ভিন্ন অভীক্ষার প্রচলন আছে। অবশ্য অর্জিত জ্ঞান পরিমাপের জন্য প্রশ্ন ও অভীক্ষার সাহায্য নেওয়া হয়। দৈহিক বা কায়িক যোগ্যতা, ব্যক্তিত্বের গুণাবলী ও আচরণগত বৈশিষ্ট্য নিরূপণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম ও পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়; তাদের মধ্যে কয়েকটি লিখিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে, আবার কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে। ইংরাজীতে এদের বলা হয় situational tests ও projective tests. এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্ব, প্রবণতা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে। কাজেই দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির প্রচলন থাকলেও কোনো পদ্ধতিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সমন্বয়ের প্রয়োজন। সব সময় মনে রাখা উচিত যে, সামগ্রিক মূল্যায়নের কাজ খুবই কঠিন। শুধু সীমিত ভাবে মানুষের পরিচয় মেলে এই সব মূল্যায়ন-পদ্ধতির মাধ্যমে। তাই আজও মনের ও ব্যক্তিত্বের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে নানা গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যে নতুন দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে, এই মূল্যায়ন পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য শিক্ষার্থীর প্রতি অবিচার করা হয়।

মূল্যায়নের সংগে আরও যে দুটি দিক জড়িত আছে তাদের একসংগে না দেখলে এই কাজ সম্পূর্ণ হয় না। উদ্দেশ্যের রূপায়ণ ও শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার সঞ্চার এই দুটি দিকেই শিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন আছে। উদ্দেশ্যগুলির বিস্তারিত বিবরণ ও স্পষ্টীকরণ একান্ত বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে আচরণগত পরিবর্তন প্রত্যাশা করা যায় তাকে স্পষ্টভাবে সামনে তুলে না ধরলে মূল্যায়নের অন্যান্য পর্যায়ের রূপায়ণ অপূর্ণ থাকে।

মূল্যায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর

মনন, চিন্তন ও দৃষ্টিভঙ্গির সুষ্ঠু বিকাশ সাধন করা। আর তা করতে হলে শিক্ষককে কয়েকটি দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন, যে অভিজ্ঞতাগুলি তিনি শিক্ষার্থীদের দিতে চান তা (ক) তাদের বয়সের পক্ষে উপযোগী কি না, (খ) অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য আছে কি না এবং (গ) সেগুলি উদ্দেশ্যমূলক ও অর্থপূর্ণ কি না। আসল কথা আমাদের বিদ্যালয় পরিবেশ যাতে আনন্দময় ও শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের পক্ষে অনুকূল হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিখনের পদ্ধতি ও শিক্ষা-সামগ্রীর আয়োজন করা একান্ত প্রয়োজন। আর দৃষ্টি থাকবে শিক্ষার্থীদের রুচিগত ও মানসিকতার বৈচিত্র্যের দিকে। তা না হলে বীজ বপনের আয়োজন নিরর্থক হবে। কখনও স্নেহের সিঞ্চন, কখনও আনন্দের পরিবেশন এইসব আয়োজনকে সৌরভমণ্ডিত করবে।

৩। মূল্যায়ন ও শিক্ষক

শিক্ষাব্যবস্থায় মূল্যায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। আর সেই মূল্যায়নকে যথাসম্ভব কার্যকরী করার জন্য শিক্ষককে এক বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে। শ্রেণীশিক্ষক থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক এই মূল্যায়নের কাজে সহায়তা করতে পারেন। কেবল কয়েকটি প্রশ্ন বা অভীক্ষা-প্রণয়ন করলেই মূল্যায়নের কাজ সম্পূর্ণ হয় না, মূল্যায়নের মধ্যে থাকবে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক আচরণের প্রতি দৃষ্টি। এই মূল্যায়নের ফলেই শ্রেণীকক্ষের পাঠনপ্রণালীর ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়তে পারে, তেমনি পাঠক্রম শোধনের কাজেও মূল্যায়নের যথেষ্ট ভূমিকা আছে। শিক্ষক তাই মূল্যায়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে শিক্ষা-পরিবেশ রচনায় পাঠনপ্রণালীর উদ্ভাবনে ব্রতী হবেন। কিভাবে মূল্যায়নকে বিজ্ঞানসম্মত করা যায় সেজন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে তাই মূল্যায়নকে ভাগ করে ফেলে প্রতিটি দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষকের এই জটিল কাজে এগোতে হবে।

৪। শিক্ষায় মূল্যায়নের পর্যায় ও উপায়

শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রতিটি স্তর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য। তাই বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়নের

উপযোগিতা ক্রমশঃই অনুভূত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করে তুলতে হলে মূল্যায়নের প্রতিটি ধাপ বা পর্যায় নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করা প্রয়োজন। অবশ্য এই ধাপগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নিম্নলিখিত পর্যায়ে মূল্যায়নকে বিশ্লেষণ করে প্রত্যেক স্তরের তাৎপর্য আলোচনা করার সার্থকতা আছে।

(ক) শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়

যে উদ্দেশ্যে মূল্যায়নের প্রয়োজন সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে কিভাবে এই কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে সে কথা চিন্তা করতে হবে। যেমন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে পঠন লিখন, কথোপকথন বা প্রকাশ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যায়নের উপায় নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। উদ্দেশ্য স্থির করার পর তা শিক্ষার্থীর আচরণে কি পরিবর্তন আনবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে তার বিচার-বিশ্লেষণ করার সার্থকতা আছে। সংক্ষেপে বলা যায়, উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা নির্ণয় না করলে শিক্ষার্থীর আচরণে বিশেষ কি পরিবর্তন আনা বাঞ্ছনীয় তা নির্ণয় করা কঠিন হয়।

(খ) শিশুর সুনিয়ন্ত্রিত কার্যাবলীর বিবরণ-সংগ্রহ

উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা-নির্ণয়ের পর কিভাবে এই উদ্দেশ্যে পেঁছানো যায় এবং কি পরিমাণে শিক্ষার্থী এই উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হয়েছে তার সঠিক বিবরণ সংগ্রহের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। একাধিক কার্যাবলী এবং অবস্থার মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কি কি কার্যাবলী ও অবস্থার প্রবর্তন করলে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার সঞ্চার হতে পারে তা বিবেচ্য। বিদ্যালয়-জীবনে এই সব অবস্থা ও পরিবেশের সৃষ্টি করা তাই একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়।

(গ) পরিমাপের জন্য পর্যবেক্ষণ ও অভীক্ষা নির্বাচন

শিক্ষার্থীর আচরণে যে সব পরিবর্তন প্রত্যাশিত সেগুলি সুষ্ঠুভাবে পর্যবেক্ষণ করবার জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতি ও অবকাশ রচনা করতে হবে। এক একটি পরিস্থিতিতে এক একরকম আচরণের মূল্যায়নকে কার্যকরী করার জন্য উপযুক্ত অভীক্ষা বা পরিমাপ পদ্ধতি নির্বাচন করার প্রয়োজন আছে। কোনো প্রামাণ্য অভীক্ষার অভাবে নতুন অভীক্ষার প্রবর্তন করা যায়।

(ঘ) মূল্যায়নের উপায় নির্ধারণ

এটি মূল্যায়নের একটি বিশেষ স্তর বা ধাপ। কারণ সঠিক উপায় নির্ধারণ না করলে মূল্যায়নের কাজ বিজ্ঞানসম্মত হয় না। কোন্ উদ্দেশ্য কতখানি সফল হয়েছে তা পরিমাপের জন্য মূল্যায়নের সঠিক উপায় নির্ধারণ করতে হবে। দেখতে হবে উপায়টি সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করতে পেরেছে কি না। তাছাড়া উপায়টির প্রয়োগ সহজসাধ্য কি না এবং তা ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষককে একই পরিমাপ দিতে পারে কি না তা দেখে নেবার প্রয়োজন আছে।

(ঙ) প্রয়োগ ও তথ্যসংগ্রহ

উপায়গুলির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তনের তথ্য সংগ্রহ করা যায়। অবশ্য উপায়ের তারতম্য অনুযায়ী তথ্য প্রদানেও তারতম্য দেখা যায়। যেমন লিখিত অভীক্ষায় শিক্ষার্থী নিজেই লিখিত বিবরণ দেয়, আবার পর্যবেক্ষণের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীর আচরণ সম্বন্ধে তথ্য ব্যাপকভাবে লিপিবদ্ধ করেন।

(চ) প্রাপ্ত তথ্যের সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ

শুধু তথ্য বা শিক্ষার্থীর আচরণের বিবর্তন সংগ্রহ করাই যথেষ্ট নয়, তাদের যথাযথ বিশ্লেষণ করারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ তার ওপর সিদ্ধান্ত নির্ভর করে। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে গেলে শিক্ষকের নৈর্ব্যক্তিক অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন আছে।

(ছ) মূল্যায়ন সম্পর্কে কয়েকটি সতর্কবাণী

মূল্যায়নের উপায় ও কাঠামোগুলিকে সহজতর করে তোলা দরকার। উপায়গুলি কোনো সময় লক্ষ্যহীন, কোনো সময় অত্যন্ত দীর্ঘ হয়। তাতে মূল্যায়নে যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা থাকে না।

অল্প সময় ব্যবধানের ফলগুলিকে দীর্ঘসময় ব্যবধানের ফল দিয়ে যাচাই করে নেওয়া দরকাব। কেননা প্রাথমিক ফলগুলিকে একান্ত বলে মনে করে নিলে অনেক সময় শিক্ষার্থী সম্বন্ধে স্থির ধারণা করা যায় না, কারণ ভবিষ্যতে সেই ফলগুলি শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযুক্ত নাও হতে পারে।

দলের ওপর মূল্যায়ন পদ্ধতি বিশেষ প্রয়োগ না করে ব্যক্তির ওপরই বেশী প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

সরল উপায়ে মূল্যায়নের উপায়গুলিকে প্রয়োগ করতে হবে। তা নাহলে মূল্যায়নের সার্থকতা থাকে না।

সংক্ষেপে বলা যায় যে বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বন করে মূল্যায়নের কাজ ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। শিশুর বা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মূল্যায়ন তাই খণ্ড-ছিন্ন, আংশিক বা ত্রুটিপূর্ণ উপায়ের ওপর ভিত্তি করে সম্ভবপর হতে পারে না। শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সব শক্তি বা বৃত্তি আছে তার ক্রমপরিণতি ঘটে এবং সেই পরিণতির মাত্রা ও ধারা সম্পর্কে ধারণা নিতে হলে মূল্যায়নের বিশেষ বিশেষ উপায় প্রয়োগ করা হয়। যেমন লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, প্রশ্নতালিকা পদ্ধতি (questionnaire), পর্যবেক্ষণ, হাতে-কলমে পরীক্ষা (practical examination), সাক্ষাৎকার (interview), নির্ধারণের মাপকাঠি (rating scale), অভিক্ষেপণ (projective test), পরিস্থিতির মাধ্যমে পরীক্ষা (situational test).

দেখা যায় মূল্যায়নের উপায় ভিন্ন প্রকারের হলেও তাদের মধ্যে কয়েকটি সাধারণ গুণ থাকা প্রয়োজন। যেমন (ক) নৈর্ব্যক্তিকতা, (খ) যথার্থতা, (গ) নির্ভরযোগ্যতা, (ঘ) ব্যবহারিক গুণ, (ঙ) তুলনামূলক বিচারের ক্ষমতা, (চ) উপযোগিতা।

৫। মূল্যায়নের স্থান ও উপযোগিতা

শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। যেমন তথ্য আহরণের ক্ষেত্রে বা বিষয়বস্তু আয়ত্তীকরণের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি আশা করা যায় তেমনি শিক্ষণের ফলে দৃষ্টিভঙ্গিতে, আচরণে নৈপুণ্য-অর্জনে ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে এই পরিবর্তন প্রত্যাশিত। দৈহিক, মানসিক, চারিত্রিক সর্বদিক দিয়ে প্রগতি আনয়ন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। কতদূর সেই প্রগতি ঘটেছে তা জানবার জন্য মূল্যায়নের সার্থকতা আছে। কারণ মূল্যায়ন না থাকলে বা মূল্যায়ন ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি প্রগতির সঠিক নিশানা দিতে পারে না। অবশ্য এই মূল্যায়নকে বিজ্ঞান-ভিত্তিক করে না তুললে তার উপযোগিতা কমে আসবে। তাই শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মূল্যায়নের পদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত করতে হবে। কিভাবে তা সম্ভবপর হয় সে বিষয়ে বিচারবিবেচনার অবকাশ আছে। যে কোনো বিষয়ে মূল্যায়ন

করতে হলে মূল উদ্দেশ্য ও শিক্ষাগত পরিবেশের কথা ভুললে চলবে না। সামগ্রিক দৃষ্টি নিয়ে মূল্যায়ন করলে তা কেবল শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তনের মাত্রা নির্দেশ করে না ; শিক্ষক, নির্দেশক ও শিক্ষাপরিবেশের প্রভাবের ওপর আলোকপাত করে। তাই মূল্যায়নকে বাদ দিয়ে শিক্ষাপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে আজ কোন সন্দেহ নেই। নানাভাবে মূল্যায়ন শিক্ষাব্যবস্থাকে সার্থক ও সম্পূর্ণ করে তোলে। কারণ মূল্যায়নের ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি ঠিকমতো শিক্ষার্থীর কাছে স্পষ্ট হয়েছে কিনা এবং সেই উদ্দেশ্যগুলি কতখানি সফল হয়েছে তা জানা যায়। এরই মাধ্যমে শিক্ষক সমীক্ষা করে দেখতে পারেন, বুঝতে পারেন তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি কতখানি কার্যকরী হয়েছে, শিক্ষার উপকরণ ও প্রদীপন কতখানি ফলপ্রসূ হয়েছে।

তাছাড়া মূল্যায়ন শিক্ষার লক্ষ্যগুলি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে পাঠ্যসূচীকে যাচাই করতে সহায়তা করে। কোনো পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে শিক্ষার্থী কি কি উদ্দেশ্যে পৌঁছুতে পারে তা মূল্যায়নের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। প্রতিটি শিক্ষকের উচিত বিষয়বস্তুকে উদ্দেশ্যাভিমুখী করে উপস্থাপিত করা এবং তা সহজ হয় মূল্যায়নের মাধ্যমে।

কেবল শিক্ষাপদ্ধতিই নয়, শিক্ষকও মূল্যায়নের কল্যাণে বিশেষ লাভবান হন। অনেক সময় পরীক্ষকের প্রশ্ন শিক্ষার লক্ষ্যের দিকে উদ্দিষ্ট থাকে না, ফলে প্রশ্ন এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে অসংগতি দেখা দেয়। তাই মূল্যায়ন পদ্ধতি শিক্ষার্থীকেও বিশেষ সহায়তা করে।

মূল্যায়নের আরও কয়েকটি উপযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, শিক্ষার্থীকে শিক্ষা এবং বৃত্তির ক্ষেত্রে নির্দেশ দেওয়া সহজ হয়ে ওঠে মূল্যায়নের মাধ্যমে। শিক্ষার্থীর প্রগতিপঞ্জী দেখে তার সম্পর্কে যে ধারণা জন্মায় তার ওপর ভিত্তি করে তাকে পরিচালনা করলে তা বিজ্ঞানসম্মত হবে। এই বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি আজ শিক্ষার যে কোনো ক্ষেত্রেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বৃত্তিতে, পরিচালনায় ও শিক্ষার নির্দেশের ক্ষেত্রে এই মূল্যায়ন বিশেষ মূল্যবান। সংক্ষেপে বলা যায় যে, শিক্ষার যে কয়েকটি উপাদান ও পর্যায় আছে তার মধ্যে মূল্যায়নের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কেবল পাঠক্রমই নয়, শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ কতখানি উদ্দেশ্যাভিমুখী হয়েছে তা মূল্যায়নের সাহায্যে বোঝা সহজ হয়। অবশ্য শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্দেশ্য

যেমন পরিবর্তনশীল তেমনি শিক্ষার অন্যান্য উপাদানও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। কাজেই মূল্যায়নের পদ্ধতিরও সময় সময় পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয়।

৬। বিদ্যালয়ে মূল্যায়ন—সর্বোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণী (প্রগতিপত্র)

বর্তমানে অনেকে Examination কথাটি তুলে দিয়ে Evaluation কথাটি প্রবর্তিত করার পক্ষপাতী। কারণ পরীক্ষা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য হল মূল্যায়ন, শিক্ষাথীর প্রতিটি কর্মের মূল্য নির্ধারণ করা এবং সেগুলি এমনভাবে লিপিবদ্ধ করা যাতে তার প্রতিটি দিকেরই ঠিক মূল্য আমরা দিতে পারি। পরীক্ষায় আমরা ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ কতকগুলি দিকের পরিচয় পাই বটে, কিন্তু তার সামগ্রিক পরিচয় পাই না। বর্তমানে আবার শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব নির্ধারণের প্রশ্নটি প্রকট হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিত্ব-নিরূপণ মাত্র কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে করা যায় না। এর জন্য চাই সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ। শিক্ষার্থীদের প্রতিটি সম্ভাবনাকে জানা এবং তার জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করাই বর্তমানে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই বর্তমানে Evaluation-এর প্রশ্নটি বেশ প্রকট। Evaluation programme-এর চারটি স্তর থাকবে ঃ

(১) মূল্যায়নের কোনো পরিকল্পনা করার আগে সেই পরিকল্পনার লক্ষ্য ও আদর্শ ঠিক করতে হবে, এবং সেই লক্ষ্য যাতে বর্তমান যুগের সামাজিক পরিবেশকেই উন্নততর করে তার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

(২) সেই লক্ষ্যে পেঁছিতে গেলে যে ধরনের শিক্ষার পরিবেশ রচিত হওয়া উচিত তার জন্যে চেষ্টারও প্রয়োজন আছে।

(৩) প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের আচরণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা, আচরণের পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করা এবং শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র কতদূর বিস্তৃত তার পরিচয় রাখতে হবে।

(৪) নির্ধারিত লক্ষ্যে কতদূর শিক্ষার্থীরা পেঁছিছে, তা জানবার জন্যে উপযুক্ত অভীক্ষা (Test) ব্যবহার করার সার্থকতা আছে। বর্তমানে চারদিকে নব নব পরিকল্পনায় নতুন নতুন লক্ষ্যে পেঁছিবার ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে, এবং তার জন্যে নানারকম উপায়ও উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন, বর্তমানে শিক্ষায়

নতুন ধারা প্রবর্তন করা হয়েছে Multipurpose পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের মানসিক সামর্থ্য ও প্রবণতার পরিচয় পাবার জন্য নানা-রকম Test-এর কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত অভাব এখনও মিটছে না।

বর্তমানে শিক্ষাগত নির্দেশ ও ব্যক্তিগত নির্দেশের প্রয়োজন আমাদের দেশে প্রকট হয়েছে. একথা দেশের সমস্ত চিন্তানায়কেরা উপলব্ধি করেছেন।

কিন্তু এই নির্দেশকে সার্থক করে তুলতে হলে চাই ছাত্রকে জানা, প্রতিটি পরিবেশেই ছাত্রের আচরণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা। সেইজন্যেই Cumulative Record Cards বা সর্বোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণী একান্ত প্রয়োজনীয়। শিক্ষার পরিবেশ কতটা উন্নত হয়েছে এবং নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছবার পক্ষে ঐ পরিবেশ কতখানি অনুকূল তার উপর বার বার জোর দিয়েছে মুদালিয়ার কমিশন।

"But neither the external examination nor the internal examination, singly or together, can give a correct and complete picture of a pupil's allround progress at any particular stage of his education, yet it is important for us to assess this in order to determine his future course of study or his future vocation. For this purpose a proper system of school records should be maintained for every pupil indicating the work done by him in the school from day to day, month to month, term to term and year to year."

সুতরাং শিক্ষার্থীর প্রগতির মূল্যায়নের জন্য Record Card হবে একটি দর্পণ। এই কার্ড শিক্ষার্থীর মনের প্রতিটি দিকের পরিচয় বহন করবে।

(ক) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর একক সাহায্যের জন্য তাকে ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য করা এবং ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা। তাই Record Card-এ যে শিক্ষার্থীর বিবরণ লিখতে হবে সেই শিক্ষার্থীকে এককভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শিক্ষার পদ্ধতি হচ্ছে ব্যক্তিগত পদ্ধতি। এটিও তারই একটি দিক। এই তথ্যলিপিটি হবে confidential বা গোপনীয়। এটি গোপনীয় এই অর্থে যে, কেবলমাত্র বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যেই এটি সীমাবদ্ধ থাকবে।

(খ) শিক্ষার্থীর জীবনের প্রতিটি দিকেরই পরিচয় এতে থাকবে।

প্রত্যেকটি বিবরণ সংগ্রহ করার পর ভালো করে পরীক্ষা করে ও তাকে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বলে জেনে নিয়ে তবে পত্রে তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের এই বিবরণ বিদ্যালয়-জীবনের স্থিতিকাল ধরে চলবে।

(গ) এই প্রগতি-পঞ্জীর বিবরণগুলি অত্যন্ত সহজ হবে, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রত্যেকটি বিবরণ নিখুঁত ও সত্য হয়। স্থান অপূর্ণ থাকলে ক্ষতি নেই; কিন্তু কোনো অসত্য বা সংশয়জনক বিবরণ যেন এতে স্থান না পায়। তবেই এটিকে জীবন্ত ও প্রকৃত লিপিচিত্র বলে মেনে নেওয়া যাবে।

(ঘ) এতকাল ধরে বিবরণী পত্র বলতে কেবলমাত্র পরীক্ষার নম্বরের বিবরণই বোঝা যেত, কিন্তু প্রগতিপঞ্জী তা থেকে আলাদা। তাই বলে এতে যে পরীক্ষার নম্বর থাকবে না, তা নয়। কারণ পরীক্ষার নম্বরের মধ্য দিয়েও আমরা ছাত্রছাত্রীদের বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই। এই বিবরণীতে কেবলমাত্র শিক্ষাথীর বিষয়-জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যাবে না, তার সামগ্রিক পরিচয়ও পাওয়া যাবে। এতে শিক্ষাথীর শারীরিক, সামাজিক, চারিত্রিক বৃত্তি, বিষয়-জ্ঞান, পাঠ্যতালিকা-বহির্ভূত বিষয়ে অনুরাগ প্রভৃতির জীবন্ত লিপিচিত্র পাওয়া যাবে।

(ঙ) শিক্ষার্থী যাতে নিজেকে জানতে পারে, নিজের অবস্থা বুঝতে পারে, নিজের উন্নতির পথ তৈরী করতে পারে, এর লক্ষ্য হচ্ছে তার জন্যে সহায়তা করা। তাছাড়াও যাতে সে নিজের শিক্ষাগত অভিজ্ঞতাকে যাচাই করে নিতে পারে তার একটি অপূর্ব সুযোগ ঘটে এই প্রগতি-পঞ্জীর মাধ্যমে।

Record Card-এর জন্য তথ্যসংগ্রহ

তথ্যসংগ্রহের সময় কি কি নীতি গ্রহণ করা হবে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিম্নলিখিত নীতি অনুযায়ী তথ্য গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়:

(১) এই প্রগতি-পঞ্জীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে জানা ও জানানো। অতএব কোনো বাঁধাধরা নিয়মে বলে দেওয়া যায় না কোন্ কোন্ তথ্য গ্রহণ করা উচিত, আর কোন্ কোন্ তথ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। তবে যে ঘটনা বা যে তথ্য ছাত্রছাত্রীর ক্রম-পরিণতি ও বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেই সমস্ত ঘটনাই লিপিবদ্ধ করা উচিত। বিকাশ শারীরিক, বৌদ্ধিক, আনুভূতিক ও ব্যক্তিত্বমূলক হতে পারে। সামগ্রিক বিকাশের কথাই আমাদের বিবেচনা করা উচিত।

(২) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বা আনুভূতিক বা সামাজিক সত্তার পরিচয় পাওয়ার জন্য যে সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়, সেগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহার। সুতরাং সেই তথ্যগুলিই গ্রহণ করা উচিত যেগুলি তার ব্যবহারে লাগবে।

ধারাবাহিক প্রগতি-পঞ্জীর মধ্যে যে সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়, সেগুলিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ

(ক) সাধারণ বিবরণ জ্ঞাপক (General Data)—এই বিভাগে পড়ে স্কুলের নাম ও ঠিকানা, ছাত্রের বা ছাত্রীর নাম ও ঠিকানা, পিতার নাম, ভর্তি হওয়ার তারিখ ইত্যাদি। যদি কেউ অন্য বিদ্যালয় থেকে আসে তবে সেই বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা, জন্মতারিখ, শ্রেণী, সেকশন (বিভাগ), অভিভাবকের বৃত্তি ও গুণাবলী, ইত্যাদি নানা প্রকারের তথ্য এতে সংগৃহীত হয়।

(খ) পরিবেশগত এবং পটভূমিকাগত বিবরণ (Environmental and Background Data)—এই পর্যায়ে পড়ে শিক্ষার্থীর গৃহের পরিচয়, পরিবারে তার স্থান, অন্যান্য ভাইবোনের সংখ্যা, পিতামাতার গুণ, পিতামাতার বৃত্তি, প্রতিবেশীর বা পাড়ার পরিচয়, পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা, পরিবারের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের প্রতি শিক্ষার্থীর আনুভূতিক বা প্রক্ষোভসূচক সম্পর্ক বা প্রতিক্রিয়া, পিতামাতার পারস্পরিক সম্পর্ক, পিতা ও শিক্ষার্থীর এবং মাতা ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্পর্ক। এই সমস্ত বিষয় তার বৃদ্ধি ও বিকাশের পথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

(গ) মানসিক বিবরণ (Mental Data)—এই পর্যায়ে পড়ে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতির বিবরণ। সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে আমরা তথ্য সংগ্রহ করি। কিন্তু তাছাড়াও, শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া, আলোচনা চক্রে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া এই সমস্ত তথ্য থেকে তার বিষয়োন্নতির বিবরণ পাওয়া যেতে পারে।

(ঘ) মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ (Psychological Data)—এই পর্যায়ে পড়ে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন গুণাবলী বা উপাদান। সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক ও তার আগ্রহ, ঝোঁক, সামর্থ্য, প্রেরণা, প্রক্ষোভ সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি—এই সমস্ত তথ্য এর পর্যায়ভুক্ত।

(ঙ) সামাজিক বিবরণ (Social Data)—শিক্ষার্থী নিজেকে তার

পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে কিভাবে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করছে, তার বন্ধু-বান্ধব কি ধরনের, তাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে কেমন করে. বিভিন্ন সামাজিক কর্মে সে কিভাবে অংশ গ্রহণ করে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মে সে যোগদান করছে কিনা, সে কোন্ কোন্ খেলাধুলোয় অংশ গ্রহণ করে, বিভিন্ন খেলাধুলোয় তার অবস্থা কি, অন্য কোনো সংগঠনে অথবা সমাজোন্নয়নমূলক কর্মে সে যোগদান করে কিনা এই সমস্ত তথ্য এই পর্যায়ে পড়ে।

(চ) অন্যান্য বিবরণ (Other Data)—বিদ্যালয়ের বাইরেও শিক্ষার্থীর একটি বিরাট ক্ষেত্র রয়েছে, সেখানে তার ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়। তার শিক্ষাগত কোনো কাজ. বৃত্তি-নির্বাচনকারী কোনো কাজ, কাজকর্ম করার আগ্রহ ও অভিজ্ঞতা, তার পড়াশুনা করার একাগ্রতা ও ইচ্ছা. তার বিভিন্ন অভ্যাস এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার তথ্য এই পর্যায়ে পড়ে।

৭। ব্যক্তিগত পার্থক্য নিরূপণ ও মূল্যায়ন

দৈহিক ব্যক্তিগত পার্থক্য ছাড়া মানসিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এখন আমরা মানসিক পার্থক্যের দিকটি আলোচনা করব।

(ক) মানসিক পার্থক্যের সহজাত কতকগুলি মানসিক শক্তি লক্ষ্য করা যাক। বুদ্ধির সংজ্ঞা নিয়ে মনোবিজ্ঞানী মহলে বাকবিতণ্ডা কম হয়নি। তবুও বুদ্ধিকে এড়িয়ে যেতে আজ পর্যন্ত কেউই পারেন না। কারণ মানুষের জীবনের এটিই মূলধন। এই মূলধন যার যত বেশী সে তত লাভবান হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বুদ্ধি সকলের সমান হয় না। এই বুদ্ধিকে মাপার জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা Mental Age বা মানসিক বয়স বা I. Q. বার করেছেন।

(খ) এই পার্থক্য দেখা যায় ব্যক্তিত্বে। ব্যক্তিত্ব মানুষের সামগ্রিক আচরণ। প্রত্যেক পরিস্থিতিতেই মানুষ নিজের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয়। এক ঘটনাতে সব লোকেরই প্রতিক্রিয়া সমান হয় না। কারণ সকলের দৈহিক ভিত্তি তো সমান নয়! আবার তার সঙ্গে অনেক কিছুরই পার্থক্য আছে, তার জন্যে সকলের ব্যবহার সমান হয় না। কারোর মধ্যে কতকগুলো গুণের প্রাধান্য থাকে।

(গ) এই পার্থক্য চরিত্রেও দেখা যায়। চরিত্র হল সম্পূর্ণ ক্ষমতা-প্রাপ্ত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তিকে যখন মানুষের নৈতিকবোধ ও সামাজিক মানদণ্ডের মাধ্যমে বিচার করা হয়, তখন হয় চরিত্রের উদ্ভব। ভিন্ন ভিন্ন

লোকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নৈতিক বোধ দেখা যায়। অনুসন্ধান করলে তা পাওয়া যাবে তার পরিবেশে। কোনো লোক এক রকম পরিবেশে অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করবে, অপর কোনো লোক তাতে ধৈর্যের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখাবে। কোনো লোক সৎ, কেউ বা অসৎ, কোনো লোক হয়ত বদ-মেজাজী। অবশ্য দৈহিক, স্নায়বিক ও গ্রন্থিগত বৈসাদৃশ্যের ফলে চরিত্রে বিভিন্নতা দেখা যায়।

(ঘ) আগ্রহের পার্থক্যই মানুষকে বিভিন্ন পথে নিয়োজিত করে। আর তার ফলেই আজ পৃথিবীর সভ্যতা এতটা এগিয়েছে। এক একজনের আগ্রহ বিশেষ একটি দিকেই দেখা যায় এবং সেই আগ্রহই তাকে এনে দেয় তার কর্ম-প্রবণতা। কারোর আগ্রহ সাহিত্যে - তার সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা সাহিত্যের দিকেই নিবিষ্ট হবে। কারোর আবার আগ্রহ দেখা যায় বিজ্ঞানে,—তার মন-প্রাণ নিয়োজিত হবে বিজ্ঞানে। ভিন্ন ভিন্ন আগ্রহ প্রকাশের জন্যে বিভিন্নমুখী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন। আজ আমাদের দেশের এই সর্বার্থ-সাধক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূলে আছে আগ্রহের প্রকাশকে সুযোগ দেওয়া। কারণ শিশুদের আগ্রহ ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন আগ্রহ থাকার জন্যে সব শিশুকে এক ছাঁচে ঢালা উচিত নয়।

সাহিত্যের দিকে যার আগ্রহ তার পথ হবে সাহিত্যের পথ। যার পথ হবে যন্ত্রের দিকে, তার পথ হবে ইঞ্জিনীয়ারিং, যার পথ হবে বিজ্ঞানের দিকে, বুঝতে হবে তার সেই দিকেই আছে আগ্রহ। আগ্রহই মানুষকে নিয়ে যায় চরম সার্থকতার দিকে এবং এই আগ্রহ প্রত্যেক লোকের বিভিন্ন।

(ঙ) সকলের সামর্থ্য সমান নয়। সামর্থ্য বলতে আমরা বুঝি ability. সকলের আগ্রহ যেমন বিভিন্ন সেই আগ্রহকেই রূপদান করবার মত ability বা সামর্থ্যও তেমনি আলাদা আলাদা। কারোর সামর্থ্য আছে প্রচুর এবং তার ফলে সে মনের আগ্রহকে সম্পূর্ণ রূপদান করতে পারে, কারোর বা সামর্থ্য কম। সামর্থ্য হল কোনো কাজকে সম্পূর্ণ করার মানসিক শক্তি।

(চ) সামর্থ্য যেমন আলাদা, aptitude-ও তেমনি আলাদা আলাদা। Ability আর aptitude দুটো এক নয়। ability হল কোনো কাজকে সম্পূর্ণতার পথে পরিচালনা করার মানসিক প্রস্তুতি যার মূলে থাকে দৈহিক যোগ্যতা, আর aptitude হচ্ছে তারই তত্ত্বগত দিকটি। আগ্রহকে কোনো বিশেষ দিকে চালনা করার মত ইচ্ছা থাকলেও এই ইচ্ছা হয়ত ঠিক বাস্তব রূপ নাও

পেতে পারে। তাহলে প্রবণতা (aptitude) থাকলে শক্তি (ability) নাও থাকতে পারে।

(ছ) মনঃপ্রকৃতি বা temperament বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। মনঃপ্রকৃতির সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে দেহের শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থির, আর তার সঙ্গে রক্ত ও পরিপাক-প্রক্রিয়ার। মনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, কোনো কোনো লোকের মনঃপ্রকৃতি নির্ভর করে তার সমস্ত গ্রন্থির সঠিক কাজ করার ওপর। এগুলো জন্মগতভাবে পাওয়া। কারোর আড্রেনাল গ্রন্থি তীব্রভাবে কাজ করে, কারোর মধ্যে বা থাইরয়েডের ক্ষরণ ভাল হয় না। মেজাজী হওয়া, খিটখিটে হওয়া, কথায় কথায় ক্ষুব্ধ হওয়া কি সকলের মধ্যে দেখা যায়? দেখা গেলেও তা কি সব সমান ধরনের? মনঃপ্রকৃতি আবার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের একটি উপাদান। তবে অবশ্য নানা রকম ভাবে মনঃপ্রকৃতিকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করা যায়। যেমন—শিক্ষা বা ওষধ ইত্যাদি দ্বারা গ্রন্থিগুলোর লুপ্ত কাজ করিয়ে নেওয়া যেতে পারে এবং বর্তমানে এ সম্পর্কে বেশ গবেষণা চলছে, তাহাদের প্রচেষ্টাও সার্থক হচ্ছে।

সাধারণতঃ দেখা যায় গড় মানুষ গড়েই থাকে। সকলেরই গড়ের দিকে একটা প্রবণতা দেখা যায়। যদি কোন মানুষ একটা দিকে খুব কম হয়, অন্য দিকে একটু ভাল হয়ে পুষিয়ে নেয়, যাতে গড়টা ঠিক থাকে। যেমন ক্লাসে অশোক অংকতে ভয়ানক কাঁচা কিন্তু বাংলায় সত্তর পেয়ে পুষিয়ে নেয়। সুতরাং এটা সাধারণতঃ দেখা যায়—একটা দিয়ে অপরটা আমরা পুষিয়ে নিই। একে বলা হয় Law of compensanion.

এতে আবার আর একটা ব্যাপার আছে। সাধারণতঃ বুদ্ধিটাই ব্যক্তিগত পার্থক্যের প্রধান মানদণ্ড। কারণ মানুষে মানুষে পার্থক্য বুদ্ধির ক্ষেত্রে যত প্রকট, তেমন আর কিছুতেই নয়। এ নিয়ে নানা মনীষী নানা কথা বলেছেন। কেউ বলেন, বুদ্ধি জটিল বিষয় চিন্তা করার শক্তিমাত্র, কেউ বলেন কর্মকুশলতা, আবার কারো মতে বুদ্ধি এমন এক ক্ষমতা যার প্রভাবে মানুষ তার পরিবেশের মধ্যে থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে মানিয়ে চলতে পারে—যার প্রভাবে মানুষ সমস্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে।

যন্ত্রীর যন্ত্রিত্ব, শিল্পীর শিল্পত্ব তার ব্যক্তিত্ব নয়, ব্যক্তিত্ব গঠনের একটা প্রধান উপাদান মাত্র। সুতরাং বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব কখনই আমরা এক মনে করব না। বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, প্রথম দৃষ্টিতে যে ব্যক্তিত্ব

আমাদের প্রভাবিত করে, এমনও হতে পারে বুদ্ধির জৌলুসের অভাবে সে একেবারে সাধারণ পর্যায়ে নেমে আসে। আবার সাধারণ মানুষ নিকট হওয়ার ফলে তার বুদ্ধির দীপ্তি তাকে আমাদের চোখে মহান্ করে তোলে।

সর্বদিক বিচার করে আমরা বলতে পারি, ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করা যায় মানুষের গতিতে, অনুভূতিতে, আবেগে, ব্যবহারে, যত্নশীলতায়, কিন্তু বুদ্ধির পরিমাপ হয় মাত্র তার কর্মের মাধ্যমে।

এখন ব্যক্তিগত পার্থক্য মাপা যাবে কি ক'রে? এ নিয়ে রোজ চলছে নিত্য নতুন গবেষণা এবং তার ফলে দিনরাত কত রকমের জিনিসপত্র বেরোচ্ছে। ব্যক্তিগত পার্থক্য মাপার একমাত্র উপায় হচ্ছে পরীক্ষা, যাকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলে অভীক্ষা বা test. কত রকমের যে test বেরোচ্ছে তার ঠিক নেই, ব্যবহারিক জগতে ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অবদান—যার ফল আমরা হাতে-নাতে পাচ্ছি।

বুদ্ধির তারতম্য নির্ধারণের জন্য বিনের (Binet) এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। তিনি সাইমনের (Simon) সহযোগিতায় বুদ্ধি-পরিমাপের প্রথম অভীক্ষা প্রণয়ন করলেন ১৯০৫ সালে। তার ফলে মানুষের মধ্যে ধীশক্তি অনুযায়ী স্তরভেদ করা সম্ভব হল। যার বুদ্ধ্যঙ্ক খুব বেশী তাকে প্রতিভাবান বলে নির্দিষ্ট করা যেমন সম্ভব হল তেমনি যার বুদ্ধ্যঙ্ক খুব কম সে জড়বুদ্ধি বলে বিবেচিত হল। মোট কথা এই বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q) দেখে শিক্ষার্থীর সম্ভাবনা ও তার উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রচলিত হল।

যে অভীক্ষার দ্বারা কেবলমাত্র বুদ্ধিরই পরীক্ষা হয় তাকে বলে বুদ্ধিমাপক অভীক্ষা (Intelligence Test). এতে ছেলের জন্মগত পাওয়া বুদ্ধি, যে মূলধন ভাঙিয়ে সে খাবে, সেইটিকে মাপা হয়।

আর যে অভীক্ষার দ্বারা বুদ্ধি মাপা হয় না, কোনো বিষয়ে কারোর জ্ঞানের পরীক্ষা করা হয়—তাকে বলে জ্ঞানমাপক অভীক্ষা (Achievement Test). ইতিহাসে কার কতটুকু জ্ঞান, সেটা পরীক্ষা করার জন্য Achievement Test. আবার test-গুলোর উত্তর দেওয়ার ধরন বিবেচনা করে তাদের কতকগুলো ভাগে ভাগ করতে পারি। Test-টা যদি কেউ মুখে জিজ্ঞাসা করে, আর তার উত্তর যদি মুখেই দিতে হয়—তাহলে অভীক্ষাটি হবে—মৌখিক বা oral.

আর যদি লিখে উত্তর দিতে হয় তা written বা লিখিত।

Oral Test-এ তাহলে সাধারণতঃ একজন পরীক্ষা করতে পারে একজনকে।

সুতরাং একজনকে যেখানে পরীক্ষা করা হয় তাকে বলে Individual Test. এ অবশ্য লিখিতও হতে পারে। যেমন একজনকে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হল। এটা লিখিত ব্যক্তিগত অভীক্ষা বা written Individual Test.

আর যেখানে একসংগে অনেককে উত্তর দিতে দেওয়া হয়, সেটা হল Group Test—এটা কিন্তু লিখিত।

এখন, আমরা আগে অভীক্ষার দুটো ভাগ করেছি, যেমন বুদ্ধিমাপক ও জ্ঞানমাপক।

অভীক্ষার আবও কয়েকটি প্রকার আছে। যেমন।

(১) Individual Intelligence Test.

(২) Group Test of Intelligenee.

(৩) Individual Achievement Test.

(৪) Group Test of Achievement.

আমরা oral, written এই দুই দুইরকম Test-এর কথা জেনেছি, এর মধ্যে আর এক রকমের Test আছে। কাজের মধ্যে দিয়েও কাউকে পরীক্ষা করা যেতে পারে। যেমন আমি একটা ভারতের Map আঁকলুম, তাতে রাষ্ট্রগুলো বসালুম, বসিয়ে রাষ্ট্রগুলো কেটে দিলুম. তোমাকে বললুম ওগুলো জুড়ে দিয়ে গোটা ভারতের মানচিত্রকে উদ্ধার কর। এটা তো oral নয়, written-ও নয়, এটা হল কাজের মাধ্যমে অভীক্ষা তাই এর নাম Performance Test. তাহলে, কি Intelligence, কি Scholastic সব টেস্টই oral, written বা performance হ'তে পারে।

এই প্রসংগে আর দুটো খুব চলতি নামের সংগে পরিচয় করিয়ে দিই - একটা হল Viva voce, আর একটা Paper-pencil Test. Vivavoce আর কিছুই নয়—Oral Individual Test. সামনে কেউ বসে বসে কোনো প্রশ্ন করছে আর সামনে বসে বসে তার উত্তর দিতে হচ্ছে—এ হল Viva voce. আর অনেকে একসংগে চেয়ার টেবিলে বসে Test দিচ্ছে এবং লিখিত ভাবে তার উত্তর দিতে হচ্ছে—এ হল Paper-pencil Test.

আগেই বলা হয়েছে বুদ্ধি মাপার জন্যে Binet Simon Scale প্রথম পদক্ষেপ, তাদের Test বিরাট। ভিন্ন ভিন্ন রকমের ছেলেদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন Test Series আছে, Benet-Simon-Scale-এ সব প্রশ্নই Oral এবং একজন একজনেরই Test নিতে পারে। প্রত্যেক টেস্টের উত্তর থেকে তার একটা বুদ্ধির

বয়স পাওয়া যাবে- সেই বয়সের নাম Mental Age. ওটাকে সংক্ষেপে M. A. বলা হয়। আর তার আসল বয়সটা হল Chronological Age বা C. A. তাহলে C. A. আর M. A. যদি সমান হয় তাহলে বয়সানুযায়ী বুদ্ধি ঠিক। আর বেশী হলে একজন বুদ্ধিমান, কম হলে বোকা। সেই M. A. কে শতের অনুপাতে প্রকাশ করলে হয় বুদ্ধ্যঙ্ক বা Intelligence Quotient বা I. Q. অর্থাৎ $\text{বুদ্ধঙ্ক} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{শারীরিক বয়স}} \times ১০০$

Benet পথ দেখালেন, তার পর অনেক Test অনেক বার করেছেন যাতে বুদ্ধি মাপা যায়। যেমন Weschler এর প্রণীত অভীক্ষা।

তেমনি আবার জ্ঞানের বয়সও নির্ধারণ ক'রে জ্ঞান মাপা যায়। যেমন ভূগোলে Test করে তার জ্ঞান মাপা হচ্ছে ভূগোলের Test দিয়ে জ্ঞানের বয়সও বা Educational Age বা E. A. মাপা যায়ঃ

$$\frac{E.\ A.}{C.\ A} \times 100 = E.\ Q$$

তাহলে দেখা যায় যে একজনের বুদ্ধি, জ্ঞান ইত্যাদি মাপার জন্যে মনোবিজ্ঞানীরা নানারকম ভাবে অভীক্ষা নির্ণয় করেছেন।

তেমনি আবার Personality বা ব্যক্তিত্ব মাপার জন্যে কত রকমের অভীক্ষা বেরিয়েছে---যেমন, Interview, Questionnaire, T. A. T. Projective Test, Case-History ইত্যাদি। এ সব দেখা যাবে ব্যক্তিত্ব অধ্যায়ে।

সেই রকম আবার কারোর গতি মাপবার জন্যে আছে Speed Test. এই টেস্টে করা হয় কি ?—না, কোন্ কাজে কত Speed তা জানার জন্যে একই রকমের কাজ সকলকে করতে দেওয়া হয়, যেমন কোন অংক কে কত তাড়াতাড়ি করতে পারে। অথবা কতকগুলো প্রশ্ন, তাকে উত্তর করতে দেওয়া হয়। যখন সে আরম্ভ করল এবং যখন সে শেষ করছে তার সময়টা ভাল করে লিখে রাখা হয়। তারপর তার সময় দেখে speed নির্ধারণ করা হয়। শুধু তাই নয়, কত তাড়াতাড়ি সে কোন্ সমস্যার সমাধান করতে পারে, সেটাও Speed Test-এর একটা অংগ। তাকে মৌখিক কোনো সমস্যা দেওয়া হল—কত তাড়াতাড়ি সে তার সমাধান করতে পারে তা লক্ষ্য করা হল। এইভাবে Speed Test-কে নানারকম কাজে লাগানো হয়, Speed-টা বুদ্ধির একটা অংশ।

Speed Test-এর সংগে আবার আছে Accuracy Test. যেমন কত

তাড়াতাড়ি কেউ কোনো কাজ করতে পারে—সেটা দেখার। তেমনি কতটা ঠিক করতে পারে—সেটাও ঠিক তেমনি দেখার, তা না হলে, কেউ হয়ত খুব তাড়াতাড়ি অনেক কাজ করে, কিন্তু যা করে তা ভুল, সেই Speed নিয়ে কি লাভ? Accuracy Test, Speed এবং তার সঙ্গে কতটা সে ঠিক করতে পারে তার একটা খসড়া নেওয়া হয়। যেমন কাউকে বলা হয়—প্রথমে একটা শূন্য তারপর একটা ড্যাস তারপরে দুটো শূন্য দুটো ড্যাস, তারপর তিনটে শূন্য তিনটে ড্যাস, কিন্তু তারপর শূন্য বাড়তে থাকবে কিন্তু ড্যাস ঐ রকম ভাবে চলবে, কর।

দেখা যাবে সে কত তাড়াতাড়ি কত ঠিক করতে পারে।

0 — 00 — — 000 — — — 0000 — 00000 — —

000000 — — — 0000000 — 00000000 — —

000000000 — — —

এই রকম। Speed এবং Accuracy Test দুটো প্রায় হাত ধরাধরি করে চলে।

তারপর আবার Ability Test-এর প্রশ্ন জাগে। Ability হল সামর্থ্য; কে কোন্ কাজ কতটা পারে তার মাপ। Ability-কে মনোবিজ্ঞানীরা নানাভাগে ভাগ করেছেন।

(১) Numerical Ability বা সংখ্যাবোধক সামর্থ্য

(২) Musical Ability বা সঙ্গীতমূলক ,,

(৩) Verbal Ability বা বাচনিক ,,

(৪) Reasoning Ability বা যৌক্তিক ,,

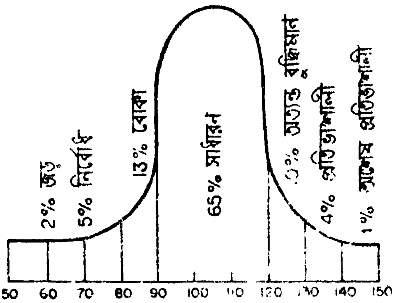
এই সমস্ত সামর্থ্য পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের অভীক্ষা আছে। যেমন Musical Ability Test, Technical Ability Test ইত্যাদি।

Ability Test-এ কার কতদূর সামর্থ্য বা কার কোন্‌টায় বেশী সামর্থ্য তা জানা যায় এবং তাই বুঝে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করা যায়। ফলে, Ability Test-এর প্রধান কথা হচ্ছে শিশুর সামর্থ্যটি জানা।

কারোর প্রবণতা যন্ত্রের দিকে—তাকে জোরজার করে ঢোকানো হল ওকালতিতে।

এছাড়া Range Test-কার কোন্ কাজে লেগে থাকার সামর্থ্য কতখানি, সেটাও অভীক্ষার দ্বারা বোঝা যায়। Range Test এ ধৈর্য্য শ্রম ও কর্ম-চপলতার অভীক্ষা হয়। Range-Test ছাড়া Difficulty Test ও আছে।

এতে করা হয় কি ?—কে কতদূর কোন্ কাজ করতে পারে ? তার মাপ নিয়ে কোথায় তার শুরু হয়, সেটা ঠিক করা হয়।



কার কত I. Q. থাকে বা কি রকম I. Q. থাকলে তাকে কি বলা যেতে পারে ?

জড় হয় সাধারণতঃ 60-এর মত I. Q. হলে, 80 পর্যন্ত নির্বোধ, 90 পর্যন্ত বোকা, 90 থেকে 120 পর্যন্ত সাধারণ মানুষ দেখা যায়। পৃথিবীতে এরাই সংখ্যায় প্রচুর। তারপর আরম্ভ হল বুদ্ধিমানদের পালা। এদের বুদ্ধি-অঙ্ক 120 র বেশী। অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রতিভাশালীদের বুদ্ধি 140 আর 150 বা তার বেশী বুদ্ধ্যাঙ্ক থাকলে তাদের বিশেষ প্রতিভাশালী বলা যায়। এরা সংখ্যায় খুব কম। 160-এ যে-সমস্ত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ।

তারপরে আবার কোন্ ধরনের বুদ্ধিমান লোক শতকরা কত ভাগ পাওয়া যায় তারও একটা হিসেব পাওয়া যায়। যেমন খুব জড় বুদ্ধি লোক 2%, নির্বোধ লোক 5%, স্বল্পবুদ্ধি সম্প্রদায় মাত্র 13%। অধিকাংশই সাধারণ লোক তাদের I. Q. 90 থেকে 120 এবং শতকরা পয়ষট্টি ভাগ লোক এই পর্যায়ভুক্ত।

সাক্ষাৎকার (Interview)—একটি ব্যক্তির সামগ্রিক পরিচয় পেতে হলে সাক্ষাৎকারের বিশেষ সার্থকতা আছে। এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ব্যক্তির প্রকৃতি, দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ে। নানাভাবে এই সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হতে পারে।

প্রথমেই ইন্টারভিউয়ারকে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বিশ্বাস আদায় করতে হবে। তিনি যে তার সমস্যাবলীর এক অংশীদার, সেগুলোকে মন দিয়ে শুনে তার এক সমাধান করে দেবেন—এরকমের একটা ধারণা অভীক্ষার্থীর মনে জাগাতে হবে। তিনি তার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন এবং তাকে যতদূর সম্ভব সুস্থ

রাখতে চেষ্টা করবেন। এমন কোনো প্রশ্ন করা উচিত নয় যাতে ব্যক্তি উত্তেজিত হন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটি হবে সাহায্যকারী, সমালোচনামূলক নয়, অথচ তাঁর মনে থাকবে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি। যেহেতু তিনি কয়েকজনকে পরপর ইন্টারভিউ করবেন, সেহেতু তিনি সকলকে যতদূর সম্ভব একই অবস্থায় ফেলতে চেষ্টা করবেন এবং সব সময় একজনকে অপরের সঙ্গে তুলনা করে দেখবেন। অভীক্ষার্থীর ব্যবহার থেকে তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটা ধারণা করার মত জ্ঞান ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা তাঁর থাকা চাই।

আর একটা কথা, অভীক্ষার্থীর প্রথমের ব্যবহার দেখে অনেক ইন্টারভিউয়ার তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অনেক ধারণা করেন। কিন্তু অনেক সময় ভুল হয়। কারণ, অভীক্ষার্থী যতক্ষণ না আত্মবিশ্বাস পাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ইন্টারভিউয়ার যা ধারণা করবেন, তার মধ্যে অনেকগুলিই ভুল হবে। অতএব অভীক্ষার্থীর প্রাথমিক ব্যবহার থেকে তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে চূড়ান্ত ধারণা করা উচিত নয়। তবে তাঁকে অবশ্য অভীক্ষার্থীর প্রাথমিক ব্যবহারের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, কারণ সেগুলোও তার ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ের ইঙ্গিত দেবে।

অতএব সহজে বোঝা যায়, ইন্টারভিউয়ারকে কত সূক্ষ্মদর্শী ও অভিজ্ঞ হতে হবে। তার ওপর অভীক্ষার্থী যখন কোনো প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে তখন তার ভাবভঙ্গি, কথা বলার সময়ে মানসিক সুস্থতা, তার স্বর সমস্ত দিকেই ইন্টারভিউয়ারকে নজর রাখতে হবে। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি ইন্টারভিউ কি রকমের হয় আর যিনি সেটা নেবেন তাকেও কি ধরনের হ'তে হবে?

(২) কেস্ হিস্ট্রী পদ্ধতি (Case-history Method) ঃ

যখন কেউ কেউ কোনো বিশেষ আচরণের জন্য সাধারণ থেকে আলাদা হয়ে যান, তখন তিনি একটি 'কেস' হয়ে দাঁড়ান এবং তার সেই আচরণের কারণটি দূর করতে গেলে সেটির প্রচুর অনুসন্ধান প্রয়োজন। 'কেসে'র তথ্যানুসন্ধানটি কেস্-হিস্ট্রী পদ্ধতি।

কেস্-হিস্ট্রী কি করে নেওয়া যেতে পারে? প্রথমে তার শৈশবাবস্থার বিবরণ নিতে হবে, তার পিতামাতা বা পরিবারস্থ কারো কাছ থেকে। অথবা তাঁদের ইন্টারভিউ করে সমস্ত ব্যাপার জানা প্রয়োজন। তাঁর নিজের শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত জীবনের খোঁজ নেওয়া দরকার। তার সামর্থ্য, শক্তি, আগ্রহ, ঝোঁক ইত্যাদির পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এর থেকে তার বিশেষ আচরণের ইঙ্গিত

পাওয়া যাবে, এইটেই তাকে আরোগ্যলাভের পথে নিয়ে যাবে অর্থাৎ তাকে তার বিশিষ্ট আচরণ থেকে মুক্ত করার পথ বলে দেবে।

(৩) **রেটিং স্কেল** (Rating Scale)--ব্যক্তিত্বের যে-কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে বিভিন্ন মাত্রানুযায়ী কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এইটি তিনমাত্রা, পাঁচমাত্রা বা সাতমাত্রার হতে পারে।

যেমন ধরা যাক, ব্যক্তিত্বের একটি বৈশিষ্ট্য আবেগময়তা, এর তিনমাত্রা স্কেল কি হবে :—

আবেগময়তা	আবেগময়তা	আবেগময়তা
খুব	সাধারণ	নেই
....	×	....

এর মধ্যে মাঝেরটায় দাগ দেওয়া হয়েছে। কারণ এটিই তার আছে। এতে তিনটি মাত্রা আছে যার মধ্যে তার আবেগময় গুণটিকে ধরতে হবে—তাই এটি Three-Point Rating Scale.

আবার এই আবেগময়তার পাঁচমাত্রা (Five-Point Rating Scale) হতে পারে।

আবেগময়তা			আবেগময়তাশূন্য	
অতিরিক্ত	বেশ	মাঝামাঝি	বেশ	অতিরিক্ত
...	....	×	....	......

এখানে পাঁচটা ঘর এবং হিসাব ক'রে তার মধ্যেই তার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

আবার এই আবেগময়তাকে সাতমাত্রাবিশিষ্ট বা Seven-Point Rating Scale-এ আনলে কি রকম হবে ?

আবেগময়তা				আবেগময়তাশূন্য		
চরম	খুব বেশী	বেশী	মাঝামাঝি	বেশী	খুব বেশী	চরম
.	.... .	......	×	....	....	.. ...

কিন্তু Rating Scales গ্রাফের মধ্যে দিয়ে দেখানো যেতে পারে এবং সেইটেই ভাল। সেক্ষেত্রে 0, 50, 100 ইত্যাদি শতকরা ভাগে ভাগ করে

নিতে হয়। যেমন ব্যক্তিত্বের বিশেষ একটি গুণ কারোর মধ্যে পরিপূর্ণ থাকলে তার শতকরা ১০০ ভাগ, আর সাধারণ মানুষের মত হয় তাহলে ৫০% ভাগ। অন্যান্য মাত্রাতেও সেগুলি গ্রাফে চিহ্নিত করা সহজ।

(৪) **প্রশ্নাবলী** – কতকগুলি প্রশ্ন অভীক্ষার্থীর কাছে ধরা হবে যার উত্তরে সে 'হাঁ' 'না' দিয়ে যাবে। তার সেই উত্তর দেওয়া থেকে বুঝে নিতে হবে, তার ব্যক্তিত্ব কি ধরণের। তার জন্যে আগে থেকে প্রশ্ন ঠিক করে রাখতে হয়। প্রশ্নগুলো সাধারণত কি ধরনের হবে ?

প্রথমতঃ, কতকগুলো পরিস্থিতি চিন্তা করা গেল। এখন অভীক্ষার্থীর কাছে সেই পরিস্থিতির কথা তুলে তাকে বলতে দিতে হবে কোন্‌টি সবচেয়ে বেশী দুঃখময় বা অনুরূপ বা অনেকগুলোতে তাকে দাগ দিতে বলা হবে, তার থেকে তার মানসিক ঝোঁকের একটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

এই সমস্ত প্রশ্নাবলী সুব নির্ভরযোগ্য, কারণ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে বারংবার অভীক্ষার উত্তর দিতে বললেও উত্তরের পরিবর্তন হয় না। তবে এর যাথার্থ্য (Validity) সম্পর্কে প্রশ্ন খুবই জটিল। কারণ, প্রশ্ন করার সময় চিন্তা করতে হবে, এর উত্তর থেকে অভীক্ষার্থীর মনের বা ব্যক্তিত্বের কোন্‌ দিকটির পরিচয় চাওয়া হচ্ছে। যেমন কোন অভীক্ষার্থী স্নায়বিক রোগগ্রস্ত (Neurotic) কিনা জানবার জন্যে যে যে প্রশ্ন করা হয় সেগুলি বা সেই ধরনের পরিস্থিতি তাদের এড়িয়ে যেতে দেখা যায়।

তাছাড়া ব্যক্তির আগ্রহ ও ইচ্ছা এই ব্যক্তির নির্ণায়ক প্রশ্নাবলী থেকে জানতে পারা যায়। সাধারণতঃ মানুষের আগ্রহ নিম্নলিখিত বিষয়ের যে কোনো একটিতে বেশী হয় ঃ

(ক) যান্ত্রিক, (খ) বাণিজ্যিক, (গ) বৈজ্ঞানিক, (ঘ) সাংগীতিক, (ঙ) সমাজকল্যাণমূলক, (চ) সাহিত্যিক, (ছ) শৈল্পিক ইত্যাদি।

নানাধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে তার আগ্রহটি কোন্‌ দিকে তা জানতে পারা যাবে। সে সাধারণতঃ তার বিশ্রাম সময়ে কি করতে ভালবাসে ? ছুটির দিন লেখাপড়া ছাড়া তার কি করতে ভাল লাগে বা কোন্‌ কোন্‌ জিনিস তার তৈরী করতে ভাল লাগে ? এই ধরনের কতকগুলো প্রশ্নের মাধ্যমে তার বিষয়ানুরাগ ও আগ্রহ পরীক্ষা করা যায়।

এইটা তার ভাবী বৃত্তি নির্বাচনে সাহায্য করবে। সুতরাং শুধু ব্যক্তিত্বই নয়, প্রশ্নাবলীর একটা ব্যবহারিক দিক আছে এবং সেটা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

প্রশ্নাবলীর দ্বারা অভীক্ষার্থীর মানসিক অনুরাগ বোঝা যায়। তার পক্ষে অর্থনৈতিক সামাজিক মতবাদ, সমাজবাদ, পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদ বা আন্তর্জাতিকতাবাদ-এর কোন্‌টার প্রতি তার সমর্থন আছে সে সম্পর্কে ধারণার মাধ্যমে—তার ব্যক্তিত্বের ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু একজনের উত্তরের সঙ্গে অপরের উত্তর মেলালে অনেক সময়ে তুলনামূলকভাবে তাদের আগ্রহ, অনুরাগ ও মতবাদ বোঝা যায়।

(৫) **উপাদান-বিশ্লেষণ** (Factor Analysis) ঃ--আমরা ব্যক্তিত্বের উপাদান বা Traits পর্যায়ে ব্যক্তিত্বে ১২টা এবং ১৬টা Traits-এর আলোচনা করেছি। সেইগুলোকে আমরা Factor বা উপাদান বলে মনে করতে পারি। প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের উপর কতকগুলি করে প্রশ্নের উত্তর অভীক্ষার্থীকে দিতে বলা হল, প্রশ্নগুলো এমন করে করা হবে যে, সেই Factor-টার ওপর তার ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা হয়ে যাবে। এখন সেই প্রত্যেকটি Factor-এর উত্তর বেছে একটি Factor-এর সঙ্গে আর একটি Factor-এর সহগামিতা বা অনুবন্ধ নির্ণয় করা হল এই পদ্ধতির অংশ বা প্রক্রিয়া।

এইরূপ একটি Factor-এর সঙ্গে আর একটি Factor-এর অনুবন্ধ নির্ণয় করার কারণ কি? কারণ হচ্ছে—সাধারণতঃ Factor-গুলি পরস্পর মিলিত হয়ে থাকে। এক একজনের মধ্যে এক একটি Factor বা সংলক্ষণ দেখা যায়। আর একটা Factor-এর সঙ্গে হয়ত অন্য একটার নিকট সম্পর্ক থাকতে পারে। এখন Factor analysis প্রক্রিয়ায় পরস্পর Factor-গুলোর সহানুবন্ধ নির্ণয় করলে তার মধ্যে সমস্ত Factor-গুলো কিভাবে যুক্ত তা ধরা পড়ে। এই বিশ্লেষণের ফলে ব্যক্তিত্বের কোনো সমস্যা আছে কিনা, তারও প্রমাণ পাওয়া যাবে।

(৬) **বাধ্যতামূলক নির্বাচন-পদ্ধতি** (Forced-Choice Technique) ঃ অভীক্ষার্থীদের দুটি বিকল্প প্রশ্নের সামনে হাজির করা হয়—সেই দুটির মধ্যে একটি তাকে নির্বাচন করতে হবে। বিকল্প দুটো না হয়ে তিনটে হতেও পারে। ঐ তিনটির মধ্যে কোন্‌টি তার কাছে সবচেয়ে ভাল লাগে? এখন এক-একটি Factor ধরে যদি প্রশ্নগুলি করা যায়—তাহলে বিকল্পগুলির মধ্যে একই ধারা থাকবে – সুতরাং অভীক্ষার্থীর কাছ থেকে সেই সেই Trait সম্পর্কে বেশ পরিচয় পাওয়া যাবে।

(৭) **অবস্থাকালীন পরীক্ষা** (Situation Test) ঃ—অনেক সময়

প্রশ্নাবলীর মধ্যে থেকে ব্যক্তিত্বের প্রকৃত ছবিটি পাওয়া যায় না। যেমন কারোর আত্মপ্রত্যয় জানবার জন্যে প্রশ্নাবলী দেওয়া হল—তার থেকে সে যদি জানে তার আত্মপ্রত্যয়ের পরীক্ষা হচ্ছে তাহলে তার সাধারণ মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাবে না। আবার যদি সে তা না জানে তাহলেও তার সেই উপাদানটির পরিচয় সে নাও দিতে পারে। অথচ তাব মধ্যে হয়ত সেই উপাদানটি বর্তমান।

সেইজন্যে এমন কয়েকটি অবস্থায় ছাত্রকে পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা করা হয়, যার ফলে তার মানসিক চিত্রটি ভালভাবে প্রতিফলিত হতে পারে।

যেমন আগের দিন ছাত্রদের একটা প্রশ্নপত্র দেওয়া হল। বলা হল এর মধ্যে যে যে কথাটির উচ্চারণ তোমার জানা আছে, সেগুলোতে (V) দাগ দাও, আর যেগুলোর উচ্চারণ জান না সেগুলিকে (×) দাও। সে দাগ দিল। তারপর তাদের উত্তরের একটা কপি নিজেদের কাছে রেখে (যাতে, তারা না জানে) পরের দিন তাদের উত্তরপত্রে তাদেরই নম্বর দিলে ছক দেখে। এখন কেউ হয়ত দাগ পাল্টে দিয়ে নিজের নম্বর বাড়িয়ে দেবে। এর থেকে তাদের সততার পরীক্ষা করা যেতে পারে।

আবার শব্দকোষ পরীক্ষাতেও এই ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

×	o	+	×	o	+	×	o	+
×	o	+	×	o	+	×	o	+
×	o	+	×	o	+	×	o	+
×	o	+	×	o	+	×	o	+

ধৈর্য পরীক্ষাতে Situation Test-এর উপযোগিতা আছে। সময়ের সীমা না রেখে অভীক্ষার্থীকে কোনো কাজ করতে দেওয়া হলে তার ধৈর্যের মাত্রা জানা যায়। যেমন, তাকে বলা হ'ল উপরের ছকে প্রথমে ঘরটিতে ×, তার পরেরটিতে o এবং তৃতীয়টিতে + দাও। —তারপর কে কতক্ষণ এই কাজে লিপ্ত থাকতে পারে সেটাই তার ধৈর্যের নির্দেশক হবে।

একই অভীক্ষার অন্যভাবে নির্দেশ দিলে তার স্মৃতি ও ধৈর্য দুটিরই পরীক্ষা হ'তে পারে।

(৮) **প্রতিফলন পরীক্ষা** (Projective Test)—এটি মনোবিজ্ঞানীদের ব্যক্তিত্ব পরিমাপনের সর্বাধুনিক প্রচেষ্টা। এতে ব্যক্তিত্বের একটা সামগ্রিক রূপ পাওয়া যায়। কারণ, এতে যে কাজটি অভীক্ষাথীকে করতে হয়, যাতে তার মনের চিত্র পাওয়া যায়। প্রতিফলন অভীক্ষা নানাভাবে নেওয়া হয়।

(ক) রর্সা কালির ছাপ অভীক্ষা (Rorschach Inkblot Test) ঃ—একটি কাগজে কালির বিন্দু (Drop) রেখে তাকে দু ভাঁজ ক'রে ঘষে দিলে একপাশে যেমন হবে, অপর পাশেও ঠিক সেই রকমই হবে। দুটো একসঙ্গে দেখতে কেমন যেন, এইবার সেইটি সামনে রেখে অভীক্ষাথীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—এটা দেখে কি বলে মনে হয়? সে চিন্তা করে একটা কিছু বলল। সেই কথাটি থেকে তার মনের অবস্থা বোঝা যাবে, যদি গতিশীল কোন বস্তুর কথা বলে তবে ধরে নিতে হবে, তার মনের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা আছে ইত্যাদি—

এইটির উদ্ভাবন করেন হারম্যান রর্সা (Herman Rorschach)। সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী তিনি। তিনি এই রকম দশটি অভীক্ষা তৈরী করেছেন। সেই দশটি থেকে অভীক্ষাথীর মনের প্রবণতা ও মানসিক গঠন বোঝা যাবে।

তবে রর্সা ছাড়া আরও অনেক ইংকব্লট্ অভীক্ষা আছে এবং অনেকে এগুলো তৈরী করে থাকেন। তবে এর উপযুক্ত ট্রেনিং না থাকলে উত্তর থেকে কারোর মনের অবস্থা জানা যাবে না।

(খ) কাহিনী-সংবোধন অভীক্ষা (Thematic Apperception Test বা সংক্ষেপে T. A. T.) ঃ—একটা কার্ডে একটা ছবি আছে। যেমন একটা ভাঙা বাড়ী, দরজাটা খিল দেওয়া, তাকের ওপরে একটা কুঁজো, একজন বর্ষীয়সী মহিলা, যেন একটু উত্তেজনাপূর্ণ। আর একটি মধ্যবয়সী মহিলা, তিনি কাঁদছেন যেন, একটি লোক ফুলপ্যান্টে বেল্ট পরাচ্ছে কি খুলে ফেলছে ঘরে অনেক জিনিসপত্র, আবছা। এই ছবিটি অভীক্ষাথীকে দেখিয়ে বলা হল – এর গল্পটি লিখ। সে লিখলো। এই লেখা থেকে তার মন বোঝা যাবে। অনেক সময় আবার তার ব্যক্তিত্বের অনেক উপাদানের অনেক পরিচয় পাওয়া যাবে।

অথচ মজার ব্যাপার এই যে ছবিটির অনেক ব্যাখ্যা হতে পারে ; অন্য একটি অভীক্ষাথীর গল্প হয়ত অন্য রকম হবে। এই বিভিন্নতা থেকে তাদের মনের পরিচয় পাওয়া যাবে।

আবার এরকমও হতে পারে—একটি গল্প আরম্ভ করা হল, কিন্তু অভীক্ষাথীকে বলা হয় সেটা শেষ করতে। সে শেষ করল, তার থেকেই তার মনের গতি বোঝা যাবে। সেই গল্পটি আবার আর কাউকে শেষ করতে বললে সে অন্যরকম ভাবে শেষ করবে, তবে একজন অভীক্ষাথীর উত্তর অপরকে শুনতে দেওয়া হবে না।

অন্য আর একরকম অভীক্ষার দ্বারাও অভীক্ষাথীর মনের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। একটি অক্ষর অভীক্ষাথীকে বলা হল এবং সেই অক্ষর শুনেই তার কোন কথা মনে পড়ে তা বলতে দেওয়া হল।

(গ) শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা (Word Association Test)ঃ— অভীক্ষাথীকে বিচ্ছিন্নভাবে একটা একটা করে কতকগুলি শব্দ আগে শুনিয়ে দেওয়া হল। প্রতিটি শব্দ শোনাবার পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে—"কোন্‌টা তোমার আগে মনে আসে?।" এতে কোন্‌টা উত্তর দিচ্ছে এবং উত্তর দিতে সে কত সময় নিচ্ছে দুটোই লক্ষ্য করা হবে। যে কথাটি বলছে সেইটি তার মনে আসছে; কেন সেইটিই মনে এলো? তার থেকে সেই শব্দটির অর্থের সঙ্গে নিশ্চয়ই তার মনের একটা সম্পর্ক আছে। আর যদি সেটা বলতে দেরী করে তাহলে বলতে হবে সে বলতে চায় না; কেন চায় না? এ-থেকে তার মনের complex বা জটের পরিচয় পাই। জটটি কি? না, এটি হ'ল মনের অন্তর্নিহিত চিন্তা যা বাইরে প্রকাশ না পেয়ে মনে মনেই আসন গেড়ে বসেছে এবং যা তার চিন্তাশক্তিকে প্রভাবিত করেছে।

এছাড়া অসম্পূর্ণ কোনো চিত্রকে সম্পূর্ণ করতে দিয়েও অভীক্ষাথীর ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করা যায়।

আলোচনা—

বর্তমান সমাজে মূল্যায়নের তাৎপর্য স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাই পরীক্ষার পরিবর্তে মূল্যায়ন কথাটি অধিক প্রচলিত. কারণ মূল্যায়নের পরিধি অনেক বিস্তীর্ণ। আর এই মূল্যায়নের বিবর্তন ঘটেছে শিক্ষাবিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে। ভিন্ন ভিন্ন অভীক্ষা, মূল্যায়ন-পদ্ধতি ও প্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে। বর্তমান মূল্যায়নের মধ্যে তাই কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। কেবলমাত্র শিক্ষাথীর বিষয়জ্ঞান, নৈপুণ্য ও ক্ষমতার পরিমাপ না করে শিক্ষার দ্বারা শিক্ষাথীর আচরণে কি পরিবর্তন আসছে তারও পরিমাপ করা মূল্যায়নের উদ্দেশ্য। সংক্ষেপে বলা যায় তথ্যজ্ঞান, দক্ষতা ও

ব্যক্তিত্ব বিচ্ছিন্নভাবে পরিমাপ না করে মূল্যায়ন, সংব্যাখ্যান, শিক্ষার্থী-জীবনের প্রগতি ও সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে অর্থপূর্ণ সংগতি উপলব্ধির পথে সহায়তা করে।

মানসিক শক্তির বিশ্লেষণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। ব্যক্তিগত ও দলগত ভাবে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত শক্তির ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়ার ওপর আলোকপাত করতে মূল্যায়ন তৎপর হয়েছে। তারই ফলে শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন উপাদানগুলিকে কিভাবে শিক্ষার্থীর প্রগতির দিকে উদ্দিষ্ট করা যায় সেদিকে দৃষ্টি পড়েছে। ক্রমপরিবর্তনশীল শিশুর আচরণ মাপার জন্য ধারাবাহিক প্রগতি-পত্রের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। এইসব প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষাবিজ্ঞান যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করেছে। নতুন নতুন শিক্ষাসংক্রান্ত গবেষণার মূল্যায়নের পদ্ধতি বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে ও শিক্ষকের ভূমিকায় পরিবর্তন আনছে। তাই আজ সমগ্র বিদ্যালয়-জীবনকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীর ক্রমপরিণতি সম্পর্কে পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সেখানে আছে পাঠক্রম, অন্যান্য কার্যক্রম ও সামগ্রিক পরিবেশের ভূমিকা। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক এই তিনটি মানবিক উপাদান শিক্ষাজগতে যে বিশেষ আসন গ্রহণ করেছে তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা পাই শিক্ষাবিজ্ঞানের নতুন পদক্ষেপকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষা-পরিবেশ

১। শিক্ষা-পরিবেশ ও শিক্ষাবিজ্ঞান—

শিক্ষায় পরিবেশের গুরুত্ব সম্পর্কে আজ কারও মনে সংশয়ের অবকাশ নেই। পরিবেশের প্রভাব যে কোনো ক্ষেত্রেই দুর্নিবার। পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থী যে অভিজ্ঞতা আহরণ করে তা তার ক্রমবিকাশে সহায়তা করে। বর্তমানে পরিবেশ সম্পর্কে চেতনা ও দৃষ্টি ক্রমশই সজাগ হচ্ছে। পরিবেশই পরীক্ষার্থীর আচরণ ও ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে। আর এই পরিবেশ রচনায় শিক্ষকের, অভিভাবকের ও সমাজসেবীদের যথেষ্ট ভূমিকা আছে। পরিবেশকে নানা পর্যায়ে ভাগ করা যায়। তার মধ্যে আছে গৃহপরিবেশ, গোষ্ঠীপরিবেশ, বিদ্যালয়পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ। প্রত্যেক পরিবেশই শিক্ষার্থীর জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। কেবল পরিবেশই নয়, পরিবেশকে কিভাবে কাজে লাগানো হয়, অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়ার ওপর শিক্ষার্থীর ক্রমপরিণতি নির্ভর করে। অনেক সময় দেখা যায় যে, ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মেও কোনো শিক্ষার্থীর বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না। আবার কখনো দীন ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে থেকেও অনেকে জীবনে উন্নতি করে। এর থেকেই বোঝা যায় যে, শিক্ষার্থীর সহজাত শক্তি ও প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিত্ব যতখানি তার বিকাশের জন্য দায়ী ; পরিবেশও তার বিকাশকে পূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে সহায়তা করে বা অন্তরায় হয়। তাই দুটিকে আলাদা করে দেখলে চলবে না, এই দুটির প্রভাবকে সামগ্রিকভাবে দেখে শিক্ষার পরিকল্পনা নিতে হবে।

একটি বিদ্যালয়ের শ্রেণীতে আমরা যে সব শিক্ষার্থীদের পাই তাদের মধ্যে আছে সব রকমের শিক্ষার্থী। কেউ আসে ধনী পরিবার থেকে, কেউ বা দীন-দরিদ্র গৃহপরিবেশ থেকে। কারও বংশ সম্ভ্রান্ত, আবার কারও সমাজের অতি নিম্নস্তরের বংশে জন্ম। তাই একটি শ্রেণীতে পরিবেশ ও পটভূমিকার বৈচিত্র্য থাকাই স্বাভাবিক। আর সে কথা মনে রেখেই তাদের শিক্ষা দিতে হবে। গৃহপরিবেশের প্রভাব খুবই প্রবল বলে মনে হয়। যে পরিবেশে শিক্ষার্থীর

শৈশব অতিবাহিত হয়, যে ভাবে সে লালিত-পালিত হয়, পরিবারের লোকজন যেভাবে শিশুর প্রতি ব্যবহার করে তার ওপর শিশুর ব্যক্তিত্ব অনেকখানি নির্ভর করে। যে পরিবারে শান্তি, স্বভাব ও সম্প্রীতি আছে সেখানে শিশু হয় বিনয়ী, তৃপ্ত ও সুখী। আবার যে পরিবারে বিবাদ-বিসম্বাদ, সংঘর্ষ লেগে থাকে সেখানে শিশুর ব্যক্তিত্ব সুষ্ঠুভাবে গড়তে পারে না। তাই এই গৃহপরিবেশকে উপেক্ষা করা যায় না। কিভাবে এই পরিবেশকে অনুকূল করতে সহায়তা করা যায় এই প্রশ্ন নির্ভর করে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে সহযোগিতার ওপর। এইজন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে মাঝে মাঝে আলাপ-আলোচনার অবকাশ থাকা চাই। বিদ্যালয়ের কর্মসূচীর মধ্যে শিক্ষক-অভিভাবক দিবস বা উভয় পক্ষকে নিয়ে মাঝে মাঝে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা থাকলে তা শিক্ষার্থীর পক্ষে অনুকূল হয়। শিক্ষক অভিভাবক উভয়েই যদি শিক্ষার্থীর কল্যাণ চান, উভয়ে যৌথ প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীর মঙ্গল সাধিত হতে পারে। এইরূপ বিশ্বাস ও পারস্পরিক নির্ভরতা থাকলে শিক্ষায় পরিবেশ রচনার সুবিধা হয়।

একটা কথা শোনা যায় যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী যা শিখে আসে, ঘরে এসে তা ভুলে যায়। যেন পরস্পরবিরোধী মূল্যবোধ জাগিয়ে দিয়ে গৃহ ও বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর মনে বিভ্রম সৃষ্টি করে। আর তার ফলে শিক্ষার্থীর ওপর শিক্ষক বিদ্যালয়ের প্রভাব ক্ষুণ্ন হয়। শিক্ষাবিজ্ঞানের কাজ হলো, এই বিরোধকে কমিয়ে এনে সামগ্রিক পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা।

শিক্ষাকে মাধ্যম করে অভিভাবকদের মধ্যে উপযুক্ত মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে গেলে চাই শিক্ষকদের ও সমাজসেবীদের নেতৃত্ব। আজ শিশু কিশোরদের শিক্ষার পরিকল্পনা নিতে হলে সঙ্গে সঙ্গে বয়স্কদের শিক্ষার কথাও ভাবতে হবে। এমন অনেক অভিভাবক আছেন যারা শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়েই দায়িত্বমুক্ত হতে চান। তাছাড়া শিক্ষাজগতের সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্কই নেই। এই সব অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ অভিভাবকদের জন্য জনশিক্ষার ব্যবস্থা করার বিশেষ সার্থকতা আছে। যাতে তাঁরা নিজের সন্তানদের শিক্ষায় অনুরাগী হন ও শিক্ষকদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজে এগিয়ে আসেন তার জন্যে অনুকূল এক বাতাবরণের সৃষ্টি করতে হবে। এই জন্য কখনো কখনো আলোচনা, বিতর্কসভা, আলোকচিত্র, শিক্ষাপ্রদর্শনী ইত্যাদি নানারূপ মাধ্যমের প্রয়োগ করলে সুফলের আশা করা যায়। গৃহপরিবেশের উন্নয়নে অভিভাবকের দায়িত্ব অনেকখানি। যাতে শিশু স্নেহ ও সমাদর পায়,

যাতে পরিবারের মধ্যে সে তৃপ্ত থাকতে পারে তার জন্য পরিবারের সকলকেই তার আবেগগত প্রয়োজনের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। সে যেন মনে কর যে, পরিবারের সকলের কাছে সে আদৃত। অনাদর, উপেক্ষা শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশকে ব্যাহত করে। ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করতে হলে শিশুকে কাজে উৎসাহ দিতে হবে এবং শিশুর সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু কিছু দায়িত্ব নেবার জন্যে প্রেরণা দিতে হবে ; তবেই তার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হবে ও দায়িত্ব-বোধের উন্মেষ ঘটবে। তার আত্মপ্রত্যয় জাগাবার জন্যও শিশুকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে দিয়ে তার কৃতিত্বের জন্য তাকে পুরস্কৃত করতে হবে, তবেই তার আত্মপ্রত্যয় জাগবে। এমনি ভাবে অধ্যবসায় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে শৈশবে অর্জন করতে সহায়তা করলে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন ফলপ্রসূ হবে। তাই দেখা যায় গৃহপরিবেশের ওপর শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ অনেকখানি নির্ভর করে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, গৃহপরিবেশ যত আনন্দের হবে ততই শিক্ষার্থী তা থেকে রস আহরণ করে পরিপুষ্ট হবে।

বিদ্যালয় জীবনে শ্রেণীপরিবেশের প্রভাবও কম নয়। শ্রেণীপরিবেশ বলতে বোঝায় শ্রেণীর সামগ্রিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ। ব্ল্যাক্ বোর্ড (black board) থেকে শুরু করে চার্ট (chart), নক্শা, মডেল ও এমনি আরও অনেক শ্রাব্যচাক্ষুষ সহায়তায় শিখনের কাজটি সুগম হয়। অবশ্য এই পরিবেশ রচনা করতে গেলে চাই শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রধান শিক্ষকের মধ্যে সহযোগিতা। অনেক সময় দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষার সাধারণ উপকরণেরই অভাব। যেমন ব্লাকবোর্ড, গ্লোব ইত্যাদি। এই সব উপকরণ প্রস্তুতির জন্য যদি বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের সহযোগিতায় অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহলে অল্পব্যয়ে শিক্ষণের মূল উপকরণগুলির অভাব হয় না। ব্ল্যাক্‌বোর্ড ছাড়াও ম্যাপ্ (map) প্রভৃতি অন্যান্য উপকরণও বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা নিয়ে তৈয়ারী করানো যায়। বিদ্যালয়ের প্রাচীর পত্র, হস্তলিখিত সাহিত্যপত্রিকা, ছোট ছোট প্রদর্শনী ইত্যাদি সরঞ্জাম পরিবেশকে সমৃদ্ধ করে। কেবল উপকরণই নয় বিদ্যালয়ের কার্যক্রমও সামগ্রিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে।

খেলাধুলোর আনন্দ আলোচনার অনুষ্ঠান, জন্মতিথি পালনোৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান বিদ্যালয় জীবনে প্রাণসঞ্চার করে। বিদ্যালয় জীবনের মানবিক পরিবেশই সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। এই পরিবেশের উন্নতি সাধন করতে গেলে চাই প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে নিবিড় সহযোগিতার

সম্পর্ক। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে এই সহযোগিতা গড়ে উঠবে। এইখানেই শিক্ষাবিজ্ঞানের বিশেষ ভূমিকা আছে। মানবিক শক্তির পূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে গেলে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। আর তা সম্ভব হয় যখন পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া সম্পূর্ণ হয়। ব্যক্তিগত মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও সামগ্রিক স্বার্থে একটা বোঝাপড়া আনা বোধ হয় অসম্ভব নয়।

শ্রেণীপরিবেশের বৈচিত্র্য আনতে গেলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাববিনিময়ের সুযোগ বাড়িয়ে দিতে হবে। যাতে তারা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আলোচনার মাধ্যমে অভিজ্ঞতার বিনিময় করতে পারে, শ্রেণীর মধ্যে সেরূপ অবকাশ সৃষ্টি করতে হবে। কখনো প্রতিযোগিতা, কখনো সহযোগিতা. কখনো পুরস্কার. কখনো বা তিরস্কার সুবিধামত যে কোনো মাধ্যম অবলম্বন করে শেখার কাজ সুগম করতে হবে। শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রয়োগে শিক্ষার পরিবেশকে অনেক সমৃদ্ধ করা যায়। প্রথমতঃ, তার বাস্তব ও শিক্ষাগত পরিবেশের উন্নতির জন্য শিক্ষার উপকরণকে ও শ্রেণীকক্ষের রূপকে উন্নত করা সম্ভব। যেমন শ্রেণীর মধ্যে মহাপুরুষদের ছবি ও উক্তি, নানারকম চিত্র ও চার্ট সংযোজিত করলে শ্রেণীর পরিবেশ অনেক অনুকূল হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় আগ্রহ জন্মায়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে যতই নিবিড় করা যায়, যতই তাদের প্রকাশের ইচ্ছা প্রবল হয় ততই শ্রেণীর পরিবেশ শিক্ষা ও শিক্ষণের পক্ষে অনুকূল হয়। সমগ্র শ্রেণী একটি স্বাস্থ্যকর গুঞ্জনে মুখর হয়ে ওঠে। অবশ্য এই পরিবেশ রচনার জন্য শিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রেণীর বাইরে সমগ্র বিদ্যালয়ের পরিবেশের ওপরও অনেক কিছু নির্ভর করে। যদি বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুন্দর হয়, আনন্দময় হয় তবে তা শিক্ষার্থীদের মনোরঞ্জন করে ও সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে। খেলাধুলা, উৎসব আয়োজন, মেলা, মজলিস প্রদর্শনী ও অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন আনন্দময় পরিবেশ কেবল শিক্ষার্থীদের প্রাণেই উদ্দীপনা জাগায় না, সমগ্র শিক্ষার পরিবেশকে সমৃদ্ধ করে। তাই দেখা যায় যে, এই সব পরিবেশ রচনা করতে গেলে সহযোগিতা ও নেতৃত্বের প্রয়োজন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক শিক্ষকদের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতার মনোভাব ও বিদ্যালয়-জীবনকে বৈচিত্র্যময় ও উন্নত করে। শিক্ষাবিজ্ঞানের কাজ হলো এই সামগ্রিক পরিবেশের উন্নতি সাধন করা। কখনো মনস্তাত্ত্বিক, আবার কখনো

বা সামাজিক ভিত্তিতে শিক্ষাবিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করে তার প্রয়োগ করলে এই পরিবেশ রচনা আরও সহজ হয়।

বিদ্যালয়ের সঙ্গে গোষ্ঠীজীবনের যোগসূত্র রচনা করাও শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। তাই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এমন অনেক প্রদর্শনী ও আলোচনার ব্যবস্থা করা যায় যাতে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরাও যোগ দিতে পারেন। গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা গণমান্য লোক তাঁদের মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ের উৎসব আয়োজনে আমন্ত্রণ জানালে বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবন সমৃদ্ধ হয়। বিদ্যালয়কে গোষ্ঠী ও সমাজের প্রত্যাশা পূরণ করতে গেলে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে চলবে না। যেমন শিক্ষককেও সমাজজীবনে বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে, তেমনি বিদ্যালয়েরও সমাজের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে একটি ভূমিকা আছে।

২। বংশগতি ও পরিবেশ

মানবজীবনে পরিবেশের প্রভাব যেমন প্রকট তেমনি সংস্কার ও বংশগতি জীবনকে প্রভাবিত করে। আপেক্ষিক গুরুত্ব কার বেশী এ নিয়ে আজও বিতর্কের অবকাশ আছে। বংশগতির রহস্য আজও সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হয় নি। কিন্তু সে যাই হোক ব্যক্তিগত পার্থক্যের কারণ নির্ধারণ করতে গিয়ে বংশগতি ও সহজাত সংস্কারের দিকে দৃষ্টি পড়ে। মনে প্রশ্ন জাগে একই বংশে জন্ম নিয়ে, একই পরিবেশে মানুষ হয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এত পার্থক্য কেমন করে সম্ভব হয়! তাই আজও পর্যন্ত বংশগতি ও পরিবেশ মানবজীবনে উভয়ের প্রভাব স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু কার কতখানি গুরুত্ব তাব কোনো সঠিক মূল্যায়ন হয় নি। অবশ্য শিক্ষায় বংশগতির তাৎপর্য থাকলেও তার ওপর বৈশিষ্ট্য নিয়ে শিশু জন্মায় তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। বংশগতি বলতে আমরা বুঝি পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বা অর্জিত দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়। আর এই পূর্বপুরুষ বলতে কেবল মা বাবাই নন, তারও ওপরে অন্যান্য পূর্বপুরুষদেরও বোঝায়। যেমন—ঠাকুরমা, প্রপিতামহ ইত্যাদি। কার কাছ থেকে কতখানি বৈশিষ্ট্য নবজাতক পাবে তা নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। আজ কৃত্রিম উপায়ে মানবশিশুর জন্ম দেবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কারের এমন কি জন্মাবার আগে দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের সীমিত নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাও চলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে

মানব-সমাজ আগের মতো সংস্কারকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে না পারলেও অন্ততঃ তাদের প্রভাবকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য এক নিরলস প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাছাড়া শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশকে যতখানি সম্ভব কাজে লাগাবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপায় ও পরিকল্পনা অবলম্বন করা হয়েছে। পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি ব্যক্তিকে যা পরিপূর্ণভাবে পরিবেষ্টিত করে আছে। এই প্রসঙ্গে স্টোন (Stone) বলেছেন—"Environment is a sum total of all the stimulations recieved by an individual from birth till death." এই পরিবেশ সারাজীবন উত্তেজকের কাজ করে এবং বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার খোরাক জোগায়। তাই কোন্ পরিবেশ কতখানি প্রভাব বিস্তার করবে তা নির্ভর করে কেবল পরিবেশের উপরই নয়, ব্যক্তিসত্তার উপরও। কেউ বা দুঃখে ভেঙে পড়ে, আবার কেউ দুঃখ থেকে শক্তি আহরণ করে। তাই পরিবেশকে কেবল এককভাবে চিন্তা করলেই চলবে না, ব্যক্তিসত্তা ও পরিবেশ উভয়কেই গ্রথিত করে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে শিক্ষার কাজে লাগাতে হবে।

পরিবেশ দুভাবে মানবজীবনকে প্রভাবিত করতে পারে। যখন মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হয় নি, যখন সে মাতৃগর্ভে তখনো পরিবেশের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়; আবার ভূমিষ্ঠ হবার পর যে পরিবেশে সে লালিত-পালিত হয় তার প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যতই মানবশিশু বাড়তে থাকে ততই সে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা আহরণ করে। এই অভিজ্ঞতাই হল শিক্ষার সামগ্রী, আর সেই অভিজ্ঞতাকে যতই সমৃদ্ধ করা যায় ততই শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ থেকে জীবনের এক এক স্তরে মানবশিশু এক এক রকম প্রয়োজন মেটায়। কখনো বাবা মার কাছ থেকে সে তার আবেগময় জীবনের চাহিদা মেটাবার জন্য হাত বাড়াতে থাকে আবার কখনো বন্ধুবান্ধব, শিক্ষক, পরিজন এদের কাছ থেকেও সে তার পাথেয় আহরণ করে নিতে চেষ্টা করে। একদিকে অন্তরের তাগিদ, অপরদিকে চলবার জন্য প্রস্তুতি—দুই দিকেই পরিবেশ মানুষের সহায়তা করে। পরিবেশ নানা ধরনের হতে পারে। যেমন—গৃহপরিবেশ, বিদ্যালয়পরিবেশ, গোষ্ঠী পরিবেশ, সমাজ-পরিবেশ, সাংস্কৃতিক পরিবেশ।

সপ্তম অধ্যায়

শিক্ষা-গবেষণা

১। শিক্ষায় গবেষণা ও শিক্ষাবিজ্ঞান

যে কোনো বিজ্ঞান গবেষণালব্ধ নতুন নতুন তথ্যের সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়। শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শিক্ষাকে বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি দিতে গেলে তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে স্বীকার করতেই হবে। শিক্ষার যে তিনটি ভিত্তি আছে তাদের অবলম্বন করে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা, তত্ত্ব ও গবেষণা শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে। অধিকাংশ গবেষণায় দেখা যায় শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিকে অবলম্বন করে। যেমন বর্তমানে শিখন ও শিক্ষণের ক্ষেত্রে এখনও গবেষণা চলছে। আচরণবাদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষাকে যাঁরা দেখছেন তাঁদের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। যে সব অনুমানের ভিত্তিতে তাদের শিক্ষাসূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তার পেছনে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনেক গবেষণা রয়েছে। শিখন একটি জটিল মানসিক প্রক্রিয়া। তাই এই ক্ষেত্রে গবেষণার প্রভূত অবকাশ আছে। সাম্প্রতিককালে শ্রেণীপাঠনের ক্ষেত্রে যে সব গবেষণা হয়েছে তার অধিকাংশই শিক্ষায় প্রেষণার সমস্যা নিয়ে। কিভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ ও প্রেষণার সঞ্চার করা যায় এই নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ আছে। বিশেষ করে কেবল ব্যক্তিগতভাবে নয়, দলগতভাবে ব্যক্তির ওপর দলের প্রভাবকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি বা শিক্ষণ-প্রণালীর উদ্ভব হয়েছে। ইংরাজীতে একে বলা যায় group dynamics. দেখা গেছে যে উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করতে পারলে শিক্ষা ও শিক্ষণের কাজ অনেক সহজ হয়ে আসে। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও ভাবের বিনিময় হয় তাকে ঘিরেও অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে।

শিখন ও শিক্ষণের ক্ষেত্র ছাড়াও আরও অনেক দিক আছে যা এখনও উপেক্ষিত। যেমন শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের উন্মেষ। যে যেমন ব্যক্তিত্ব নিয়ে জন্মায় তার কিছুটা পরিমার্জন করা সম্ভব কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য পাশ্চাত্যে বহু গবেষণা হয়েছে। বিশেষ করে জড়বুদ্ধি ও বিকৃত ব্যক্তিত্ব নিয়ে যারা জন্মায় তাদের কিভাবে সমাজের উপযোগী করে তোলা যায় তা নিয়ে

সুইডেন ও আমেরিকায় প্রচুর গবেষণার কাজ শুরু হয়েছে। শিক্ষায় নির্দেশের ক্ষেত্রেও (educational guidance) ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় কিছুদিন আগে অনেক গবেষণা হয়ে গেছে। ফলে কোন কোন মানসিক শক্তি বা বৃত্তি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত জীবনে ও শিক্ষায় সাফল্য এনে দেয় সে সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণালব্ধ তত্ত্বের নির্দেশ পাওয়া গেছে।

এক একটি দেশে এক এক বিষয়ে শিক্ষায় গবেষণা উদ্দিষ্ট হয়েছে। যেমন এককালে ইংলণ্ডে বুদ্ধি (Intelligence) ও তার স্বরূপ নিয়ে Cyril, Burt প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌গণ ব্যাপক গবেষণা করেছেন। পরে ব্যক্তিত্ব নিয়ে Eysenck প্রমুখ মনোবিদগণ ব্যক্তিত্বের প্রকার ও বিস্তার নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তেমনি আমেরিকায় Cattell, Allport প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের ব্যক্তিত্ব-বিষয়ে গবেষণা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছে। আগ্রহ ও বিষয়ানুরাগের ওপরও বর্তমানে দুই দেশেই অনেক কাজ হয়েছে। তার মধ্যে Strong, Kuder, Campbell প্রমুখ মনীষীদের গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, দেশে বিদেশের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় গবেষণা চলছে। বিশেষ করে আজ শিক্ষায় নেতৃত্ব (leadership in education), গোষ্ঠীজীবন ও শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, অনগ্রসরদের জন্য শিক্ষা, বিকলাঙ্গ ও জড়বুদ্ধিদের জন্য শিক্ষা ইত্যাদি শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন দিকে বিবিধ ধারায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। এই সব গবেষণা যখন সম্পূর্ণ হবে তখন তা শিক্ষাবিজ্ঞানের ভাণ্ডারকে পূর্ণ করে তুলবে।

কেবলমাত্র শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানই নয় শিক্ষার সামাজিক ভিত্তিকে কেন্দ্র করেও আজ অনেক রকম গবেষণা শুরু হয়েছে। বহুদিন শিক্ষার এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নি, কিন্তু আজ আর তা উপেক্ষিত নয়; বরঞ্চ শিক্ষার এই দিকটি বর্তমানে যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবিষয়ে সংশয়ের বিশেষ অবকাশ নেই। শিক্ষাকে কিভাবে সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করা যায়, কিভাবে বিদ্যালয়জীবনে সামাজিকীকরণ সম্ভবপর হয় এইসব বিষয়ে আজ শিক্ষাবিদ্‌দের দৃষ্টি পড়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজের প্রভাব এবং সমাজে শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন গবেষণার অবকাশ আছে। যেমন কিভাবে সমাজ ও গোষ্ঠীর প্রত্যাশা ও প্রয়োজন মেটাবার জন্য বিদ্যালয়ের পাঠক্রম প্রণীত হবে তাও গবেষণা-সাপেক্ষ। ইংরেজীতে একে বলা হয় curriculum development. এই নিয়ে ভারতবর্ষের

ও বিশ্বের নানা গবেষণা সংস্থায় অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। দেখা গেছে পাঠক্রমকে ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের পূর্ণাংগ বিকাশ সাধন করতে হলে চাই সুবিন্যস্ত, সুসংহত ও সুসামঞ্জস পাঠক্রম। তার মধ্যে কেবল তত্ত্ব ও তথ্যই থাকবে না, সেখানে থাকবে জীবনের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার সর্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তি। হাতের কাজ, চারুশিল্প, ক্রিয়াকেন্দ্রিক শিক্ষা, খেলাধূলা, শরীরচর্চা, আলাপ-আলোচনা ও সামাজিকীকরণের শিক্ষা সবকিছুই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। কোন শ্রেণীতে কিভাবে কতখানি অভিজ্ঞতা পরিবেশন করলে তা শিক্ষার্থীর বিকাশের পক্ষে অনুকূল হবে সেটাই গবেষণার বিষয়বস্তু।

এর পরে শিক্ষার আর একটি উপাদানকে নিয়েও গবেষণার প্রভূত অবকাশ আছে। সেটি হল শিখন ও শিক্ষণকে কেন্দ্র করে। ইংরাজীতে একে বলা হয় dynamics of learning-teaching অর্থাৎ শিখন ও শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে নতুন নতুন শিক্ষণ-পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্পর্কে গবেষণার সার্থকতা আছে। বর্তমান শ্রেণী-পাঠনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেড়ে যাবার ফলে প্রতিটি শ্রেণীতে অধিকাংশ শিক্ষার্থী অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে; তাদের রুচি, শক্তি, প্রবণতা, প্রয়োজন ও সমস্যার দিকে কোনো দৃষ্টিই শিক্ষক দিতে পারেন না। ফলে শিক্ষা তাদের জীবনে বাঞ্ছিত প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। এই বাস্তব সমস্যার সমাধান কিভাবে খোঁজা যায়, কোনো দলগত পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করা যায় কিনা—এই সব বিষয় নিয়ে সীমিত গবেষণার বিশেষ প্রয়োজন। আজ work-shop, seminar ইত্যাদি অনেক ইংরাজী কথা শোনা যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে এদের প্রয়োগ পাশ্চাত্য দেশে কার্যকরী বলে বিবেচিত হয়েছে। ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এই সব পদ্ধতি কতখানি কার্যকরী হবে, কোন স্তরে তাদের কার্যকারিতা বেশী সে সম্পর্কেও গবেষণার অবকাশ আছে।

এ'ছাড়া শিক্ষকদের বৃত্তিগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য অনেক রকম পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন অনুশিক্ষণ পদ্ধতি। ইংরাজীতে একে বলা হয় micro-teahing. দেখা যায় যে শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর তাঁর বৃত্তিগত উৎকর্ষ নির্ভর করে। যদি তিনি অধ্যয়ন-অধ্যাপনাকে ভালোবাসেন, শিক্ষার্থীর প্রতি দরদী হন এবং তার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সুস্থ হয় তবে শিক্ষক হিসাবেও তাঁর সাফল্য আশা করা যায়। এইজন্যে শিক্ষণের কাজে উৎকর্ষ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে। এই বিষয়ে ভিন্ন

ভিন্ন গবেষণা হয়েছে। বিশেষ করে বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের উৎকর্ষ এবং শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর যথেষ্ট গবেষণার কাজ হয়েছে। কিন্তু কিভাবে শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গিকে উন্নততর করা যায় এবং কিভাবে তাঁর ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধন করা যায় সেবিষয়ে সমীক্ষা ও গবেষণার সার্থকতা আছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু এই মূল্যায়ন বলতে আমরা বুঝি সামগ্রিক মূল্য-নিরূপণ। অনেক সময় দেখা যায় যে গতানুগতিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনা ধরা পড়ে না। ফলে তাদের প্রতি সুবিচার হয় না। এইজন্য শিক্ষার্থীর বিশেষ বিশেষ শক্তি ও ব্যক্তিত্ব উৎপাদনের মূল্যায়নের জন্য বিশেষ বিশেষ অভীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রয়োজন। তাই এ-বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণামূলক পরীক্ষার প্রয়োজন আছে।

শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তির কথা চিন্তা করলে মনে হয় যে আজ শিক্ষার লক্ষ্য নিয়ে একটা বিভ্রান্তি দেখা যাচ্ছে। তার কারণ হল বাস্তবাভিমুখী দৃষ্টির অভাব। অর্থাৎ যুগের দাবীকে অগ্রাহ্য করে, সমাজের প্রত্যাশাকে উপেক্ষা করে যদি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এলোমেলো ধারা বেয়ে চলে তবে তা কেবল বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। আজ যাঁরা শিক্ষা-জগতের পরিচালক তাঁদের মধ্যে দেখা গিয়েছে প্রত্যয়ের অভাব। তাই কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে না এগিয়ে কেবল পরিবর্তনের মধ্যে হারিয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আজ দশ-শ্রেণী, কাল এগার বা বার শ্রেণী—এমনিভাবে শিক্ষার কাঠামো নিত্য-নতুন পরিবর্তনের মধ্যে শিক্ষার্থীদের ফেলছে। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে অনিশ্চয়তাবোধ ও অস্বস্তি। তারা যেন গবেষণাগারের গিনিপিগের মতো। কিন্তু এমনি করে লক্ষ্যহীনভাবে শিক্ষার ধারাকে বইয়ে দিলে তা জাতির ও শিক্ষার্থীর সত্যিকারের কল্যাণ কতটুকু আনবে এবিষয়ে সন্দেহ আছে। তাই শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তবেই শিক্ষার সার্থকতা আসবে।

শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তিকে কেন্দ্র করে অনেক গবেষণা হতে পারে। পাশ্চাত্যে কিছু কিছু সমীক্ষা শুরু হয়েছে সত্য, কিন্তু তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খণ্ড খণ্ড ভাবে সমীক্ষার ফলে তার সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্ভবপর নয়। শিক্ষায় মূল্যবোধ, শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার মান ইত্যাদি বিষয়ে ভারতবর্ষেও অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে। কিছু কিছু প্রবন্ধ ও গবেষণামূলক নিবন্ধ পত্রিকায়

প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সার্থক গবেষণা করতে হলে যে সময় ও নিষ্ঠার প্রয়োজন তার অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গভীরতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন শিক্ষার মান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষাধিকার মন্ত্রণালয় যে আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করেছিলেন তা গবেষণামূলক না হয়ে যুক্তিভিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই বিষয়ে প্রবন্ধগুলি কেবল মতামতের ওপর প্রতিষ্ঠিত বললেই চলে।

শিক্ষায় মূল্যবোধ সম্পর্কে গবেষণার অবকাশ থাকলেও বিষয়টির জটিলতার জন্য সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ ও ভিন্ন ভিন্ন অভিমত-ভিত্তিক সমীক্ষার প্রয়োজন আছে। বর্তমান জগতে মানবিকতার মূল্য কতখানি তা নির্ধারণ করতে গেলে শিক্ষার অন্যান্য লক্ষ্যের সঙ্গে এর তুলনামূলক বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ বিশেষ মূল্যবোধের মূল্যায়ন না করলে এই ধরনের গবেষণা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই শিক্ষা ও দর্শনের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব সম্পর্কে তথ্যগর্ভ-সমীক্ষার একান্ত প্রয়োজন। তত্ত্বের পরিবর্তে তথ্যকে ভিত্তি করে এই সব জটিল গবেষণার শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সার্থকতা আছে।

শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির দিকে ক্রমশঃই শিক্ষাবিদগণের সমধিক দৃষ্টি পড়ছে তাই এই ক্ষেত্রে অনেক গবেষণা শুরু হয়েছে ; ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার আয়োজন চলছে। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই গবেষণাগুলি সীমিত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই তাদের বোধ হয় কয়েকটি পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। যেমন—

(ক) শিক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত কারণগুলির অনুসন্ধান,

(খ) বিশেষ বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রভাব,

(গ) শিক্ষায় অবক্ষয়ের কারণ নির্ধারণ,

(ঘ) শিক্ষার্থীদের মধ্যে আচরণগত বৈষম্যের কারণ নিরূপণ,

(ঙ) বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, বিষয়ানুরাগ ও প্রবণতাকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

শিক্ষায় নির্দেশ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু গবেষণা শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। এই প্রসঙ্গে M. B. Buch সম্পাদিত শিক্ষায় গবেষণা-নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য।

বর্তমান শিক্ষায় যে কয়েকটি সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে তাদের মধ্যে প্রেষণার অভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যে আচরণগত সমস্যা ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য।

সম্প্রতি আর একটি সমস্যাও লক্ষ্য করার মত, তা হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খল আচরণ। এই নিয়ে গবেষণার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

২। শিক্ষক ও গবেষণা

শিক্ষায় গবেষণাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল Fnndamental Research এবং অপরটি Experimental Research. শেষের পর্যায়ে সীমিত পরিসরে ও সীমিত সময়ে ছোট ছোট অনেক গবেষণা ফলপ্রসূ হতে পারে এবং সেই সব গবেষণা শ্রেণীতে পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে সম্ভবপর। তাই শিক্ষকগণ বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তাঁদের উপযোগী সীমিত ক্ষেত্র বেছে নিয়ে গবেষণায় ব্রতী হতে পারেন এই প্রসঙ্গে Action Research-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। মূলতঃ শিক্ষকগণ শিক্ষণকার্যে ব্রতী থাকলেও তাঁদের আজ গবেষণার ক্ষেত্রেও এগিয়ে আসতে হবে। গবেষণার মূল পদ্ধতি-গুলির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। তাহলে শিক্ষণ ও গবেষণা উভয়েই সমৃদ্ধ হবে।

৩। নির্দেশনা ও শিক্ষাবিজ্ঞান

'নির্দেশনা' কথাটি এসেছে 'নির্দেশ' শব্দ থেকে। অর্থাৎ যেখানে অনেক পথ সামনে থাকে তার মধ্যে কোন পথটি নিলে লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ হবে সেই ইঙ্গিত দেওয়াই নির্দেশনার কাজ। মানুষের জীবনের বিভিন্ন স্তরে এই নির্দেশনার সার্থকতা আছে, কারণ উপযুক্ত নির্দেশনার অভাবে ক্রমপরিণতি ও বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়। শৈশব থেকে শুরু করে পরিণত বয়স পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়, আর তার সমাধান খুঁজতে হলে চাই বিচার-বিশ্লেষণ ও নির্দেশনা। নির্দেশনার প্রচলিত অর্থ যাই হোক না কেন, কথাটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। নির্ধারণ, নিরূপণ, ও নির্বাচনের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত। কিভাবে এই নির্দেশনাকে বিজ্ঞান-সম্মত করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনার বিশেষ অবকাশ আছে। কিন্তু তার আগে প্রশ্ন আসে নির্দেশনা কত প্রকারের। বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনার উল্লেখ পাওয়া গেলেও সীমিত পরিসরে কয়েকটি ক্ষেত্র বেছে নেবার প্রয়োজন আছে। যেমন শিক্ষামূলক নির্দেশনা ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা।

শিক্ষামূলক নির্দেশনা বলতে বোঝা যায় শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব সমস্যা আসে তার সমাধানের জন্য নির্দেশ ; যেমন শিক্ষার্থীদের বিকল্প পাঠক্রম বা বিষয় নির্বাচনের নির্দেশ (curricular guidance) বা শ্রেণীতে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর সমস্যা-সমাধানের নির্দেশ। তেমনি বৃত্তিমূলক নির্দেশনা বৃত্তি নির্বাচনে সহায়তা করে।

নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা (Need for guidance) ঃ–

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষ অন্যের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে। কখনো অপরের অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য কখনো বা বিশেষ দৃষ্টিভংগী সমাধানের পথ আবিষ্কারের সহায়তা করে। পারস্পরিক নির্ভরতার নীতির ওপর ভিত্তি করেই তাই এই নির্দেশনার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। জীবনে সমস্যা ও বিভ্রান্তি স্বাভাবিক। তার থেকে মুক্ত হয়ে এগিয়ে যাওয়া মানুষের ধর্ম। তাই মাঝে মাঝে বিশেষজ্ঞের সহায়তায় সমাধানের পথ খুঁজে পেতে হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা রকমের সমস্যা দেখা যায়, আর তার অধিকাংশই শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে ; কখনো তাদের আচরণগত সমস্যা কখনো বা বিদ্যালয়-জীবনের সংগে অভিযোজনের সমস্যা। সমস্যা যাই হোক না কেন শিক্ষার্থীকে তার থেকে মুক্ত করার জন্য বিশেষ পরিচালনা ও নির্দেশনার প্রয়োজন। কোন নতুন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী প্রথমে বিব্রত অনুভব করে, আর তখন নানা রকম অভিযোজনের সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ করে কোনো নতুন শিক্ষকের উপস্থিতি বা নতুন বিদ্যালয়ে স্থানান্তর শিক্ষার্থীর এই সমস্যাকে প্রকট করে তোলে। তখন শিক্ষার্থীর যে সমস্যা দেখা দেয় মূলতঃ তা হল পরিবেশের সংগে সংগতি-বিধানের অক্ষমতা। এই সব ক্ষেত্রে সহানুভূতিপূর্ণ নির্দেশনা বিশেষ কার্যকরী হয়। কখনো বা বাবা মাকে ছেড়ে অনেক শিক্ষার্থী আবাসিক বিদ্যালয়ে আসে। তাদের মনের উদ্বেগ ও অভাববোধ শিক্ষার অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। আবার কৈশোরে শিক্ষার্থী-জীবনে যে বিশেষ সমস্যা দেখা দেয় তার সমাধানে সহায়তা করতে হলে চাই শিক্ষকের সংবেদনশীল মন ও নির্দেশনা। তাই ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না।

শিক্ষার ক্ষেত্র ছাড়াও আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে নির্দেশনার অবকাশ আছে। যেমন বৃত্তিমূলক নির্দেশনা। ব্যক্তিজীবনে বৃত্তি-উপযোগী প্রস্তুতি এনে বৃত্তি নির্বাচনে সহায়তা করাই হল বৃত্তিমূলক নির্দেশনার মূল উদ্দেশ্য। এ'ছাড়া বৃত্তি খুঁজে পেতে সাহায্য করা বা বৃত্তি সম্পর্কে বিশেষ তথ্যের সন্ধান দেওয়া এই

বৃত্তিমূলক নির্দেশনার লক্ষ্য। শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনাই নয়, আরও কয়েক প্রকার নির্দেশনার উপযোগিতা আছে। যেমন, সামাজিক নির্দেশনা, পারিবারিক নির্দেশনা, ব্যক্তিগত মনস্তাত্ত্বিক নির্দেশনা (clinical guidance).

বর্তমান যুগে জীবনযাত্রা জটিল হওয়ার ফলে অনেকের মধ্যেই প্রক্ষোভগত ভারসাম্যের সাময়িক অভাব দেখা যায়। এই সব ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণের পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী। অর্থাৎ মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের মূল উৎসকে আবিষ্কার করে সেখান থেকেই সমস্যা প্রতীকারের চেষ্টা করাই হল এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। যে কোনো নির্দেশনায় তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন। কারণ, তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতির উদ্ভাবনই আধুনিক নির্দেশনার উদ্দেশ্য। এই তথ্য নানা প্রকারের হতে পারে। যেমন ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষামূলক তথ্য ইত্যাদি। কেবল তথ্য সংগ্রহই নয় তাকে বিশ্লেষণ করে নির্দেশনার মূল সূত্র আবিষ্কারের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। যাতে তথ্যগুলিকে সুবিন্যস্ত ভাবে লিপিবদ্ধ করা যায় তার জন্য বিভিন্ন রীতি আছে। এই সব রীতির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল Cumulative Record Card, Ancedotal Record ব্যক্তিগত ও বৃত্তিগত প্রোফাইল ইত্যাদি।

ভিন্ন ধারায় তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি থেকে শিক্ষার্থীর আচরণকে লক্ষ্য করতে হবে। এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তথ্যকে লিপিবদ্ধ করতে হবে। কখনো শ্রেণীতে, কখনো খেলার মাঠে এবং বিদ্যালয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া ও আচরণকে নির্দিষ্ট ধারায় পর্যবেক্ষণ করে তার যথাযথ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই সব কাজে সাফল্য আনতে হলে চাই বিশেষ দক্ষতা ও নিষ্ঠা। একজন শিক্ষকের ওপর নির্ভর না করে শিক্ষকদের সমবেত প্রচেষ্টায় এই পর্যবেক্ষণের কাজকে নির্ভরযোগ্য করে তোলা বাঞ্ছনীয়। এছাড়া কোথাও কোথাও মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা, রেটিং (Rating), ব্যক্তিগত আলোচনা ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করার সার্থকতা আছে। অবশ্য এই নির্দেশনার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য একজন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। তিনি অন্যান্য শিক্ষকের সহযোগিতায় এই দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্বাহ করবেন।

শিক্ষামূলক নির্দেশনার কাজ মূলতঃ বিদ্যালয়ের পরিধির মধ্যে সীমিত থাকলেও বাইরের পরিবেশ থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন আছে। তার জন্য অভিভাবক ও অন্যান্য পরিজনের সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য। মনস্তাত্ত্বিক

ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে নির্দেশনাকে তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে করতে হবে। সেখানে শিক্ষার্থীর শক্তিসামর্থ্য, অক্ষমতা, দুর্বলতা, রুচি ও আগ্রহ, প্রবৃত্তি ও প্রবণতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই সব বিষয়ে জানতে হলে কেবল মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষার প্রয়োগই যথেষ্ট নয়, এর জন্যে চাই বিজ্ঞান-সম্মত পর্যবেক্ষণ ও শিক্ষার্থীর অতীত জীবন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান। প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য এবং নির্দেশনাকে কার্যকরী করে তোলার জন্য শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও তথ্যগর্ভ প্রগতিপঞ্জী ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আছে।

৪। বিদ্যালয়ে মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা ও নির্দেশ

ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে আজ লক্ষ্য পড়েছে। কিন্তু এই ব্যক্তিগত পার্থক্যকে কিভাবে ধরা যায়—এই হল প্রশ্ন। ব্যক্তিত্বকে খন্ড-ছিন্ন করে দেখা না গেলেও তার কয়েকটি উপাদান বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে। একে একে দৃষ্টি ফিরল বুদ্ধির তারতম্যের দিকে। ফলে বুদ্ধি নিয়ে অনেক গবেষণা চলল। ফ্রান্সের বিনে (Binet) পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর শক্তিকেই বুদ্ধি বলে মনে করেন। তাঁর মতে এটি একটি জন্মগত সম্পদ। মনের রাজা এই বুদ্ধি কারণ মনই অন্যান্য চিত্তবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে। বুদ্ধি সকলেরই আছে কারও বেশী কারও কম।

তাই বুদ্ধির এই তারতম্যকে পরিমাপ করবার জন্য প্রচেষ্টা চলতে থাকে। বিনে সাহেব নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর লক্ষ্য করলেন যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও বাড়তে থাকে কিন্তু একটা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। তখন তিনি সাইমন (Simon) সাহেবের সহযোগিতায় প্রশ্নমূলক পরীক্ষার উদ্ভাবন করলেন। বয়সের অনুপাতে প্রশ্নগুলির গুরুত্ব লঘুত্ব স্থির করা হল ও বয়স অনুযায়ী প্রশ্নের মাপকাঠি ঠিক করা হল। এই বুদ্ধির মাপকাঠির নাম দেওয়া হল—

"বিনে-সাইমন মাপকাঠি"। মাপকাঠির নানা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হল। এরপর টারমান সাহেবের চেষ্টায় বুদ্ধি পরিমাপের প্রণালীটি আরও সমৃদ্ধ হল ও অভীক্ষাটি পরিমার্জিত হল। ৩ বছর থেকে ১০ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার জন্য ৬ প্রকার, ১২ বছরের জন্য ৮ প্রকার, ১৪ বছরের জন্য ৬ প্রকার পরীক্ষাপ্রণালী অনুসৃত হল।

এই তথ্যের অনেক খুঁটিনাটি আছে। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে প্রত্যেকের সত্যিকারের বয়স অনুযায়ী তার মনের বিকাশ হয় না। তাই তাঁরা মানসিক বা মানসবয়স গণনার পক্ষপাতী। একটি সত্যিকারের বয়স, অন্যটি মানসিক শক্তি উন্মেষের নির্দেশক বয়স (Mental age)। একটি ছেলের বা মেয়ের প্রকৃত বয়স যদি ১০ বছর হয় তবে তার মানসবয়স তার থেকে বেশী বা কম হতে পারে। বুদ্ধির এই মানপরীক্ষার জন্য নানা অভীক্ষা উদ্ভাবিত হয়েছে। যথা—

বিনে স্কেল ঃ

১। তিন বছর বয়সের শিশুদের জন্য —

(ক) নাক, চোখ, মুখ দেখানো ;

(খ) সংখ্যার হিসাব ;

(গ) ছবি থেকে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য গুণে দেখানো ;

(ঘ) কোন একটি ছোট বাক্যের পুনরাবৃত্তি করা ইত্যাদি।

টারম্যান স্কেল ঃ

১। তিন বছর বয়সের শিশুদের জন্য—

(ক) শরীরের অংগ-প্রত্যংগ দেখানো ;

(খ) পরিচিত বস্তুর নাম করা ;

(গ) ছবিতে আঁকা জিনিষের নাম বলা, সংখ্যা বলা ইত্যাদি।

এইরূপ বিভিন্ন বয়সের জন্য পরীক্ষার স্কেল আছে।

মানুষের বুদ্ধির মান নির্ণয় করার জন্য প্রকৃত বয়স দিয়ে মানস বয়সকে ভাগ করে তাকে ১০০ দিয়ে গুণ করে দেখানো হয়। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রকৃত বয়স ১৬ বছরের বেশী ধরা হয় না, কারণ বহু পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে যে, ১৬ বছর বয়সের পর কোন ব্যক্তির জন্মগত বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ বা বৃদ্ধি হয় না। উদাহরণ—কোন ছেলের যদি প্রকৃত বয়স ১২ বছর ও মানস বয়স ১৫ বছর হয় তবে তার বুদ্ধি হবে $\frac{১৫}{১২} \times ১০০ = ১২৫$।

মানুষের বুদ্ধির অঙ্ক অনুসারে টারমান কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

যদি বুদ্ধির অংক (I. Q.) ১৪০ ও তদূর্ধ্বে হয় তবে সে অসাধারণ প্রতিভাবান বুঝতে হবে। সেইরূপ—

১২০—১৪০	প্রতিভাবান
১১০—১২০	সাধারণের উর্ধ্বে

৯০—১১০	সাধারণ
৮০—৯০	অল্পবুদ্ধি
৭০—৮০	জড়বুদ্ধি
৭০ এর নীচে	বুদ্ধিহীন

শিক্ষার্থীদের জন্য এই বুদ্ধি পরীক্ষার বিশেষ সার্থকতা আছে। প্রথমে যখন তারা বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করতে চায় তাদের জন্য ও পিতামাতার অবগতির জন্যও এই অভীক্ষার প্রয়োজন।

কেবল বুদ্ধির পরীক্ষাই নয়, শিশুকে জানতে হলে, শিশুর অনুরাগ, ব্যক্তিত্ব ও প্রবণতা জানবার প্রয়োজন। তাই তার জন্যও অভীক্ষা-নিরীক্ষার সার্থকতা আছে। নানাভাবে শিশুর বিষয়ানুরাগ পরীক্ষা করা যায়।

(ক) প্রশ্নাবলীর সাহায্যে শিশু কি করতে ভালবাসে বা বাড়িতে কি করতে ভালবাসে সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে।

(খ) শিশুকে নানা কাজ দিয়ে দেখতে হয় সে কোন কাজ নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন করে। এজন্য কয়েকটি অভীক্ষার নমুনা পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

মাধ্যমিক শিক্ষায় নির্দেশ

শিক্ষাই জীবন ঃ—জীবনই শিক্ষা। তাই শিক্ষার সঙ্গে নির্দেশের প্রশ্ন নিবিড়ভাবে জড়িত, কারণ উভয়ের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীজীবনের বিকাশে সহায়তা করা।

যার মাঝে যেটুকু সম্ভাবনা আছে তার পূর্ণ রূপায়ণ যাতে সম্ভবপর হয় এই দিকেই শিক্ষাবিদদের দৃষ্টি। একই রকম বৈচিত্র্যহীন শিক্ষার আয়োজন হয়তো প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পক্ষে অনুকূল নয়, কারণ মানুষের রুচি ভিন্ন. শক্তি ও হৃদয়ের বৃত্তি পৃথক। তাছাড়া নানা কারণে শিক্ষার্থীর বিকাশের পথ রুদ্ধ হতে পারে। তাই শিক্ষায় নির্দেশের একান্ত প্রয়োজন। জগতে প্রত্যেকের নিজস্ব স্থান আছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই হল মূলমন্ত্র।

নির্দেশের অর্থ ঃ—শিক্ষায় নির্দেশের দুটি অর্থ আছে। একটি ব্যাপক আর একটি সংকীর্ণ। ব্যাপক অর্থে শিক্ষার্থীর জ্ঞান আহরণের পথে যে কোন সহায়তাকেই নির্দেশ বলা চলে। কে কোন্ বিষয়ে কেন পিছিয়ে পড়ছে, কে শ্রেণীপাঠনকে কেন অনুসরণ করতে পারছে না এই সব সমস্যার সমাধানের প্রয়াসকেই ব্যাপক অর্থে নির্দেশ বলা চলে।

আর কোন শিক্ষার্থীর কোন পাঠ্যবিষয় ও শিক্ষাধারা অনুসরণ করলে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সবচেয়ে বেশী হবে ও তার জীবনে সাফল্য আসবে সেই বিষয়-বস্তু বা শিক্ষাধারা নির্বাচনে সহায়তা করাই শিক্ষায় নির্দেশের সংকীর্ণ অর্থ।

নির্দেশের প্রকারভেদ :—নির্দেশের বিভিন্ন প্রকারভেদ থাকলেও শিক্ষার নির্দেশ আজ শিক্ষাবিদদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

কিন্তু এই নির্দেশের সঙ্গে অন্যপ্রকার নির্দেশের কিছু যোগাযোগ আছে। যেমন বৃত্তিমূলক নির্দেশ। ভাবী জীবনে যার যে বৃত্তি হবে গোড়া থেকেই সেই অনুযায়ী প্রস্তুতির সার্থকতা আছে। তাই শিক্ষায় নির্দেশ ও বৃত্তিমূলক নির্দেশের মাঝে বিশেষ যোগাযোগ ও সংহতির প্রয়োজন। এছাড়া সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি নানা নির্দেশের ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু সব নির্দেশের শুরুতে আছে শিক্ষায় নির্দেশ।

শিক্ষায় নির্দেশের লক্ষ্য :

(ক) শিক্ষার্থীকে আত্মবিশ্লেষণের পথে সহায়তা করা ;

(খ) পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে সাহায্য করা ;

(গ) নিজের রুচি, যোগ্যতা ও পরিবেশ অনুযায়ী বিষয় ও শিক্ষাধারা নির্বাচন করা।

নির্দেশের বিশেষ অর্থ :—আজ আমাদের দেশে বিবিধার্থ-সাধক বিদ্যালয়ের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৈশোর থেকেই রুচি, শক্তি ও পার্থক্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দেবার প্রশ্ন উঠেছে। নবম শ্রেণী থেকেই শিক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট ধারায় শিক্ষালাভ করতে হবে, যদিও কয়েকটি বিষয়ে সকলকেই জ্ঞানলাভ করতে হবে। যে কয়টি ধারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে কয়েকটি কারণে এ পর্যন্ত তাদের মধ্যে Science, Technical ও Humanities-এর প্রবর্তন বেশী সম্ভবপর হয়েছে। এই বিভিন্ন ধারার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মনে জেগেছে আশা ও উদ্দীপনা। কারণ যদি সব শিক্ষার্থীই তার রুচি ও শক্তি অনুযায়ী শিক্ষালাভ ও ব্যক্তিত্বের সুযোগ পায় সেটি কম আনন্দের কথা নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি সমস্যারও উদ্ভব হয়েছে। প্রথম সমস্যা হল নির্দিষ্ট ধারায় নির্দেশের ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে।

কিন্তু কিভাবে শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা ও যোগ্যতার পরিমাপ হবে? কি কি গুণ বা বৃত্তিকে কেন্দ্র করে এই নির্দেশের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় হবে?

এই দুটি প্রশ্ন নির্দেশের সঙ্গে অংগাঙ্গিভাবে জড়িত।

কি কি গুণ বা বৃত্তি নির্দেশক হবে ?

আজও অনেকের মনে ধারণা যে, বোধহয় বুদ্ধিই (intelligence) পরিচালনার পথে প্রধান নির্দেশক। অবশ্য বুদ্ধিকেই পরিচালনা বা নির্বাচনের সময়ে প্রধান নির্দেশক বলে ধরে নেওয়া অনেক ক্ষেত্রেই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল নির্বাচন ও নির্দেশ এক নয়। তাছাড়া, যখনই নির্দেশের কথা ওঠে, তখনই ভাবতে হবে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকলকেই কোন একটি ধারার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করাই প্রধান লক্ষ্য। ভাবতে হবে আমাদের দেশের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং পল্লীবাসী। তাই এমন কয়েকটি মূল বৃত্তিকে নিয়ে এই নির্দেশের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় যেখানে অধিকাংশের প্রতি অবিচার না হয়, অথচ নির্দেশ সার্থক হয়ে ওঠে।

বুদ্ধিকে প্রধান নির্দেশক বলে স্বীকার করে নেওয়া বোধ হয় সমীচীন হবে না। কারণ বুদ্ধি সম্পর্কে বহু মতবাদ বর্তমান। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এখন সামগ্রিক বুদ্ধির চেয়ে বুদ্ধির বিশেষ উপাদানের দিকে অনেকের দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে। ফলে বুদ্ধির পরিমাপের নামে অনেক সময় বিশেষ বিশেষ শক্তিরই পরিমাপ করা হয়। তাছাড়া যে বয়সের ভিত্তিতে বুদ্ধি পরিমাপ হয় আমাদের দেশে সে ভিত্তিই নির্ভরযোগ্য নয়।

তৃতীয়তঃ, সংখ্যাবিজ্ঞান অনুযায়ী সাধারণ বুদ্ধির লোকই বেশী। এখন বুদ্ধি পরিমাপের পর যদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামান্য বুদ্ধিগত পার্থক্য দেখা যায়, তবে সে পার্থক্য কি যথার্থ নির্দেশের পথে বিশেষ সহায়ক হবে ? তা হলেই দেখা যায় কোন বুদ্ধি অঙ্ক কোন ধারায় শিক্ষার নির্দেশক হবে, গবেষণা ছাড়া সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন।

অন্য কি কি বৃত্তি শক্তি ও যোগ্যতা নির্দেশের মাপকাঠির কাজে লাগতে পারে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ব্যক্তিত্বের কয়েকটি উপাদানের সঙ্গে বিভিন্ন সাফল্য অসাফল্যের সম্পর্ক আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে বিষয়ানুরাগ ও প্রবণতার সঙ্গে মানুষের ক্রিয়াকলাপের সম্পর্ক আছে। তাই বিষয়ানুরাগ (Interest) ও প্রবণতাকে নির্দেশের মাপকাঠি হিসাবে না নিলে বোধহয় ভুল হবে।

বিষয়ানুরাগ ঃ—প্রবণতার সঙ্গে অনুরাগকে এক করে দেখলে ভুল হবে।

কারণ প্রবণতার সঙ্গে শক্তি ও পরিবেশের সম্পর্ক আছে। যে দীন পল্লীবাসী তার যান্ত্রিক প্রবণতা (Technical Aptitude) শিল্পাঞ্চলের অবস্থাপন্ন থাকের শিক্ষার্থীর প্রবণতার সঙ্গে এক হবে না, তাই ভারতের বৈচিত্র্যময় পরিবেশে ও জনসাধারণের বিভিন্ন অবস্থায় প্রবণতাকে নির্দেশের মাপকাঠি করলে দরিদ্র পল্লীবাসীর প্রতি অবিচার করা হবে। এইজন্য এমন কোন মূল উপাদান ভিত্তি করতে হবে যা অধিক অবস্থা-নিরপেক্ষ।

বিষয়ানুরাগ পরীক্ষার সার্থকতা ঃ

জীবনের সাফল্যের সঙ্গে বুদ্ধির যতটুকু সম্পর্ক আছে তার চেয়ে বেশী সম্পর্ক বোধ হয় ব্যক্তিত্বের।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে অনেকে সাধারণ বুদ্ধি নিয়েও অধ্যবসায় বা আত্মপ্রত্যয় বা অন্য কোন ব্যক্তিত্বের গুণে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে যতই শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার দিকে এগিয়ে যায় ততই কৃতিত্ব দেখায়। তার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, যে বিষয়ে যার অনুরাগ সেই বিশেষ বিষয়ে শিখবার সুযোগ না পাবার জন্য হয়ত বিশেষ সাফল্য দেখা যায় নি। কিন্তু বিশেষ দিকে শিক্ষালাভের সুযোগ পাবার সঙ্গে সঙ্গে সাফল্য দেখা দিয়েছে। ফলে যখনই শিক্ষায় পরিচালনা বা নির্দেশের প্রশ্ন ওঠে তখনই বিষয়ানুরাগের কথা মনে জাগে। তাই অধ্যবসায় ও বিষয়ানুরাগ পরীক্ষার যথেষ্ট সার্থকতা আছে।

বিষয়ানুরাগ পরীক্ষার নূতন পদ্ধতি ঃ

এ পর্যন্ত যত বিষয়ানুরাগের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে তার অধিকাংশই বিভিন্ন প্রশ্নাবলীর সাহায্যে। কিন্তু এই পদ্ধতি অপরিণত শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়। কারণ যে প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে শিশু কিশোরের মনোভাব, রুচি, শক্তি ও প্রবণতার সন্ধান পাবার চেষ্টা করা হবে তার উত্তর দিতে হলে শিশু কিশোরগণের আত্ম-বিশ্লেষণের ক্ষমতা ও সততার প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দুইটি গুণের অভাব দেখা যায়। তাই বিষয়ানুরাগ পরীক্ষায় এই নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা। কোন একটি পদ্ধতিই নির্দেশের পক্ষে যথেষ্ট নয় যতক্ষণ না তার কার্যকারিতা প্রমাণিত হচ্ছে। তাই এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে অগ্রসর হতে গেলে কয়েকটি পদ্ধতিই একসাথে প্রয়োগ করা আবশ্যক ও পরীক্ষামূলক ভাবে অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

নীচে কয়েকটি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

অভীক্ষা ১ঃ—ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার্থীর বিষয়ানুরাগ নির্ধারণের চেষ্টা করা যায়। প্রশ্নগুলি পড়ে শিক্ষার্থীর কোনটি পছন্দ কোনটি অপছন্দ বা কোন কাজ সে করবে, কোন কাজ না করবে তার উত্তর দেবে।

অভীক্ষা ২ঃ—এই অভীক্ষাটি একটি অনুমানের উপর প্রণীত। যে বিষয়ে যার বিশেষ অনুরাগ সে বিষয়ে সে বেশী খবর রাখে বা তথ্য জানে এই অনুমান করা হয়েছে। তাই এমন অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন এর মধ্যে থাকে যার উত্তর করতে হলে বিশেষ পর্যবেক্ষণ ও ঐক্ষেত্রে বিশেষ অনুরাগের প্রয়োজন।

অভীক্ষা ৩ঃ—এই অভীক্ষাটির মধ্যে কয়েক রকমের কাজ দেওয়া হয়। সাধারণতঃ কয়েক রকমের কাজ থাকে, কোনটি রঙ দেওয়া বা বিন্দু যোগ করে কোন কিছু আঁকা। আবার কোনটি বা বিভিন্ন যন্ত্রের ছড়ানো অংশগুলি কোথায় কোনটি লাগবে তা লিখে দেওয়া। মোটকথা অভীক্ষাটি কাগজে-কলমে নেওয়া চলে ও এর মধ্যে শিক্ষার্থী রুচি অনুযায়ী কাগজে-কলমে যে কোন প্রকার কাজ করতে পারে।

অভীক্ষা ৪ঃ—এই অভীক্ষায় থাকবে কয়েকটি নানা টুকরো টুকরো সংবাদ। যে যার রুচি অনুযায়ী সংবাদগুলির শীর্ষ পড়ে বিস্তারিত বিবরণী পড়বে ও পঠিত অংশকে রেখাঙ্কিত করবে। অবশ্য সংবাদগুলির কোনটি যন্ত্র, কোনটি কৃষি, কোনটি চারুকলা, কোনটি বা বিজ্ঞানের বিষয়কে কেন্দ্র করে। মোটকথা, ছয় রকমের অনুরাগকে কেন্দ্র করেই এই সংবাদগুলি রচিত ও যে যার বিষয়ানুরাগ অনুযায়ী পড়তে পারবে।

অভীক্ষা ৫ঃ—(ফ্লাস কার্ড) এই অভীক্ষাটি কয়েকটি কার্ডের সমষ্টি। প্রত্যেকটি কার্ডে নানা বিষয়ের জিনিষ আঁকা থাকবে। কার্ডটি মুহূর্তের জন্য দেখানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে লিখতে বলা হবে সে কি কি দেখেছে। প্রত্যেক কার্ডে অনেকগুলি করে জিনিস থাকবে। যদি ৮ খানি কার্ড দেখানোর শেষে দেখা যায় যে একটি বিষয়ের জিনিসই শিক্ষার্থীর বেশী মনে আছে অর্থাৎ বেশী লিখেছে, তবে সে বিষয়েই তার বেশী অনুরাগ ধরা হবে।

এই হল বিষয়ানুরাগ পরীক্ষার জন্য উদ্ভাবিত কয়েকটি পদ্ধতির কথা। তবে বিষয়ানুরাগ যাচাই করতে হলে অভিভাবক ও শিক্ষকের মন্তব্য ও মতামত জেনে নেওয়া প্রয়োজন ও যাতে মতামতগুলি যথাসম্ভব নির্ভুল হয় তার জন্য উপদেশ নির্দেশের প্রয়োজন।

নির্দেশের পদ্ধতি

নির্দেশের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। কিন্তু সব পদ্ধতিই শিক্ষার্থী সম্পর্কে বিবিধ তথ্যের উপর নির্ভরশীল। এই তথ্য সংগ্রহের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করা যায়। যেমন ঃ—

(ক) বিদ্যালয়ে, শ্রেণীতে ও অন্যান্য পরিবেশে শিক্ষার্থীর আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ।

(খ) শিক্ষার্থীর শ্রেণীর কাজ, বিভিন্ন পরীক্ষায় ফলাফল ও বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের দিকে দৃষ্টি রাখা ও তথ্যগুলি লিপিবন্ধ করে পরে তা থেকে নির্দেশের উপাদান সংগ্রহ করা।

(গ) অভীক্ষা পত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনের খবর নেওয়া।

(ঘ) নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ও অভীক্ষার প্রয়োগ।

(ঙ) শিক্ষার্থীর সাথে একান্তে আলাপ আলোচনা ও তার মনঃসমীক্ষণ।

(চ) অভিভাবকদের মতামত সংগ্রহ।

নানা উপায়ে শিক্ষার্থীর রুচি, অনুরাগ, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার ওপর ভিত্তি করে নির্দেশ দিতে হবে। কোন গুণ ও বৃত্তি কতটুকু থাকলে কোন ধারায় শিক্ষা সবচেয়ে বেশী উপযোগী ও সার্থক হবে তাও নির্দেশকের জানা থাকা দরকার। যেখানে তা জানা নেই সেখানে নির্দেশ ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে।

বাহ্যিক ব্যবহার বা চরিত্র থেকে অনেক সময় শিশুর বাস্তব রূপের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই তার অবচেতন মনের তথ্য বিশেষভাবে সংগ্রহ করার প্রয়াস পেতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন শিশুদের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ স্থাপন ও বন্ধুর মত ব্যবহার করা।

প্রতি বিদ্যালয়েই শিক্ষক-উপদেষ্টা (Teacher-Counsellor) থাকবেন। শিক্ষক উপদেষ্টার কাজ হবে খুবই দায়িত্বপূর্ণ। তার শিক্ষণকার্য কম থাকা প্রয়োজন। উপদেষ্টাকে খুবই মিশুক ও ক্ষমতাসম্পন্ন হবে।

শিক্ষক উপদেষ্টার কাজ হবে—(ক) শিশুর তথ্য সংগ্রহ করা ও তথ্য বিশ্লেষণ করা।

(খ) প্রধান শিক্ষক, শ্রেণী-শিক্ষক ও অভিভাবকের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা।

(গ) সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে শিশুকে নির্দেশ দান করা। মামুলী ধরনের পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং তার ফলাফল দ্বারা শিশুর সর্বতোমুখী ব্যক্তিত্ব ও

যোগ্যতার মান নির্ধারণ করা যায় না। এই ত্রুটি সংশোধনকল্পেই শিশুর ইতিহাস সংগ্রহের প্রয়োজন। অতীত ও বর্তমান ইতিহাস থেকে শিশুর মনের যথাসম্ভব পরিপূর্ণ রূপ ফুটে উঠবে এবং আমাদের পক্ষে তার রুচি, যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব, উদ্দীপনা প্রভৃতির বিচার করা সহজ হবে। এখন এই কাজটি একদিন বা কয়েকদিনের কাজ নয়। বহুদিন যাবৎ শিশুর দৈনন্দিন কার্যাবলী বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বিদ্যালয়ে, গৃহে, বন্ধুবান্ধবমহলে ইত্যাদি বিবিধ পরিবেশে তার একাগ্রতা ও সামাজিকতার কি পরিচয় পাওয়া যায় তা লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

এই তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে আমরা কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হই—(ক) শিশুকে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে সময় ও সুযোগের অভাব, (খ) অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের অন্তরায়, (গ) বিদ্যালয় বহির্ভূত জীবনের অনুসন্ধানে অসুবিধা, (ঘ) বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অভাব, (ঙ) ব্যক্তিত্ব অভীক্ষার ব্যাপারে অভিজ্ঞতার অভাব।

অনুমিত নির্দেশের সমস্যা

বর্তমান ভারতীয় পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু নির্দেশের পথ সমস্যাসমাকীর্ণ, যে সমস্যা এই ক্ষেত্রে দেখা দেবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল অভিভাবক ও শিক্ষককে কেন্দ্র করে।

প্রথমতঃ—সুষ্ঠু নির্দেশের জন্য বিদ্যালয়ে নানা কার্যকরী অভীক্ষার আয়োজনের অভাব। এই আয়োজন সময়সাপেক্ষ, ফলে বিজ্ঞানসম্মত নির্দেশ বর্তমানে সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয়তঃ—অভিভাবকদের ইচ্ছা ও শিক্ষক নির্দেশকের (Teacher Counsellor) নির্দেশের মধ্যে সংঘাতের প্রশ্ন। অনেক সময় অভিভাবক অবস্থাপন্ন হলে এই সংঘাত আরও তীব্রতর ও জটিল হয়ে উঠতে পারে। কারণ, যোগ্যতা না থাকলেও কাঞ্চনকৌলীন্য দিয়ে সে অভাব পূর্ণ করবার প্রয়াস চলবে। ফলে যে বিজ্ঞানশাখার যোগ্য নয় তাকেও অভিভাবকদের পক্ষ থেকে বিজ্ঞানশাখায় ভর্তি করার একটা দুর্দম প্রয়াস চলবে।

তৃতীয়তঃ—ভাবী জীবনের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে অধিকাংশ অভিভাবকই বিজ্ঞানশাখায় শিক্ষার্থীকে ভর্তি করতে চাইবেন। ফলে একই শাখায় অসম্ভব ভিড় হবে ও অন্য শাখাগুলিতে প্রবেশপ্রার্থীর সংখ্যা অনুপাতে কম হবে।

চতুর্থতঃ—যে যে বিভাগে বা শাখায় ভর্তি হবে পরে সে শাখা তার ভাল না লাগলে বা যোগ্যতার পরিচয় না দিলে একশাখা থেকে অন্যশাখায় স্থানান্তরের অবকাশ বস্তুতঃ খুবই স্বল্প।

উচ্চতর স্তরেও এই সমস্যা দেখা দেবে। কারণ কেউ যদি কৃষ্টিমূলক বিষয় নিয়ে পরে বিজ্ঞান বা যন্ত্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিক্ষালাভ করতে চায় বর্তমান অবস্থায় তার পথ তখন রুদ্ধই থাকবে।

তাছাড়া এই শিক্ষাধারা সত্যই কতদূর বৈচিত্র্যময় হবে সে বিষয়ে আজও সংশয়ের অবকাশ আছে। কারণ, দেখা যায় যে, সাধারণ বিষয়বস্তুর বোঝা প্রায় সকলকেই টানতে হচ্ছে—শুধু পার্থক্য হল তার নির্বাচনী বিষয়ের বেলায় (Elective Subject)। তবে কি সাধারণ পাঠ্যবিষয়ের সাথে সাথে নির্বাচনী বিষয় (Elective Subject) সংযোজিত হলেই তা বিবিধার্থসার্থক বিদ্যালয়ের উপাদান হয়ে উঠবে ?

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আজ উঠেছে এই বিবিধার্থসার্থক শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর ভাবী জীবনের সাথে সংহতির সমস্যাকে কেন্দ্র করে। কারণ, যারা হয়ত যান্ত্রিক শাখায় বিশেষ শিক্ষালাভ করবে তারা কর্মজীবনে যদি সে জ্ঞান প্রয়োগ করবার সুযোগ না পায় তবে তাদের এই অর্জিত জ্ঞান সম্পূর্ণ সার্থক বলা যায় না।

আলোচনা ঃ—অনেকে বিবিধার্থ-সাধক বিদ্যালয়কে শিক্ষা-সংকোচক বলে মনে করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনার মূলে শিক্ষাকে সংকোচিত করবার কোন ইঙ্গিতই নাই, বরঞ্চ, শিক্ষাকে সকলের রুচি ও শক্তি অনুযায়ী পরিবেশন করার আয়োজনই এর উদ্দেশ্য। তবে এই আয়োজনের যা কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি ক্রমশঃ ধরা পড়বে সেগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার প্রয়োজন হবে। অনেকের ধারণা যে সব বিদ্যালয় বর্তমানে বিবিধার্থসাধক নয় তাদের অবস্থা শোচনীয় হবে। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যতদূর শোচনীয় হবে বলে মনে হচ্ছে ততদূর হবার কোন কারণ নেই। কোন অভিভাবকই তাঁদের সন্তানকে অলস রাখতে চাইবেন না। ফলে যে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলি আছে তা বিবিধার্থসাধক না হলেও তাতে সাময়িকভাবে ভর্তি করবেন। ইতিমধ্যে বিবিধার্থসাধক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়ে যাবে ও বহু বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী ও ভিন্ন শাখা সংশ্লিষ্ট হবে। সুতরাং এ সমস্যার আংশিক সমাধান হবেই। তারপর যদি এক বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয়ে, এক শাখা থেকে অন্য শাখায় বদলি সুগম হয় তা হলে এই সমাধান আরও সহজ হবে। তারপর যারা

Humanities নেবে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে এটিও সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ সকলেরই বিজ্ঞান বা যান্ত্রিক শাখায় যোগ্যতা নেই—ফলে প্রত্যেকেই সে শাখায় অগ্রসর হলেই যে তারা দেশের উপযুক্ত নাগরিক হতে পারবে ও তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে তার কোন অর্থ নেই। তাছাড়া দেশের কৃষ্টিমূলক শিক্ষার (Liberal Education) প্রয়োজন চিরকালই থাকবে। সমাজে সাহিত্যিক, শিল্পী, ঐতিহাসিকের মূল্য চিরদিনই স্বীকৃত হবে। তবে অভিভাবকদের মধ্যে কৃষ্টিমূলক বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সংশয় তার মূলে এই নতুন শিক্ষা পরিকল্পনা দায়ী নয়, এর জন্য মূলতঃ দায়ী আমাদের দেশের বেকারসমস্যা। যাই হোক, যদি ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন শাখায় অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় শিক্ষাশেষে একটি পরীক্ষা নিয়ে ইচ্ছামত শাখায় যাবার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে বোধহয় অভিভাবকদের কিছু সান্ত্বনা মেলে।

সমস্যার সমাধান করতে হলে নিম্নরূপ উপায়ে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে—

(১) বিদ্যালয়গুলিকে যদি 'আবাসিক বিদ্যালয়ে' পরিণত করা যায় তাহলে শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা খুব সহজ হয়ে দাঁড়ায়।

যতদিন পর্যন্ত আবাসিক বিদ্যালয় না হবে ততদিন শ্রেণীশিক্ষক বা অন্য যে কোন শিক্ষকের উপর জনপ্রতি সীমাবদ্ধ (উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে কুড়িজন বা পঁচিশজন) কয়েকজন ছাত্রের ইতিহাস বা তথ্যসংগ্রহের ভার থাকবে। তিনি অন্যান্য শিক্ষক ও অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেন এবং শিশুর বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবেন।

(২) এ ব্যাপারে অভিভাবকের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন। তার জন্য মাঝে মাঝে শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলন এবং শিক্ষক কর্তৃক শিশুর গৃহ পরিদর্শন হলে ভাল হয়।

(৩) শিক্ষককেও শিশুর বিদ্যালয় বহির্ভূত জীবনের সন্ধান নিতে হবে। এর জন্য শিশুর সহচরদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে এবং শিক্ষক নিজেও শিশুর সঙ্গে মেলামেশা করে এবং বন্ধুর মত ব্যবহার করে অনেক অন্তর্নিহিত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

(৪) বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্যবস্থা এবং মাঝে মাঝে প্রতি শিশুর দৈহিক অবস্থার উন্নতি বা অবনতি লক্ষ্য করতে হবে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ব্যবস্থা না থাকলে কোন বিশেষ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কেবল পরীক্ষা করলেই হবে না—তার প্রতিকারেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) বিদ্যালয়ে বিভিন্ন উৎসবানুষ্ঠানে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ দিতে হবে এবং আত্মবিকাশের ধারা লক্ষ্য করতে হবে।